boierpathshala.blogspot.com

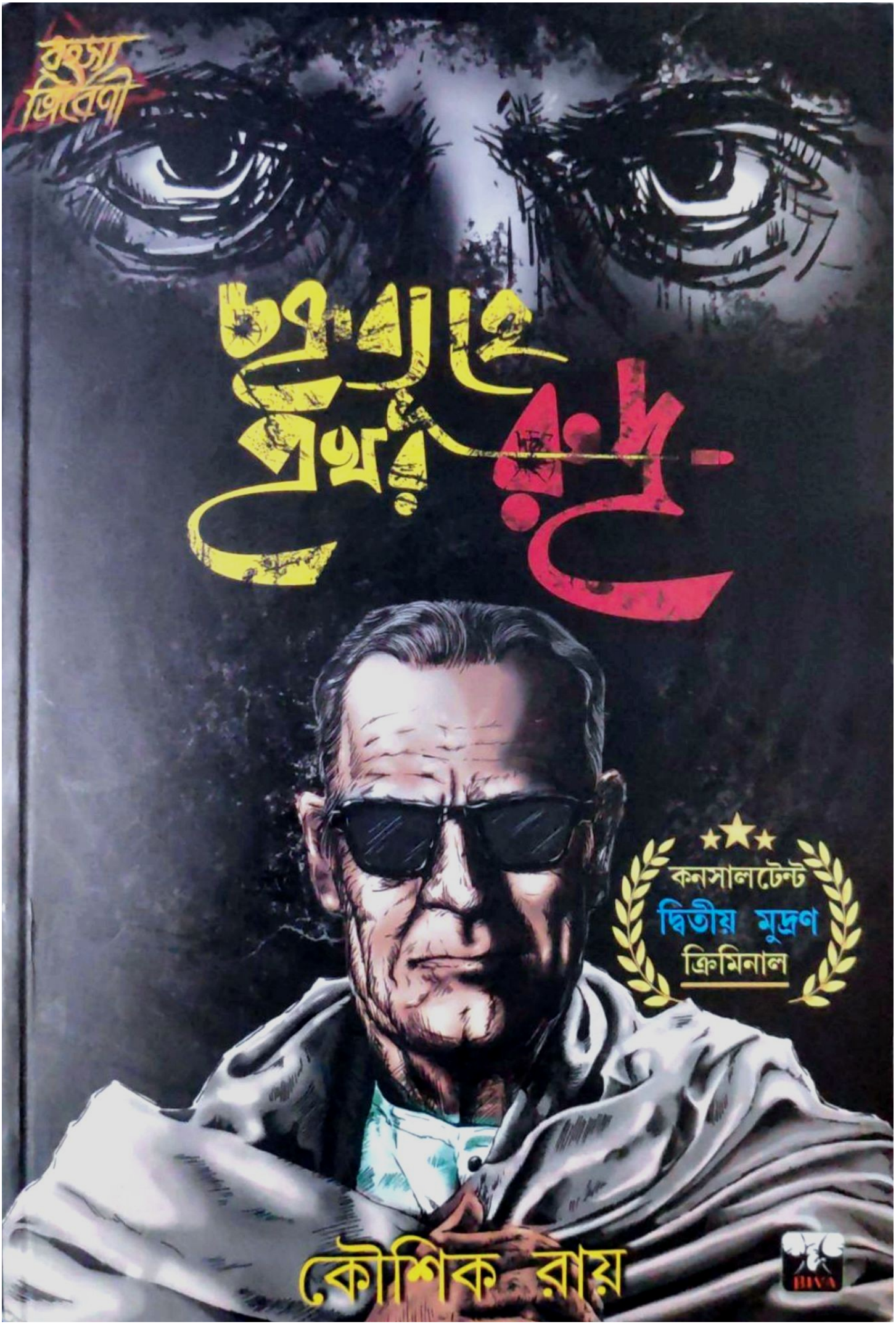

দেশ দেখার নেশায় কম বয়সে ঘর ছেড়েছিলেন প্রখর রুদ্র। বিচিত্র সেসব অভিজ্ঞতা। একই পাড়ার লালামোহন গাঙ্গুলির সাথে তাঁর ছিল গভীর সখ্যতা। তাই তো প্রখর রুদ্র তাঁর বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা পোস্টকার্ডে নিয়মিত লিখে জানাতেন লালমোহনবাবুকে। একা মানুষ লালমোহনবাবু সেসব অভিজ্ঞতায় নিজের কল্পনার রঙ মিশিয়ে ছোটদের জন্য লিখেছিলেন বেস্টসেলার রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজ।

বয়সকালে প্রখর রুদ্র ফিরে আসেন কলকাতায়, ভাইয়ের সংসারে। কিন্তু ফেলা আসা অতীত যে পিছু পিছু তাঁর জন্য কলকাতায় এসে ফাঁদ পেতেছে, তা কি তিনি জানতেন! সব কবিতায় অন্ত্যমিল হয় না, আর সব নায়করা বাস্তবের মাটিতে জিতেও যায় না। তাই ছন্দে বাঁধুক ধন্দ—

মাকড়শার জালের মতই সুনিপুণ ফাঁদ,
পেতে রাখে পুরানো আঘাত।
ছিন্ন ভিন্ন ছিন্নমস্তায় কারা করেছে পাপ?
কালো ঘোড়া বুকে নিয়ে বাঁচে প্রতিশোধের উত্তাপ।
চক্রব্যূহে চৈতন্য হয়ে যাবে খুন,
প্রখর রুদ্রের বুড়ো হাড়ে ধরেছে কি ঘুণ?

কে বলল শুধু গোয়েন্দাদেরই মগজাস্ত্র থাকে? অপরাধকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যেতেও লাগে সমান গ্রে ম্যাটার! অপরাধকে শৈল্পিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে সিদ্ধহস্ত 'ডার্ক হর্স' — এক কনসালটেন্ট ক্রিমিনাল।

অপরাধ যখন গর্ববোধ ও যোগ্যতা প্রমাণের মাধ্যম হয়ে ওঠে তখন... রচিত হচ্ছে রহস্যের এক চক্রব্যূহ...

এ-গল্প সাদাদের নয়... এ-গল্প কালোদের নয়... এ-গল্প ধূসরদের।

BIVA CLASSICS
ISBN 978-93-86548-95-5
9 789386 548955
₹ ১৯৯.০০
www.bivapublication.com

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

চক্রব্যূহে প্রখর রুদ্র

boierpathshala.blogspot.com

চক্রব্যূহে প্রখর রুদ্র

কৌশিক রায়

বিভা পাবলিকেশন

boierpathshala.blogspot.com

CHAKRABYUHE PRAKHAR RUDRA
by Kaushik Roy
Published by Biva Publication
1K, Uday, Rajarhat Residency,
Roypara, Hatiara, Kolkata 700157
Phone : 9434343446
e-mail : biva.publications@gmail.com
follow us : facebook.com/BivaPublication
Website : www.bivapublication.com
Rs. 222.00

ISBN: 978-93-86548-95-5

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২০, কলকাতা বইমেলা
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০২০
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : গৌরব দে

২২২ টাকা
প্রকাশক: বিভা পাবলিকেশন

পরিবেশক
দে বুক স্টোর (দীপু দা),
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ভারতী বুক স্টল,
৬বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত : বিভা পাবলিকেশন
বইটি পুনঃনবীকৃত কাগজ দ্বারা প্রস্তুত। বইটি ছাপাতে নতুন করে একটিও গাছ কাটা হয়নি। প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনওভাবেই এই বইয়ের কোনও অংশেরই পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক মাধ্যম অর্থাৎ তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক কোনও পদ্ধতির মাধ্যমে কপি বা পুনরুৎপাদন করা যাবে না।

boierpathshala.blogspot.com

উ । ৎ । স । র্গ

শৈশবের পক্ষীরাজ সত্যজিৎ রায়
আর কৈশোরের গডফাদার
স্যার আর্থার কোনান ডয়েল'কে

boierpathshala.blogspot.com

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সেই সমস্ত মানুষকে আমি সব সময়ই স্মরণ করি যাঁরা প্রত্যেক দিন প্রত্যেক মুহূর্তে আমায় অনুপ্রাণিত করেন নতুন কিছু শিখতে, নতুনভাবে স্রোতের উলটোদিকে দাঁড়িয়ে পৃথিবীকে দেখতে — বিলেদা, সুমনদা ও সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাকে। কিছু মানুষের জন্য কোনও কৃতজ্ঞতা হয় না যাঁরা আমার রাগ ক্ষোভ মেনে নিয়েও সাথে থেকেছেন — বাবা ও মা। শেষে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এমন একজন মানুষকে যাকে ছাড়া এই বইটা হয়তো দু'বছর আগেই লেখা হয়ে যেত (যদিও তাহলে আর সেটা পড়ার মতো হত না) — নীনা পারভীনকে।

এই সব কিছুর পরও প্রচুর মানুষ থেকে যান, যাঁদের কথা না বলা হলে, তা এই বইয়ের অসম্পূর্ণতা। সেই সমস্ত মানুষ যাঁরা দীর্ঘ সময় ধরে সোস্যাল প্লাটফর্ম প্রতিলিপিতে ও ফেসবুকে 'বইপোকার কলম' আর 'রহস্যের কথকতা' এই দুটি গ্রুপে আমার লেখা পড়েছেন, সমালোচনা করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকটি মতামত আমায় সমৃদ্ধ করেছে, আরো ভালো লেখার অনুপ্রেরণা দিয়েছে। স্থানাভাবে হয়তো সবার নাম উল্লেখ করা সম্ভব হবে না, কিন্তু এঁদের সবার প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি সেই সব পাঠকদের কাছে যাঁরা প্রথম মুদ্রণ প্রকাশের পরে বইটি পড়ে নিজেদের মতামত দিয়ে আমাকে লেখক হিসেবে সমৃদ্ধ করেছেন — জয়ন্ত কর্মকার, শুভেন্দু ভৌমিক, দেবল দে, দেবজ্যোতি গাঙ্গুলি, দীপ্তজিৎ মিশ্র, ঋজু গাঙ্গুলী, পামেলা দেবনাথ দাস, ম্যাডোনা কুমার, অলি চক্রবর্তী, অনিরুদ্ধ সাউ, স্থিতা সংস্থিতা, ভারতী বিশ্বাস, তরুণ চ্যাটার্জী, পৌলমী আদক ও আরও অনেক অচেনা পাঠকবৃন্দ।

boierpathshala.blogspot.com

লেখকের গাল (গল্প)

তখনও কলকাতার বাড়িগুলোর ছাদ ডিস অ্যান্টেনার ছাতায় ছেয়ে যায়নি, টিভিতে চ্যানেল বলতে মাত্র তিনটে। তখনও স্কুলের সামনে দু'টাকায় আলু কাবলি, কুলের আচার কিম্বা চুড়মুড় বিক্রি হত; সাইকেলগুলো দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত মেয়েটার আসার পথ চেয়ে। তখনও দুপুরগুলো ব্যস্ত হতে শেখেনি বরং আলগোছে ছাদের চিলেকোঠায় রাজত্ব ছিল তাদের। সেরকম দিনগুলোতে পড়ার বইগুলোর নিচে রেখে পড়া চলত কাকাবাবু, পাণ্ডব গোয়েন্দা, টিনটিন, ফেলুদা, শঙ্কু কিম্বা তারিণী খুড়ো। একটা সময় এমন হয়েছিল স্কুলের লাইব্রেরিতে এমন কোনো অ্যাডভেঞ্চার বা রহস্য রোমাঞ্চ বই ছিল না, যা আমি পড়িনি।

তখনই একদিন তাঁর সাথে প্রথম দেখা— ব্যোমকেশ বক্সী। ঐ লাইব্রেরিতেই। উনিই হয়তো এই বইটা লেখার প্রথম অনুপ্রেরণা। ব্যোমকেশ পড়ে প্রথম বুঝলাম, এতদিন যা পড়ছিলাম তা একরকম রহস্য রোমাঞ্চ বা অ্যাডভেঞ্চার ঠিকই কিন্তু ক্রাইম থ্রিলার হয়তো নয়। এরপর দেখা হল শার্লক হোমস আর মিস মার্পেলের সাথে — বইমেলায়! হোমসই বোধহয় আমায় প্রথম অনুভব করালেন- "The criminal is the creative artist— the detective only the critic." G.K. Chesterton– The Blue Cross- A Father Brown Mystery"।

তখনই ভেবেছিলাম যদি কোনোদিন ক্রাইম থ্রিলার লিখি তার খলনায়ক নায়কের থেকে বেশি ক্ষুরধার হবে। আমার গল্পের নায়ক মুখ থুবড়ে পড়বে, আমার নায়ক পরাস্ত হবে, আমার নায়ক লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। আমার নায়ক অন্য কারো গল্পে খলনায়ক হবে। ঠিক যেমনটা আমরা প্রত্যেকে আপেক্ষিক। কোথাও ভালো তো কোথাও খারাপ।

বাড়তে থাকা ভুঁড়ি আর কমতে থাকা চুলের ব্যস্তানুপাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সে নায়ক অনেকদিন ঘরছাড়া ছিল। তারপর গতবছর সেই নায়ককে নিয়ে লিখতে বসে প্রথমেই যেটা মনে হল, ক্রাইম থ্রিলার সবথেকে জনপ্রিয় জঁনরাগুলোর একটা। তাহলে কী এমন লিখতে পারি যা আমার গল্পকে আর পাঁচটা ক্রাইম থ্রিলার থেকে আলাদা করবে? তখন কী মনে করে ফেসবুকের গ্রুপে ক্রাইম থ্রিলার আর ফরেনসিক সায়েন্সকে একসাথে নিয়ে ভয়ে ভয়ে প্রথম গল্পটা লিখি। গোয়েন্দার নাম কি দেব অনেক ভেবেও ঠিক করতে না পেরে লালমোহন গাঙ্গুলির থেকে 'প্রখর রুদ্র' নামটাই ধার করলাম। দেখলাম প্রচুর লোক পড়লেন, মতামত রাখলেন।

এই পুরো সিরিজটায় বিভিন্ন বিষ ও রসায়নের উল্লেখ আছে, যেগুলোর কোনোটারই

boierpathshala.blogspot.com

ব্যবহারিক দিক নিয়ে আমার বিশেষ কোনো জ্ঞান নেই। বিভিন্ন বই আর ক্রাইম রিসার্চ জার্নাল পড়ে যেটুকু জানতে পেরেছি সেটুকুকেই গল্পে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। আরও একটা উল্লেখ্য বিষয় হল, কিছু কিছু ক্ষেত্রে গল্পে জ্ঞানত অর্ধসত্য লেখা হয়েছে; যেমন— বিষের পরিমাণ, কার্যকারি সময় ইত্যাদি। উদ্দেশ্য একটাই — আমি জেনে শুনে চাই না আমার বইটি কারুর কোনো রকম ক্ষতির সামান্যতম সম্ভাবনা সৃষ্টি করুক, বইটা শুধুই হোক আনন্দদানের মাধ্যম।

আমার লেখার উদ্দেশ্য বস্তুত সব সময়ই থাকে আনন্দদান। যাঁরা নিয়মিত বই পড়েন, তাঁরা আরো ভালো বই পড়বেন। আমার উদ্দেশ্য সেই সব মানুষগুলোকে আবার বইয়ের কাছে এনে বসানো যাঁরা দৈনন্দিন জীবনের জাঁতাকলে পড়ে বই পড়ার অভ্যাসটা হারিয়েছেন। তাঁদের একজন মানুষও যদি বইটি পড়ে আনন্দ পান তাহলেই আমার উদ্দেশ্য সার্থক।

নিজের মতো করে চেষ্টা করেছি পনেরোটা গল্পের ক্ষেত্রেই থ্রিলটা বজায় রাখার। কতটা সফল বা বিফল হলাম সেটা আপনারাই ভালো বলতে পারবেন। শুধু বলি ভালো লাগুক, খারাপ লাগুক একটা সমালোচনা বা পাঠ-প্রতিক্রিয়া অবশ্যই লিখুন। তাই দ্বিধা না করেই ফেসবুকে কেমন লাগল BIVA Publication কে ট্যাগ করে পোস্ট করুন। যদি গল্পগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে www.facebook.com/chitragupto পেজে গিয়ে আরো রহস্য গল্প পড়তে পারেন।

গল্পগুলো সবাই যখন পড়বেন তখন নিশ্চয়ই মগজাস্ত্র ব্যবহার করে আগেই রহস্যের সমাধান করে ফেলতে চাইবেন। তাই যাত্রা শুরুর আগে একবার মগজাস্ত্রটা পরীক্ষা করে নেওয়া যাক? কি বলেন? নিচে একটা সংকেত রইল আর সেটা সমাধানের জন্য ছড়া। চুপ, সমাধান করতে পারলে কাউকে আবার বলে দেবেন না কিন্তু।

গুপ্ত সন্দেশ ঃ ISLRYJY PSBPY

সংকেত ঃ

শ্যাম বাজারের মোড়ে
ঘোড়ার উপর চড়ে
নেতাজীর পথ ধরেছে যে
প্রথম চাবি পাবে সে।

দ্বিতীয় চাবি রাখা আছে
সপ্তাহের গোনা-গুনটি দিনগুলোতে
ইতিহাসের পাতা থেকে গান্ধীর
পথে হেঁটেছিল যে।

boierpathshala.blogspot.com

সূচিপত্র

ডিসেরগড়ে দিশেহারা	০১১
বৃন্দাবনে বিভীষণ	০৩০
চিন্তাই-বাজ ছিনতাইবাজ	০৪৮
ছিন্নভিন্ন ছিন্নমস্তা	০৬৯
যন্ত্র মন্ত্র তন্ত্র	০৮৯
বিষবৃক্ষ	১০৯
অতি-চালাকের গলায় দড়ি	১২৫
কালো ঘোড়া, লাল রক্ত	১৪১
'জলে না যাইয়ো'	১৫৭
প্রতীক-ই পরাজয়	১৭৪
উড়ন্ত মৃত্যু	১৯১
নষ্ট ভ্রূণ	২১০
নামে কী আসে যায়	২৩১
যারা পেল না আলো	২৫১
চক্রব্যূহে চৈতন্য	২৬৮

boierpathshala.blogspot.com

চক্রব্যূহে প্রখর রুদ্র

boierpathshala.blogspot.com

ডিসেরগড়ে দিশেহারা

টালমাটাল পায়ে লোকটা পানশালা থেকে বেরিয়ে রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল। রাত অনেক হয়েছে। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের হলদে আলোগুলো ঝিমিয়ে পড়েছে, রাতের অন্ধকার সবকিছুকে গিলে খাচ্ছে। লোকটা কোনওমতে ডান হাতটা তুলে ধরে রাতের শেষ ট্যাক্সিগুলোকে ধমকে ওঠে, "ওই শালা, আমাকে বাড়ি নিয়ে চল। পাঁচশো টাকা দেব।" রাত সাড়ে বারোটায় কোনও ট্যাক্সিই এই মাতাল যাত্রীকে তুলতে আগ্রহ দেখায় না। ফাঁকা রাস্তার বুক চিরে হুস হুস করে হলদে ট্যাক্সিগুলো বেরিয়ে যেতে থাকে। লোকটা অসমর্থ হাতে বুকপকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটের কোণে রেখে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে। ঝাপসা চোখে সে কিছু দূরে একটা হাতে-টানা রিকশা দেখতে পায়। যদিও রিকশাচালক বোধহয় চাদর জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। শহরে ধীরে ধীরে ঠান্ডা পড়ছে। লোকটা সিগারেটটা বাঁ হাতে ধরে রিকশার সামনে এসে দাঁড়ায়, "ওই ওঠ, ওঠ শালা। আমায় বাড়ি পৌঁছে দিবি চল।" সদ্য ঘুম-ভাঙা রিকশাচালক ফ্যাল ফ্যাল করে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকে। লোকটা একটা পাঁচশো টাকা বাড়িয়ে দেয়, "নে, তোর সারা মাসের খরচা। এবার আমায় বাড়ি পৌঁছে দিবি চল।" গরিব দেহাতি রিকশাচালক আর কথা বাড়ায় না। লোকটা রিকশায় চেপে বসে। তাঁর সিগারেট-ধরা হাতটা রিকশার বাইরেই ঝুলতে থাকে।

পানশালার পিছন থেকে একটা ছায়ামূর্তি বেরিয়ে আসে। হাত দুটো জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে ছায়ামূর্তি চুপচাপ রিকশাটাকে অনুসরণ করে। খুব বেশি দূরত্ব না রেখেই ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে লোকটিকে অনুসরণ করতে থাকে। কিছু দূর যেতেই লোকটি তার সিগারেটে শেষ সুখটান দিয়ে রাস্তায় ফেলে দেয়।

এবার ছায়ামূর্তি ছুটে এগিয়ে আসে, হাতে তাড়াতাড়ি সাদা গ্লাভস পরে নেয়। সিগারেটের ফিলটারটা কুড়িয়ে নিয়ে একটা এয়ারটাইট প্যাকেটে ঢুকিয়ে পকেটে ভরে নেয়। এদিক-ওদিক দেখে ছায়ামূর্তি উলটোদিকে হাঁটতে শুরু করে– "হ্যালো ম্যাডাম, হ্যাঁ কাজ হয়ে গেছে। না, না। আমি এখুনি ল্যাবে আসছি..."

* * * * * * * *

শিবানী অফিস থেকে ফিরেই ছুটে দোতলায় চলে যায়। শিবানীর ভারী বুটের আওয়াজ পেয়ে শিবানীর মা কুন্তলাদেবী বলে ওঠেন, "ওরে মালতী চা বসা। একজন ফিরেছেন, আর একজন যে কখন ফিরবেন, ভগবানই জানেন।" শিবানী জুতো খুলে সোজা জেঠুর পড়ার ঘরে হানা দেয়। শিবানীর জেঠুর বয়স প্রায় পঞ্চান্ন ছুঁইছুঁই। স্বাস্থ্য দেখলে বোঝা যায় যুবা বয়সে বেশ শক্তসমর্থ ছিলেন। লম্বায় প্রায় ছ-ফুট, মাথায় কাঁচা-পাকা ব্যাকব্র্যাশ করা চুল, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। শিবানীর জেঠু কম বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন— যেখানে যা কাজ পেয়েছেন করেছেন আর কিছু টাকা জমলেই আবার নতুন জায়গা দেখার নেশায় শহর ছেড়েছেন। বিচিত্র সেসব অভিজ্ঞতা। সেসব চিঠি লিখে তাঁর এক লেখক-বন্ধুকে জানাতেন, আর লেখক-বন্ধুটি সেসব অভিজ্ঞতার কথা গল্পাকারে লিখে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তারপর বয়স বাড়তেই হঠাৎ করেই একদিন বাড়ির টান পেয়ে বসল। একমাত্র ছোটভাইয়ের কাছে যখন ফিরলেন তখন বাবা-মা গত হয়েছেন আর ভাই শেখরের দুটি পাঁচ বছরের যমজ মেয়ে— শিবানী আর ইন্দ্রাণী। একরকম ভাইঝিদের মুখ চেয়েই রয়ে গেলেন ভাইয়ের কাছে। অনেকগুলো বছর কেটে গেছে, তবে এখনও হঠাৎ হঠাৎ বেরিয়ে পড়েন আর প্রত্যেকবার সঙ্গে নিয়ে যান ইন্দ্রাণী না হয় শিবানীকে। ছোটভাই শেখর পুলিশের ডি.আই.জি.। আর শিবানী এ বছরই ক্রাইম ব্রাঞ্চের ইনস্পেকটর পদে অভিষিক্তা হয়েছে। ছোটভাইঝি ইন্দ্রাণী অবশ্য জেঠুর ধাত পেয়েছে— এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানো আর সবকিছুকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করা।

শিবানী পড়ার ঘরে ঢুকে দেখল, জেঠু একটা বায়োলজির বই পড়ছে। পায়ের শব্দ পেয়ে চোখ না তুলেই জিজ্ঞাসা করল, "কী রে, আজ আবার

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

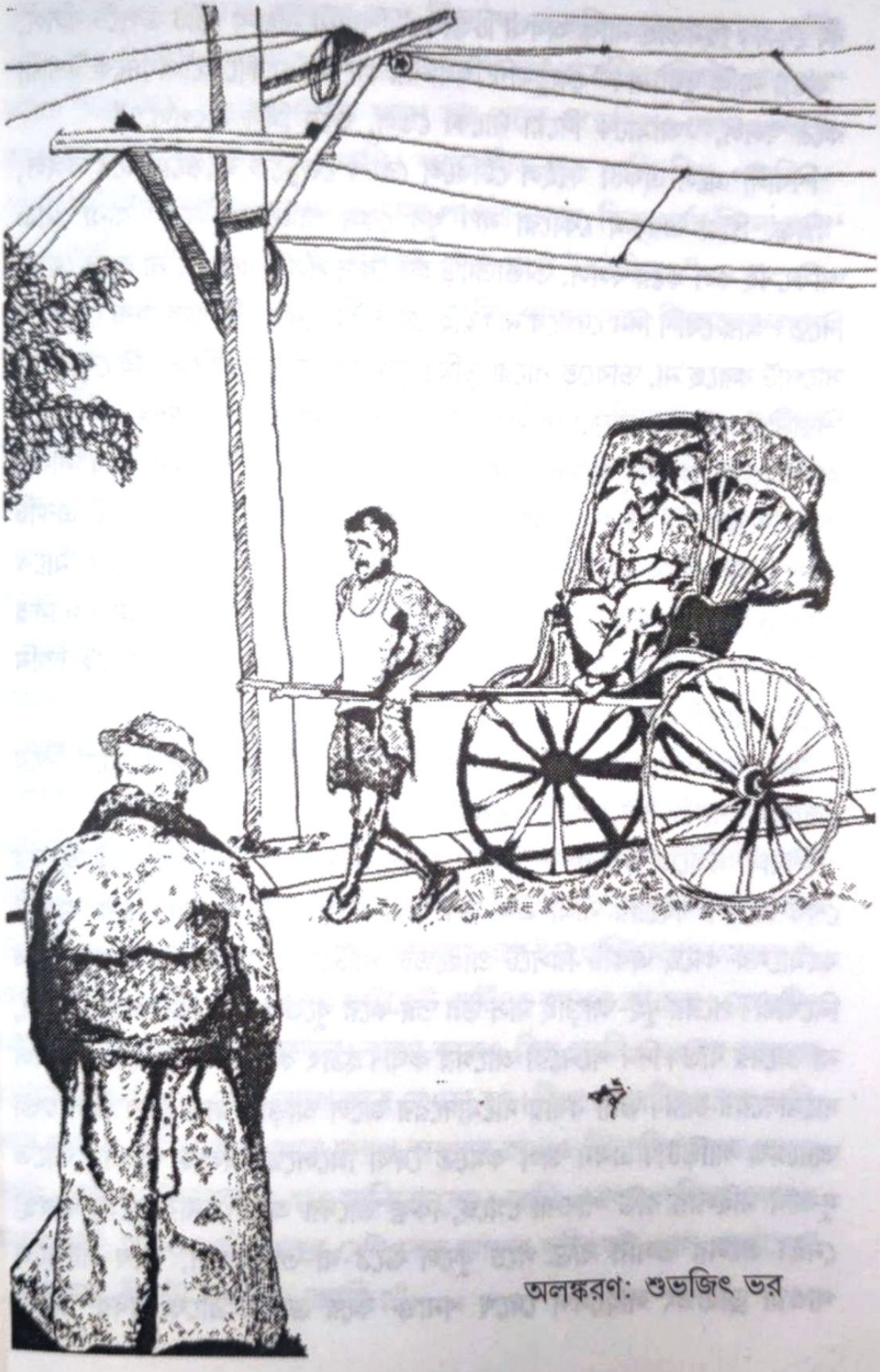

অলঙ্করণ: শুভজিৎ ভর

কী কেস? ছিনতাই নাকি অযথা চিন্তাই!" শিবানী নীচের ঠোঁট উলটে বলল, "হত্যা নাকি দুর্ঘটনা?" জেঠুমণি শিবানীর হাতের চকোলেটের দিকে ইশারা করে বলল, "আমাকে দিয়ো নাকো তেল, ওহে মিস মার্পেল..."

শিবানী এসে একটা ফাইল টেবিলে রেখে জেঠুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "প্লিজ, প্লিজ এরকম কোরো না। খুব কেস খাচ্ছি অফিসে। বাবা আজ অফিসেই কল করে বলল, তাড়াতাড়ি হয় কেস সল্‌ভ করতে, না হলে ছেড়ে দিতে। আর বেশি দিন দেখবে না। হাই প্রোফাইল কেস। নিজের বাবা মেয়েকে সাপোর্ট করছে না, ভাবতে পারো তুমি! তুমিও হাত তুলে দিলে যাই কোথা?" শিবানী জানে তার জেঠুর কোনও নেশা নেই, একটি ছাড়া— ডার্ক চকোলেট। বয়স হওয়ার কারণে আজকাল শিবানীর মা যদিও চকোলেট আনা প্রায় নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তা-ও লুকিয়ে-চুরিয়ে মাঝে মাঝে দুই ভাইঝিই এই একটি নেশার বস্তু জেঠুর জন্য জোগান দেয়। যদিও কুন্তলাদেবী সেটা জেনেও মাঝে মাঝে চুপ করে থাকেন। লোকটার আছেই বা আর কে! অন্য কোনও দায়িত্ব নেই, নেশা নেই। তাই নিজের মেয়েদের কাণ্ড দেখে মাঝে মাঝেই তিনি নিজের মনেই হাসেন।

জেঠুমণি চকোলেটটা শিবানীর হাত থেকে নিয়ে এক টুকরো মুখে দিয়ে বলল, "বোস। বল দেখি... শুনি।"

শিবানী বলতে শুরু করে, "ঘটনার শুরু মাস তিনেক আগে। ওই জুনের শেষ দিকে। শহরের নামী এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর মেয়ে ও তার এক বান্ধবী বর্ধমানের কাছে একটি রিসর্টে প্রাইভেট পার্টিতে গিয়েছিল। ফেরার পথে নিখোঁজ। পরের দুই-আড়াই মাস তন্ন তন্ন করে খুঁজেও না গাড়ি পাওয়া গেল, না তাদের বডি। দিন পনেরো আগের কথা। হঠাৎ করেই গাড়ির দেখা মিলল দামোদরের চরে। ভরা বর্ষায় দামোদরের জলে আড়াই মাস ডুবে ছিল হন্ডা অ্যামেজ গাড়িটা। এখন জল কমতে দেখা মিলেছে। বলাই বাহুল্য, তাতে দু-জন মহিলার বডি পাওয়া গেছে, কিন্তু তাদের আর চেনার মতো অবস্থা নেই। জলের তলায় বডি পচে ফুলে উঠে যা-তা অবস্থা, তবে গাড়িতে পাওয়া ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখে শনাক্ত করে ক্রাইম ব্রাঞ্চে খবর পাঠায়

boierpathshala.blogspot.com

লোকাল থানা। আমরা দেরি না করে গিয়ে যা যা ছবি তোলার তুলে, বডি নিয়ে কলকাতাতে ফেরত আসি। বডির যা অবস্থা হয়েছিল, কিছুই পাওয়ার আশা ছিল না— হাড়ের থেকে মাংস সব ঝুলে পড়েছিল। কোনওরকমে কাপড়ে বেঁধে আমরা নিয়ে আসি। ফরেনসিক খুব বেশি কিছু পায়নি— ভ্যাজাইনাতে একাধিক সিমেনের নমুনা পাওয়া গেছে, কিন্তু ধর্ষণ কি না বলা সম্ভব হয়নি। শরীরের সব মাংসপিণ্ডই পচে-গলে উঠেছিল...”

জেঠুমণি বলে উঠল, “জলের নীচে অতদিন থাকার পরে সিমেনের নমুনা সংগ্রহ করা গেল?”

শিবানী একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, “না, মানে ঠিক সিমেন না। জরায়ুর মধ্যে দুটি মেল ডি.এন.এ.-র ট্রেস পাওয়া গেছে Y-STR টেস্ট করে। আর তুমি তো ভালো করেই জানো ডি.এন.এ.-র ছোট থেকে ছোট স্যাম্পলও বেশ কয়েক বছর পরও ইনট্যাক্ট থেকে যায়। যদি বডিটা পুরোপুরি গলে-পচে জলে ভেসে যেত, তাহলে হয়তো আর খুঁজে পাওয়া যেত না।”

জেঠুমণি বলে উঠল, “হুম... তোরা ঠিক পথেই তো ছিলিস। তা সমস্যাটা বাধল কোথায়?”

শিবানী চেয়ার থেকে উঠে পায়চারি করতে করতে বলতে শুরু করল, “বাবার অঢেল টাকা। উদ্দাম জীবনযাপন। সেদিন প্রাইভেট পার্টিতেও মদ্যপানের কোনও সীমা ছিল না। সেখানেই একজনের সঙ্গে শারীরিকভাবে ঘনিষ্ঠ হয়। একজন স্বীকারও করেছে। সেখান থেকে মাঝরাতে মদ্যপ অবস্থায় মেয়েটি ও তার বন্ধু গাড়ি করে বেরিয়ে যায়। পরে ইনভেস্টিগেশনে জানলাম, এর আগেও মেয়ে দুটি এরকম প্রাইভেট পার্টিতে বহুবার করেছে। মেয়েটির বাবা না জানলেও মা জানতেন। বারণ করেও কিছু হয়নি। এরকম অবস্থায় প্রথমে দুর্ঘটনা বলে কেস ক্লোজ করে দেওয়া হয়। কিন্তু মেয়েটির বাবার দাবি, এটা দুর্ঘটনা নয়— তাঁর মেয়ে মদ্যপ অবস্থায় হলেও স্টিয়ারিং হাতে ধরলে নাকি পাক্কা ড্রাইভারকেও হার মানিয়ে দেয়। জানি এরকম যুক্তির কোনও মানে নেই, তা-ও দুর্ভাগ্যবশত সেই কেস আমার ঝুলিতেই এসে পড়েছে।”

“তোরা কী কী জোগাড় করলি?”

boierpathshala.blogspot.com

শিবানী পায়চারি করতে করতে বলে, "পুরুলিয়া বরাকর রোডের উপর একটা ধাবা আমরা শনাক্ত করেছি, যেখানে মেয়ে দুটি নেমেছিল। দু-মাস পরেও ধাবার মালিক মনে রেখেছিল। সেদিন রাতে ধাবায় মদ্যপ অবস্থায় চিৎকার-চেঁচামেচি আর কী! যা হয়!"

"হুম... চিৎকার-চেঁচামেচিটা ঠিক কীসের জন্য? আর গাড়িটা ঠিক কোথায় পাওয়া গিয়েছিল?"

"ওই কয়েকটি ছেলে তাদের দিকে কিছু মন্তব্য করেছিল। তারই ফলে প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপর ধস্তাধস্তি। ধাবার মালিক দুই পক্ষকেই বের করে দেয়। এক ওয়েটারের মাথায় মেয়েটি কাচের গ্লাস ছুড়ে মারে। রক্তারক্তি কাণ্ড একেবারে। আর গাড়ি পাওয়া যায়, যেখানে দামোদর আর বরাকর মিশছে, ঠিক সেখানে।"

জেঠুমণি ল্যাপটপটায় ফটাফট বর্ধমানের ম্যাপ খুলে বসে, "দেখ, পুরুলিয়া বরাকর রোড মানে কলকাতা আসতে ডিসেরগড় ব্রিজ টপকাতেই হবে। আমার সম্ভাবনা বলছে, ওরা ব্রিজ টপকায়নি। টপকালে, আর সে গাড়ি দামোদরের জলে পাওয়া যেত না। তবে মন বলছে দুর্ঘটনা নয়, না হলে যা হওয়ার ব্রিজের উপরেই হত। এক, যদি মেয়ে দুটির নীচে যাওয়ার নির্দিষ্ট কোনও কারণ না থেকে থাকে। কতকগুলো জিনিস আরও একটু ভালো করে দেখা দরকার। কোনও ভিডিয়ো ফুটেজ?"

শিবানী ল্যাপটপের উপর ঝুঁকে পড়ে বলে, "হ্যাঁ। ধাবা আর কিছু দূরের একটি এ.টি.এম.-এর ফুটেজে লাল অ্যামেজ দিব্যি দেখা যাচ্ছিল। সঙ্গে দুটি ফুটেজেই যে ছেলেগুলির সঙ্গে ঝগড়া হয়, তাদের কালো স্কোরপিও দেখা গিয়েছিল। ওদের আমরা সন্দেহের বশে তুলে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। কোনও লাভ হয়নি। ওদের কারও ডি.এন.এ.-ও ম্যাচ করেনি। ওদের বক্তব্য, ওরা ধাওয়া করেছিল ঠিকই, কিন্তু কিছু দূর গিয়ে ওরা আর ঝামেলা বাড়াতে চায়নি তাই গাড়ি থামিয়ে বিয়ার খেয়ে সারারাত রাস্তাতেই ছিল। ভোর হতে সবাই মেদিনীপুর ফিরে যায়। আমরা ওদের বক্তব্য ভেরিফাই করেছি। সবকিছুরই প্রমাণ আছে– সকালে যে দোকান থেকে চা খেয়েছিল, ব্রেকফাস্ট করেছিল,

boierpathshala.blogspot.com

সবই অথেন্টিক।"

জেঠুমণি ফাইলটা টেবিল থেকে তুলে শিবানীর দিকে ধরে বলল, "ছবিগুলো দেখা তো..." শিবানী গাড়ির কতকগুলো ছবি সামনে সাজিয়ে দিল, সঙ্গে দু-জন ভিকটিমের দেহ। ভিকটিমদের যদিও দেখার আর কিছু বাকি ছিল না— গলা, পচা, ফুলে-ওঠা সাদাটে মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছুই বাকি নেই। মানুষের আকৃতি না থাকলে হয়তো মানুষ বলেও ঠাহর করা যেত না। গাড়ির দুটো ছবি নিয়ে জেঠুমণি মন দিয়ে দেখতে লাগল— একটা, পিছনদিকের ডিকির ছবি; অন্যটা, সামনের বনেটের। তারপর তড়িঘড়ি পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা দেখে নিল। বাকি ফাইলটায় চোখ বুলিয়ে জেঠুমণি বলে উঠল, "ক-টা জিনিস খোঁজ নে। এক, গাড়ির বনেট আর ডিকি দুই জায়গাতেই বড়সড়ো থোবড়ানো— কোনও একটা কি আগে থেকেই ছিল? দুই, প্রাইমারি ইনভেস্টিগেটিভ অফিসার যিনি ছিলেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করিস, যখন গাড়িতে বডি পাওয়া যায় তখন ঠিক কীভাবে ছিল— মানে সিটবেল্ট ছিল কি না; পায়ের থেকে অ্যাক্সিলারেটর, ব্রেক কত দূরে ছিল— এসব আর কী। মানে যতটা বিস্তারিত বলতে পারবে, ততটা সুবিধা।" শিবানী ব্যাগ থেকে একটা সিডি বের করে জেঠুমণির ল্যাপটপে ঢুকিয়ে দেয়, "সিসিটিভি ফুটেজ সব এতে আছে। গাড়ির ডেন্ট ছিল কি না জানা হয়ে যাবে।"

দু-জনে অনন্ত ধৈর্য নিয়ে সব ফুটেজ দেখে চলে। এর মধ্যে মালতী এককাপ চা আর এক কাপ কফি দিয়ে গেছে। ভাইঝি আর জেঠুর যদিও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কুন্তলাদেবী এসে ঠান্ডা চা আর কফি নিয়ে চলেও গেছেন। টেবিলের উপর চকোলেট দেখে তিনি বুঝেছেন সমস্যা গম্ভীর। কিন্তু এই বয়সে বেশি মিষ্টি না-খাওয়াই ভালো— "দাদা, আমি চকোলেটটা ফ্রিজে রাখছি। এখন আর খাবেন না।" জেঠুমণি কোনওদিকে না তাকিয়ে শুধু 'হুম' বলে সম্মতি জানিয়েছেন। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে সব ফুটেজ খুঁটিয়ে দেখে শিবানী বলল, "দেখো, এ.টি.এম. পর্যন্ত তো দেখাই যাচ্ছে যে, না গাড়ির সামনে ডেন্ট আছে না পিছনে। আমার মনে হয়, জলে পড়ার সময়ই দামোদরের নীচে শক্ত কোনও পাথরে ধাক্কা লেগে ডেন্ট হয়েছে। কিন্তু এটাতে এত ভাবার কী আছে?"

boierpathshala.blogspot.com

জেঠুমণি বলল, "গাড়ি একই সঙ্গে কি দু-দিকে চলতে পারে?"

"মানে?"

"মানে, হয় গাড়ি সামনে চলবে আর না হলে রিভার্স গিয়ারে, পিছনের দিকে। সামনের দিকে মুখ থুবড়ে পড়লে বনেট থুবড়ে যাবে কিন্তু ডিকিতে খুব বেশি আঘাতের চিহ্ন থাকবে না। আর যদি পিছনদিকে পড়ে তাহলে ডিকি থুবড়ে যাবে, বনেট থুবড়ে যাবে না। নিশ্চই মাঝখানে কিছু একটা হয়েছিল যেটা আমরা মিস করছি। সেটা জানার জন্য বাকি প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজ তাড়াতাড়ি।"

শিবানী শুকনো মুখে তাকিয়ে বলল, "তার মানে বলতে চাইছ, খুন?"

"মনে তো তা-ই হচ্ছে রে। আরও একটা খটকা আছে— পোস্টমর্টেম বলেছে মাথার করোটিতে পিছনে চিড় ধরা। এখন প্রশ্ন, গাড়ি সামনের দিক করে পড়লে সামনে চিড় ধরলে তা-ও মানা যেত। মাথার ডান পাশে চিড় ধরলেও আশ্চর্য হতাম না— দরজায় গায়ে ধাক্কা লাগতেই পারে। কিন্তু পিছনে সিট থাকতেও এত জোরে কি আদৌ ধাক্কা লাগতে পারে যে করোটিই ফেটে যাবে? আরও একটু খুঁটিয়ে দেখতে হবে। সিডিটা এখানেই রেখে যা। সকালে মনে করে নিয়ে যাস অফিস যাওয়ার সময়। দেখি যদি আরও কিছু পাওয়া যায়। আর হ্যাঁ, যা মনে হচ্ছে, যদি এটা খুন হয়ে থাকে তাহলে ? এ.টি.এম.-এর পর থেকে ব্রিজে ওঠার আগে পর্যন্ত এর মধ্যেই কিছু হয়েছে। নদীর আশপাশের জঙ্গলগুলো খুঁজে দেখ। যদি কোনওরকম কিছু পাওয়া যায়। আশপাশের লোকজনকেও জিজ্ঞাসা কর। খুব শুনশান জায়গা তো আর নয়, কিছু না কিছু কেউ যদি দেখে থাকে।"

এতক্ষণে দু-জনের খেয়াল হয়, কখন যেন শেখরবাবু ফিরে এসে চুপচাপ সোফায় বসে চা খাচ্ছেন। শিবানী দেখে একটু অপ্রস্তুতভাবে হেসে ফেলে। শেখরবাবুও প্রত্যুত্তরে মিচকি হাসেন।

* * * * * * * * *

পরের দিন সকালে শিবানী অফিস যাওয়ার আগে জেঠুর সঙ্গে দেখা করে

boierpathshala.blogspot.com

সিডি-টা নিতে আসে। জেঠুমণি এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দেন— "ওই দিন এই তিনটে গাড়িও মোটামুটি ওই মেয়ে দুটির গাড়ির হয় কিছু আগে না হয় পরে ক্রস করেছে। ধাবা আর এ.টি.এম. দুই জায়গাতেই এই তিনটে গাড়িকে দেখা যাচ্ছে। এরা আদৌ জড়িত কি না জানি না, তবে বাজিয়ে দেখা আর কী!" শিবানীর এমনই দেরি হয়ে গিয়েছিল তাই আর বেশি দেরি না করে কাগজটা নিয়ে বেরিয়ে যায়। দুপুরের দিকে কুন্তলাদেবীকে ফোন করে শিবানী জানায়, ক-দিনের জন্য সে বর্ধমান যাচ্ছে। কুন্তলাদেবী আগে এসব চিন্তা করতেন, তবে স্বামীকে এতদিন দেখেছেন আর মেয়ে গত তিন বছরে এরকম অনেক হার্ট অ্যাটাক দিয়েছে। তাই তিনি শুধু খাওয়া-দাওয়ার যত্ন নিতে বললেন। তিনি জানেন, এখন সব থেকে বেশি মেয়ের খবর যদি কারও কাছে থাকে তা হল তাঁর ভাশুরের কাছে। তিন দিন পর বাড়ি ফেরে শিবানী। এই তিন দিনে অনেক কিছু জোগাড় হল ঠিকই কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধ তখনও শেষ হয়নি। শিবানী যখন বাড়ি ফেরে তখন জেঠুমণি মন দিয়ে ল্যাপটপে কিছু একটা দেখছিলেন। তিন দিনের ক্লান্তি শিবানীকে নিংড়ে দিয়েছিল, তাই একটু ঘুমিয়ে সন্ধেবেলা জেঠুমণির ঘরে উপস্থিত হল।

জেঠুমণি বলে ওঠে, "কী রে, কেমন লাগছে?"

"ওসব ছাড়ো। আমার শনির দশা কাটছে না। এত কাছে এসেও জাল গোটাতে পারছি না যে। কী যে করি..." জেঠুমণি কিছু বলতে যাওয়ার আগেই শেখরবাবু ঘরে ঢুকে শিবানীকে বললেন, "কী রে, তোর প্রোগ্রেস কত দূর? মিডিয়া কিন্তু জল ঘোলা করছে। আজ রিপোর্টও জমা করিসনি।" শিবানী অপ্রস্তুত হয়ে একবার বাবা আর একবার জেঠুমণির দিকে দেখতে থাকে।

জেঠুমণি বলে, "আমায় যা যা বলেছিস, ওকেও একবার বলে দে। ওকেও তো উপরমহলে জবাব দিতে হয়।"

শিবানী সোফাতে বসে শুরু করে, "যে তিনটে গাড়ির নম্বর জেঠু দিয়েছিল, সে তিনটের কথা আগে বলি। একটা ছিল ফ্যামিলি কার। পুরুলিয়ার এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ফিরছিল। আর-একটি আসছিল মালদা থেকে— একটি ছোটখাটো ওষুধ ডিস্ট্রিবিউটারের গাড়ি। মাল নিয়ে ফিরছিল কলকাতা। এই

boierpathshala.blogspot.com

লোকটি ভোর ভোরই কলকাতা পৌঁছে গিয়েছিল। তাই হিসেব করে দেখতে গেলে রাস্তায় কিছু করতে গেলে লোকটি অত ভোরে কলকাতা পৌঁছোতে পারত না। রাস্তার এক জায়গাতে এ.টি.এম.-এ টাকা তুলেছিল। তারও ফুটেজ আছে। তৃতীয় গাড়িটি এক প্রতিপত্তিশালী নেতার শালার। সে যদিও বিশেষ কিছু বলতে রাজি নয়— ব্যক্তিগত কাজ থেকে রাতে দেরি করে ফিরছিল, কত রাতে বাড়ি ফিরেছিল, সেসব বলতেও সে রাজি ছিল না। ঠিকঠাক কোনও কারণ ছাড়া জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে না, জানিয়ে দিয়েছে।"

শেখরবাবু এবার চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, "আমার মনে হচ্ছে, একটা সাধারণ দুর্ঘটনাকে তোরা জোর করে খুন বানাতে চাইছিস। আই ওয়ান্ট রিপোর্ট অন ইয়োর সিনিয়র'স ডেস্ক টুমরো মর্নিং। নো মোর টাইম ওয়েস্ট।"

শিবানী এবার একটু অধৈর্য হয়ে বলল, "পুরোটা না শুনেই কথা বলো কেন! আগে একটা ধন্দ ছিল। এখন পরিষ্কার যে এটা খুন। শোনো তবে। তিন দিন আমরা কুড়িজনের টিম ডিসেরগড় ব্রিজ থেকে দামোদর আর বরাকরের মোহনা পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করেছি। অবশেষে দেখলাম, ছিন্নমস্তা মন্দিরের কিছু দূরে একটা চালাঘরের নতুন মন্দির জাঁকিয়ে বসেছে। দেখলাম সেখানেই লাইন বেশি। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, প্রায় তিন মাস আগে এক অমাবস্যার সকালে একজন নদীর ঘাটে যেতে গিয়ে দেখে একটা মাঝারি সাইজের পাথরের উপর রক্তের ছোপ। তারপর যা হয়, রটে গেল, রাতে মা ছিন্নমস্তা মন্দির থেকে বেরিয়ে পাথরের উপরে বসেছিলেন। ওই রক্তের দাগ স্বয়ং ছিন্নমস্তার। তারপর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চালাঘর তৈরি হয়ে যায়, সঙ্গে ইটের বেদি। কে বলে এই দেশে কুসংস্কার সমাজের জন্য বিপদ! তবে ভাগ্য ভালো, পাথরের উপরে তখনও তেল, সিঁদুর চড়েনি। না হলে আমি এতক্ষণে শূলে চড়ে যেতাম। যা-ই হোক, তার থেকে পাওয়া ব্লাড স্যাম্পল ম্যাচ করেছে ব্যবসায়ীর মেয়ের বন্ধুটির সঙ্গে।"

শেখরবাবু কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থাকেন। জেঠুই মুখ খোলেন, "তাহলে স্ক্যালের পিছনের চোটটা জানা গেল..." আর কিছু বলার আগেই শিবানী বলে উঠল, "আর হ্যাঁ, আমি লোকাল থানার যাঁরা গাড়িটি খুঁজে পেয়েছিলেন

boierpathshala.blogspot.com

তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁদের মধ্যে একজনের বক্তব্য, ড্রাইভারের সিটে বসে-থাকা মৃতদেহটির পায়ের পাতার বুড়ো আঙুলের মাথা থেকে ব্রেক, অ্যাক্সিলারেটরের দূরত্ব ছিল প্রায় ত্রিশ সেন্টিমিটার পর্যন্ত। পরে কলকাতার ক্রাইম ডিপার্টমেন্ট গিয়ে কাজ শুরু করলে লোকাল থানা আর এসব নিয়ে মাথা ঘামায়নি।

জেঠুমণি বলল, "প্রায় ত্রিশ সেন্টিমিটার! এভাবে গাড়ি চালানো যায় না। অবশ্যই গাড়িটি লম্বা কেউ চালিয়ে এনে পরে ড্রাইভিং সিটে মেয়ে দুটির একটিকে বসিয়ে দিয়েছে।"

এবার শেখরবাবু মুখ খুললেন, "এমনও তো হতে পারে, গাড়িটি জলে পড়ার পর মেয়েটি বের হওয়ার চেষ্টা করছিল, তাই হয়তো নিজেই সিটটা পিছনের দিকে ঠেলে দিয়েছে।"

জেঠুমণি একবার হেসে বললেন, "একদম হতে পারে। একবারের জন্য এবার তুই ভেবে নে গাড়ি করে জলের মধ্যে পড়ে গেছিস। অন অ্যাভারেজ তোর কাছে এক মিনিট আছে। তুই ঠিক কী কী করবি?"

শেখরবাবু ঠোঁট উলটে বলল, "কী আবার করব! প্রথমে সিটবেল্ট খুলব, সিট পিছনে ঠেলে সরাব তারপর গাড়ির দরজা..."

জেঠুমণি বলে উঠল, "একদম। তুই আগে সিটবেল্ট খুলবি। যে কেউই তা-ই করবে। কিন্তু মেয়ে দুটির মৃতদেহ সিটবেল্টের সঙ্গেই বাঁধা ছিল। তার মানে হয় তারা মারা গিয়েছিল, তা না হলে অচৈতন্য ছিল। তাই সিট পিছনে ঠেলার কোনও কারণই নেই। আচ্ছা, পাথরটা কত ভারী ছিল রে?"

শিবানী রিপোর্ট দেখে বলল, "তিন কেজি সাতশো গ্রাম।"

"তার মানে মোটামুটি পাথরটা দু-হাত দিয়েই তুলে ছুড়েছে বলেই অনুমান করা যায়। তার মানে হাতের চামড়া কিছুটা হলেও ছালিয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকেই। ডি.এন.এ. স্যাম্পল কিছু পাওয়া গেল?"

"না। কী করেই বা আর পাওয়া যাবে, এতদিন পুরোনো। ধুলো-ফুলোতে নষ্ট হয়ে গেছে।"

"লালবাজারে কি M–Vac আছে?" জেঠুমণি চেয়ারের উপরে হেলান

boierpathshala.blogspot.com

দিয়ে বসে ভাইয়ের দিকে তাকাল। শিবানী কিছুক্ষণ দু-জনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। শেখরবাবু ধীরে ধীরে বলে উঠলেন, "আমি ঠিক শিয়োর না। ফরেনসিকে দেখতে হবে।"

শিবানী বলে ওঠে "সেটা কী?"

জেঠুমণি চেয়ারে হেলান দিয়ে আয়েশ করে বসে বলল, "দিন বদলাচ্ছে, বানী। ক্রাইমের ধরনও। তাই শুধু মগজাস্ত্রে ভর করে কেস সল্‌ভ করা ওই গল্পেই ভালো লাগে। বাস্তবে দরকার সঠিক ডেটা কালেকশন। তারপর অপরাধীকে শনাক্ত করা। তার জন্য বিজ্ঞানের অসাধারণ সব আবিষ্কার এসে গেছে, কিন্তু আমরা খরব রাখছি না। শোন, M–Vac হল ডি.এন.এ. নমুনা সংগ্রহের নবতম আবিষ্কার। এর মাধ্যমে আগের পদ্ধতিগুলির তুলনায় বেশি ভালোভাবে ডি.এন.এ. স্যাম্পল সংগ্রহ করা সম্ভব, তা-ও খুব কম নমুনা থেকেই। আমেরিকায় এই পদ্ধতি ব্যবহার করে খুব সম্প্রতি প্রায় কুড়ি বছর পুরোনো এক কেসের সমাধান হয়েছে। একবার M–Vac ট্রাই করে দেখ।"

শিবানী মোবাইলে কাউকে ফোন করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

* * * * * * * *

দু-দিন পর দুপুরে শিবানী অফিস থেকে ফোন করে, "থ্যাঙ্কু জেঠু। পাথরের ফাটলের মধ্যে কিছু সূক্ষ্ম চামড়ার টুকরো ছিল। M–Vac দিয়ে সেগুলো সংগ্রহ করে ফেলেছি। ডি.এন.এ. প্রিন্টও আজ হাতে পেলাম। এটা হুবহু ভ্যাজাইনাতে পাওয়া আন-আইডেন্টিফাইয়েড ডি.এন.এ.-র সঙ্গে ম্যাচ করছে। একরকম আমাদের তদন্তকারী দল নিশ্চিত যে এই ব্যক্তিই আততায়ী। কিন্তু এখন মূল সমস্যা হল, আমরা যে ক-জনের ডি.এন.এ. সংগ্রহ করেছিলাম তাদের কারও সঙ্গেই মেলেনি। বাদ থাকে শুধু ওষুধ ডিস্ট্রিবিউটার, প্রতীক আর নেতার শালা শ্যামলের। এদের মধ্যে প্রতীক সমস্তভাবে সাহায্য করতে রাজি আছে কিন্তু শ্যামল... মানে বুঝতেই পারছ। কিছু একটা লিঙ্ক না পেলে চেপে ধরতে পারছি না।"

"সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল বেঁকাতে হয় জানিস তো! আগে

boierpathshala.blogspot.com

ডি.এন.এ. স্যাম্পল জোগাড় কর। মিলে গেলে চেপে ধরা কেন, একদম কোমরে দড়ি দিস।"

শিবানী কিছুক্ষণ চুপ করে, ফরেনসিকের ডা. গুপ্তেকে ফোন করল, "আচ্ছা, আপনারা কী কী থেকে একটা লোকের ডি.এন.এ. প্রিন্ট তৈরি করতে পারবেন?"

"ম্যাডাম, ব্লাড হলে খুব ভালো। না হলে হেয়ার রুট, ইউরিন বা স্যালাইভা হলেও চলবে। কিন্তু শেষের দুটোতে একটু সময় লাগবে।"

শিবানী হুম বলে ফোন রেখে দেয়, ডেকে পাঠায় তাদের টিমেরই কর্মকারকে—"এই শ্যামল বলে লোকটার ডি.এন.এ. স্যাম্পল চাই, অ্যাট এনি কস্ট! তার ব্লাড, ইউরিন বা স্যালাইভা যে-কোনও কিছু হলেই চলবে। কিন্তু কেউ যেন এই মুহূর্তে জানতে না পারে। আর আমি প্রতীককে দেখছি।"

কর্মকার 'ওকে ম্যাডাম' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বাইরে গিয়ে সে পর পর কয়েকটা ফোন করে, "একটা ছবি পাঠিয়েছি, দেখ। নাম শ্যামল। সারাদিন ফলো কর। কখন কোথায় যায় তার ডিটেলস সব চাই। যত তাড়াতাড়ি হয়।"

* * * * * * * *

প্রতীকের উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি, টিকালো নাক, গলায় তিল, ক্লিন শেভ্ড। দেখতে নম্র, ভদ্র কিন্তু বেশ খোলা মনের। শিবানী প্রতীকের দিকে প্রথম প্রশ্ন ছুড়ে দেয়, "আরও একবার আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে, আশা করি আপনার কোনও সমস্যা নেই?"

প্রতীক একমুখ হেসে বলে, "এ আপনি কী বলছেন! আমার আপত্তি থাকবে কেন? আমি তো পুলিশকে পুরোপুরি হেল্প করতেই চাই। আগের দিন আপনি থানায় ডেকেছিলেন। আজ যখন আপনি আমার বাড়িতেই এসে হাজির, তখন এক কাপ চা করি। বসুন।"

শিবানী যেন এবার একটু সংকোচ বোধ করল, "না না। এসবের আবার... আসলে আমি একটু ব্যস্তও আছি। সময় বেশি নেই।"

boierpathshala.blogspot.com

মাঝপথেই প্রতীক থামিয়ে দিল, "ঠিক আছে। আমি আপনার সময় নষ্ট করব না। আপনি বরং প্রশ্ন করতে থাকুন। আমি চা করতে করতেই উত্তর দিচ্ছি। তাহলে হয়তো আর আপনার সময় নষ্ট হবে না।"

প্রতীক একটু ছোট্ট করে হেসে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। বসার ঘর থেকে রান্নাঘরটা সরাসরি দেখা যায় না। শিবানীকে প্রশ্ন করতে গেলেও একটু গলা তুলেই করতে হবে। তাই শিবানী উঠে রান্নাঘরের সামনেটায় গিয়ে দাঁড়াল। প্রতীক শিবানীকে দেখেই জিব কেটে বলল, "ইস্, আপনি উঠলেন কেন?"

"ইট'স অলরাইট। আপনি বরং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। সেদিন সকালে আপনি বাড়িতে ক-টার দিকে পৌঁছেছিলেন?"

আভেনে জলটা ফুটতে শুরু করেছে। প্রতীক হাতে চায়ের কৌটো নিয়ে মুচকি হেসে উত্তর দিল, "কেন, সেদিনই যে বললাম, বাড়ি ফেরার পথে সাড়ে পাঁচটায় এ.টি.এম. গিয়েছিলাম। আপনারা নিশ্চিতভাবে অলরেডি চেক করেছেন। ওখান থেকে আমার বাড়ি আধ ঘণ্টার পথ। ভোররাতে রাস্তা ফাঁকাই থাকে। তাই আমি বাড়ি ঢুকেছিলাম ওই ধরুন ছ-টা বাজার পাঁচ-দশ মিনিট আগে।" চায়ের পাতাগুলো জলে দিয়ে প্রতীক নাড়তে থাকে। ধীরে ধীরে জলের রংটা কালচে বাদামি হয়ে যায়। সেই সঙ্গে সারা ঘরটা চায়ের একটা মিষ্টি গন্ধ ভরে যায়।

শিবানী বলে, "আপনার ব্লাড স্যাম্পল দিতে কোনও আপত্তি আছে?"

প্রতীক চায়ের পাতাগুলো ছেঁকে নিয়ে কাপে লিকারটা ঢেলে দেয়, তারপর দুধটাও হালকা হাতে ঢালতে থাকে, "তার মানে আপনারা কোনও ডি.এন.এ. স্যাম্পল পেয়েছেন? মোস্ট পসিবলি? রাইট?"

শিবানী একটু এবার বিরক্ত হয়— "নান অফ ইয়োর বিজনেস!"

"চিনি ক-চামচ?"

"দুই। তাহলে আপনার কোনও আপত্তি?"

প্রতীক মুচকি হেসে চায়ের কাপটা বাড়িয়ে দেয়, "নো প্রবলেম, ম্যাডাম! আপনাদের ক-বোতল লাগবে?"

boierpathshala.blogspot.com

শিবানী একটু বিরক্ত হয়। লোকটা কি একটু বেশিই ক্যাজুয়াল বিহেভ করছে, "না, না। আমি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প খুলছি না। একটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জের সমান হলেই হবে।"

"তার মানে আমাকে আরও একবার লালবাজার যেতে হবে তাই তো?"

"হ্যাঁ। মানে বুঝতেই পারছেন।"

"ওকে। অলওয়েজ অ্যাট ইয়োর সার্ভিস। আর কিছু?"

শিবানী দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দেয়— "আর হ্যাঁ। আপনার গাড়িটা দেখতে চাই।"

প্রতীক ঘরের থেকে চাবিটা নিয়ে বাড়ির বাইরে আসে। গ্যারেজটা বাড়ির পিছনদিকে। টেম্পো ট্রাভেলারের তালা খুলে শিবানীর পাশে এসে দাঁড়ায়, "দেখে নিন।"

শিবানী এগিয়ে যায়। গাড়ির পিছনে কিছু ওষুধের খালি বাক্স রয়েছে। আর সাইড সিটের উপরে কতকগুলো ফাইল। সেগুলো উলটে-পালটে যা বুঝল, হিসেবপত্তরের ফাইল। তারপর সে সামনে এসে দেখতে গিয়েই চমকে ওঠে। সামনের সিটের নীচে কিছুটা ঝুঁকে পড়ে— একটা গাঢ় বাদামি রং যেন শুকিয়ে গেছে। আরও নিচু হয়ে সে শোঁকার চেষ্টা করে। শিবানী সজাগ হয়েই তড়িৎ গতিতে পিছনে ফেরে, "এ কী, এখানে রক্ত কেন? কার রক্ত?"

প্রতীক হঠাৎ করে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে, "ও হ্যাঁ। ওটার কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম। ওই যে আগের দিন বলেছিলাম না, রেস্টুরেন্টে একটা ওয়েটারের মাথায় মেয়েটি কাচের গ্লাস ভেঙেছিল? ওই ওয়েটারটাকে নিয়েই পাশের হসপিটালে গিয়েছিলাম। সঙ্গে আরও একজন ওয়েটার ছিল।"

শিবানীর চোয়াল দৃঢ় হয় আর চোখগুলোও যেন সবকিছুকে মেপে নিতে চায়। প্রতীক আমতা আমতা করতে থাকে, "বিশ্বাস করুন। আপনি চাইলে ওই হসপিটালে গিয়েও খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন। আমি ওদের নিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর আবার ওদের হোটেলের কিছুটা দূরে নামিয়ে দিই। যখন ছাড়তে গিয়েছিলাম তখনও মেয়ে দুটো ওখানেই ছিল। তারপর মেয়ে দুটো বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর আমিও চলে এলাম। বিশ্বাস না হলে ওয়েটার

boierpathshala.blogspot.com

দু-জনকেও জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন।"

শিবানী চিবিয়ে চিবিয়ে উত্তর দিল, "সেটা আপনাকে ভাবতে হবে না। কাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, আমি বুঝব। আমি আপাতত এই ম্যাটটা নিয়ে যাচ্ছি। ল্যাব টেস্টের জন্য। আর কাল লালবাজার আসবেন একবার।"

প্রতীক এবার যেন কিছুটা সন্ত্রস্ত— "ও.কে., ও.কে., তা-ই হবে।"

শিবানী ম্যাটটা রোল করে নিয়ে পা বাড়ায়— "ভুলেও পুলিশকে না জানিয়ে শহর ছাড়ার চেষ্টা করবেন না। ফল ভালো হবে না।" প্রতীক একটা অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়াল।

* * * * * * * *

ওদিকে কর্মকারের খোঁচড়রা শ্যামলের সারাদিনের রোজনামচা জানিয়ে দিয়েছে। প্রত্যেক বুধবার সন্ধেবেলা শ্যামল শহরের একটা বারে যায়। এর থেকে ভালো সুযোগ আর হয় না। বারে কর্মকার শ্যামলকে চোখে চোখে রাখল। দু-তিনবার সিগারেট খেয়ে বাটগুলো ডাস্টবিনে ফেলল। তাই কর্মকার চাইলেও সেগুলো কালেক্ট করতে পারল না। কয়েক পেগ মদ খেল বার কাউন্টারে বসেই। গ্লাসগুলো কর্মকার কালেক্ট করার আগেই বারটেন্ডার নিয়ে ব্যবহৃত গ্লাসের বাস্কেটে ফেলে দিল। ব্যাপারটা যেহেতু গোপনে করার নির্দেশ আছে তাই কর্মকার বারের ম্যানেজার বা বারটেন্ডারকে এখুনি নিজের পরিচয় দিতে চাইল না। কিন্তু এভাবে আদৌ কিছু করা যাবে কি না, কর্মকার সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ল। একের পর এক সুযোগ ছাড়তে থাকল। কর্মকারের মনে হতে থাকল শ্যামল লোকটা জাতে মাতাল, তালে ঠিক।

অবশেষে টালমাটাল পায়ে লোকটা পানশালা থেকে বেরিয়ে রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল। কর্মকারও পিছন পিছন গিয়ে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়াল। আজ আর হবে না মনে হয়! লোকটা কিছুক্ষণ ট্যাক্সির জন্য ওয়েট করে একটা সিগারেট ধরিয়ে রিকশায় ওঠে। কর্মকার দেখল এই শেষ সুযোগ। রিকশার পিছন পিছন দৌড়োতে থাকে। কিছু দূর যেতেই সিগারেটটা শ্যামল ফেলে দেয়। কর্মকার এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে হাতে গ্লাভস পরতে পরতে

boierpathshala.blogspot.com

ছুটতে থাকে। কাছে এসে সিগারেটের বাটটা চিমটে দিয়ে তুলে নিয়ে এয়ারটাইট পাউচে ভরে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গেই শিবানীকে ফোন করে, "হ্যালো ম্যাডাম, কাজ হয়ে গেছে। না, না। আমি এখুনি ল্যাবে আসছি..."

* * * * * * * *

"...অবশেষে জোড়া খুনের সমাধান করে ফেলল লালবাজার। লোকাল থানা প্রথমে দুর্ঘটনা বলে মনে করলেও লালবাজারের দুঁদে গোয়েন্দারা খুনের চক্রব্যূহকে ভেদ করলেন..." রবিবার সকালের টিভি-র নিউজটা দেখে জেঠুমণি মুচকি হেসে ফেলল।

শেখরবাবু সকালের চা-টায় চুমুক দিয়ে বললেন, "কী রে বানী, এই কেসটা তো সল্‌ভ হল, তা জেঠুকে আজ কী খাওয়াবি?"

শিবানী বলে ওঠে, "জেঠু যা খেতে চাইবে তা-ই হবে।"

জেঠুমণি বলে, "ওসব ছাড়। কেসের বাকি ডিটেলসটা তো এখনও আমায় বললি না। শ্যামলের ডি.এন.এ. জোগাড়ের পর কী হল!"

শিবানী হাতের চা নামিয়ে শুরু করে, "শ্যামলের পিছনে বৃথাই ছোটা হল। ওর ডি.এন.এ. মেলেনি। ভেবে দেখো, যখন মনে হচ্ছিল কেসটা প্রায় গুটিয়ে এনেছি; তখন রিপোর্টটা দেখে আকাশ ভেঙে পড়ল। প্রতীকের ব্লাড স্যাম্পল সে নিজেই দিতে রাজি হয়েছিল, তার ডি.এন.এ.-র সঙ্গেও মেলেনি। এরকম অবস্থায় যে কী করব, বুঝে উঠতে পারছিলাম না। খুনের সব প্রমাণ আছে, এভিডেন্স আছে, শুধু আততায়ীই নিখোঁজ। তাই আবার প্রথম থেকে শুরু করলাম। এবার মনে মনে ঠিক করে নিলাম, অল পসিব্‌ল কন্ডিশনস সমানভাবে চেক করব।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটা আবার চেক করলাম। সব মিলিয়ে যে চারটি গাড়িকে আমরা ক্যামেরাতে দেখেছিলাম, তাদের সবার সঙ্গে আবার একপ্রস্থ কথাবার্তা হল। এবার তাদের গাড়িও চেক করার সিদ্ধান্ত নিলাম। মানে একরকম বলতে পারো, অন্ধকারে যা পাচ্ছিলাম, হাতড়ে ধরছিলাম। এইভাবেই এই কেসের শেষ আর গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্কটা পেলাম। যেটা এতটাই তুচ্ছ যে আমরা ধরছিলামই

boierpathshala.blogspot.com

না। প্রতীকের ছোট টেম্পো ট্রাভেলার টাইপের গাড়িটি নিয়ে সে নিজেই তিন-চার মাসে একবার করে কলকাতার বাইরে থেকে মাল তুলতে যায়। ওই ঘটনার পর সে আর এর মধ্যে বাইরে যায়নি। গ্যারেজে তার গাড়িটি চেক করতে গিয়ে ম্যাটে অনেকটাই শুকনো রক্তের দাগ পাওয়া যায়।"

শেখরবাবু বলে ওঠেন, "কার রক্ত?"

"উফ... বাবা, বলছি তো, শোনো-না! প্রতীককে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি, সেদিন ওই ধাবাতে সে-ও ছিল। মেয়ে দুটি একটি ওয়েটারের মাথায় গ্লাস ভেঙে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটালে, প্রতীকই ওই ওয়েটার আর তার এক সাথিকে নিয়ে তাড়াতাড়ি হসপিটালে যায়। হসপিটালে কয়েকটা সেলাই দিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রতীকই নিজের গাড়ি করে ডিসেরগড় ব্রিজের কাছে তাদের ছেড়েছে। ম্যাটের শুকিয়ে-যাওয়া রক্ত থেকে ডি.এন.এ. স্যাম্পল সংগ্রহ করা যায়নি। খোলা হাওয়া আর অতিরিক্ত উত্তাপের কারণে তা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ধাবার সিসিটিভি ফুটেজ থেকেও প্রতীকের বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করে দেখলাম, ওয়েটারটির মাথা ফাটার প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর মেয়ে দুটি ওখান থেকে বের হয়, আর তার মধ্যে সঙ্গী ওয়েটারটি ধাবাতে ফিরে এসেছিল।"

জেঠুমণি হেসে বলল, "এই কেসে ওই একটাই মোক্ষম অস্ত্র ছিল, ডি.এন.এ.। না হলে হয়তো কোনওদিনই ধরা সম্ভব হত না... যা-ই হোক, তারপর বল।"

"একরকম জেদের বশেই যে হসপিটালে ওয়েটারটি গিয়েছিল, সেখান থেকে ফোন করিয়ে ডেকে পাঠালাম। ডাক্তারদের সাহায্যেই ব্লাড স্যাম্পল নিয়ে কলকাতা পাঠালাম। ফরেনসিক রিপোর্ট দিল— এগজ্যাক্ট ম্যাচ নয় তবে এই স্যাম্পলের সঙ্গে অনেক অংশেই মিল আছে। অর্থাৎ তার এই স্যাম্পলটির কোনও নিকট আত্মীয়। আমরা সঙ্গে সঙ্গে এই ওয়েটার, হৃতেশকে তুলে নিলাম। তারপর আর কী! জানোই তো লালবাজারের মার! একটু কড়কে দিতেই স্বীকার করল ওর সঙ্গী ওয়েটারটি ওর ভাই জিগ্নেশ। হোটেলে ফিরে যেতেই মেয়েগুলোকে তখনও দেখে মাথা-গরম জিগ্নেশ

boierpathshala.blogspot.com

দাদাকে ফোন করে ডিসেরগড় ব্রিজের কাছে অপেক্ষা করতে বলে। জিগ্নেশও চুপচাপ বেরিয়ে চলে আসে।

তারপর মেয়ে দুটির গাড়ি ব্রিজের একটু দূরে রাস্তার পাথর ফেলে থামায়। মদ্যপ মেয়ে দুটি খুব একটা বাধা দেওয়ার মতো অবস্থায় ছিল না। তাদের নিয়ে জিগ্নেশ আর হৃতেশ ছিন্নমস্তার মন্দিরের কাছাকাছি একটা জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যায়। প্ল্যান ছিল, ধর্ষণ করে ছেড়ে দেবে। কিন্তু সবকিছুর পর, মেয়ে দুটির ধীরে ধীরে চেতনা আসতে শুরু করলে একজন খামচাখামচি করতে শুরু করে, অন্যজন চিৎকার করে পালাতে চেষ্টা করে। জিগ্নেশ মেয়েটিকে ধরে ফেলে, ডিকির উপর ঘাড় চেপে ধরে চুপ করানোর চেষ্টা করলেও, বিফল হয়। রাগের মাথায় পাশে পড়ে-থাকা পাথর তুলে মাথার পিছনে মারে। আর এই সময়ই নিশ্চয় গাড়ির ডিকিতে ডেন্টটা হয়। মেয়েটি তখনই মারা যায় কি না ওরা জানে না। কিন্তু ভয়ে অন্য মেয়েটির শ্বাসরোধ করে খুন করে দেয়। এরপর আমাদের সবার জানা। গাড়িটি জিগ্নেশ বাকি রাস্তা চালিয়ে দামোদরের ঘাট পর্যন্ত এনে জলে ফেলে দেয়। অন্ধকারে জলে ফেলতে যাওয়ার সময়ই কোনও পাথরে ধাক্কা খেয়ে সামনেরটাও থোবড়াল। জিগ্নেশ তুলনামূলক একটু বেশি লম্বা, তাই গাড়ির সিট স্বাভাবিকভাবেই পিছনের দিকে সরানো ছিল।" শিবানী এবার একবুক শ্বাস নিয়ে বলল, "এবার কিছুদিন আমি ছুটি কাটাব, ব্যাস।"

শেখরবাবু হেসে বললেন, "তা নিয়ে নে।"

জেঠুমণিও হেসে ওঠে। এমনই সময় টেবিলে রাখা ল্যান্ডফোনটা বেজে ওঠে, "হ্যালো, মিস্টার রুদ্র কথা বলছেন?"

জেঠুমণি তাঁর স্বাভাবিক ভারী কণ্ঠস্বরেই উত্তর দিলেন, "এখানে দু-জন মিস্টার রুদ্র, আপনি কোন রুদ্রকে চাইছেন?"

"আজ্ঞে, প্রখর রুদ্র..."

"ইয়েস, প্রখর রুদ্র স্পিকিং..."

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

বৃন্দাবনে বিভীষণ

টেবিলে রাখা ল্যান্ড ফোনটা বেজে ওঠে, "হ্যালো, মিস্টার রুদ্র কথা বলছেন?"

জেঠুমণি তাঁর স্বাভাবিক ভারী কণ্ঠস্বরেই উত্তর দিলেন, "এখানে দু-জন মিস্টার রুদ্র, আপনি কোন রুদ্রকে চাইছেন?"

"আজ্ঞে, প্রখর রুদ্র..."

"ইয়েস, প্রখর রুদ্র স্পিকিং..."

"আপনার সঙ্গে কখন দেখা করা যাবে?"

"কী ব্যাপারে?"

"সেটা মনে হয় দেখা করে বলতে পারলেই বেশি সুবিধা হত।"

"কোনও সেলসম্যান, ক্রেডিট কার্ড বা জীবনবিমা এজেন্ট হলে, অযথা এসে আমার এবং আপনার দু-জনেরই সময় নষ্ট করবেন না..."

"না, না। সেসব নয়। আসলে দরকারটা একান্তই ব্যক্তিগত। একটু পরামর্শের প্রয়োজন।"

"আমি আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারব জানি না। তা-ও আসুন কাল সন্ধেবেলাতে।"

* * * * * * * *

পরদিন ঠিক সন্ধে সাড়ে ছ-টায় একটি মধ্যবয়স্ক লোক এসে উপস্থিত হয়। জেঠুমণি নিজের ইজিচেয়ারে বসে লোকটিকে ভালো করে দেখে— মধ্যবয়স্ক, প্রায় টাক মাথা, গোলগাল মুখ, চোখগুলো একটু বেশিই বড়। গায়ের রং শ্যামলাই বলা চলে। তবে পোশাকে একটা আভিজাত্যের ছাপ আছে। জেঠুর সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছে শুনে শিবানীর ছোটবোন ইন্দ্রাণী আজ নিজেই কফি নিয়ে জেঠুর ঘরে এসেছে।

জেঠুমণি বলল, "বলুন, আপনাকে কী পরামর্শ দিতে পারি?"

এবার লোকটি শুরু করে, "আজ্ঞে, আমার নাম সদাশিব পাত্র। আমার বোন, অনীতা ডানকুনি থানার অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনস্পেকটর ছিল। এক সপ্তাহ আগে মারা গেছে– আত্মহত্যা। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার বোন এতটাও নরম মনের মেয়ে নয়। ও এরকম করতেই পারে না। এখন আপনি যদি একবার..."

"খুলে বলুন, তারপর দেখছি।"

"আজ্ঞে, ও থাকত মনোহরপুরে একটি ফ্ল্যাটে। নাম বৃন্দাবন নিবাস। এক ছেলে, এক মেয়ে আর... মানে আর কী ওর এক পুরুষ সঙ্গী।"

"স্বামী?"

"স্বামীর সঙ্গে দু-বছর আগে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। যে রাতে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে আসে, সে রাতে ওই বন্ধুটির বাড়িতেই ওঠে। তারপর ওখানেই থেকে যায়। প্রথম প্রথম ভালো চলছিল বলে, আমিও আর এই নিয়ে আপত্তি করিনি। আগের সংসারে এমনিতেই ও সুখী ছিল না। বাবা বেঁচে থাকতে ওর একুশ বছর বয়সে একরকম জোর করেই বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন। এখনকার সঙ্গীটির নাম বিনোদ ভীষেন, অবাঙালি। অনীতা বিয়ের আগে থেকেই চিনত তা বোধহয় আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অবাঙালির সঙ্গে বাবা বিয়ে দিতে রাজি ছিলেন না। বাবা গত হয়েছেন পাঁচ বছর হয়েছে। বিয়ের পর অনীতা আমাদের সঙ্গে একপ্রকার অভিমানে কোনও সম্পর্কই প্রায় রাখেনি। বিনোদের কাছে যখন থাকতে আসে, তার পরদিন সকালে বিনোদই আমাকে ফোন করে জানায়। প্রথমটা একটু খারাপ লেগেছিল। যতই হোক, একটা সমাজে থাকি, লোকলজ্জার ভয় তো থেকেই যায়! কয়েকবার দেখা করে শ্বশুরবাড়ি ফিরে যেতে বলি। কিন্তু ও পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, একবার আমরা তার জীবন নষ্ট করেছি কিন্তু আর নয়! ভাবলাম, যদি এভাবেই ও ভালো থাকে তো থাকুক। সমস্যা বাধে সাত-আট মাস আগে। বিনোদের চাকরিটা হঠাৎ চলে যায়। ওর একটি খারাপ অভ্যাস হল অতিরিক্ত মদ্যপান। একে চাকরি নেই, তায় দামি মদ! ওদের সম্পর্ক তিক্ত হতে সময় লাগল না। তখন মাঝেমাঝেই আমায় ফোন করে কান্নাকাটি করত আর বলত ওই হচ্ছে দুর্ভাগা। আমার কাছে এসে থাকতে বলেছিলাম

boierpathshala.blogspot.com

কতবার। কিন্তু রাজি হয়নি। তারপর আগের সপ্তাহে শনিবার সন্ধেতে কথা কাটাকাটি, রাগারাগি। তারপরই দুর্ঘটনাটি ঘটে। তবে ঘটনাস্থলে ও মারা যায়নি। বিনোদই ফোন করে ট্যাক্সি ডেকে হসপিটালে নিয়ে যায়। সেখানেই মারা যায়।"

সদাশিববাবু রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে থাকেন। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, জেঠুমণি হাতের ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বলল, "সবই বুঝলাম। দেখুন, আমার বয়স হয়েছে। তার উপর আমি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরও নই। আপনি পুলিশের কাছে যান।"

সদাশিববাবু কিছুটা মুষড়ে পড়লেন, "আসলে ডানকুনি থানাই কেসটা দেখছিল। তারা খুব তাড়াতাড়ি কেসটি আত্মহত্যা বলেই বন্ধ করে দিতে চাইছে। এরকম অবস্থায় আমি অসহায়। ওই থানারই এস.আই. বললেন, আপনাদের বাড়িতে বছর পাঁচেক আগে তিনি একটি কেসের ব্যাপারে আপনার ভাইয়ের কাছে ফলো-আপে এসেছিলেন। তখনই তিনি আপনার সঙ্গে পরিচিত হন। সে-ই আপনার কথা বলল।"

জেঠুমণি কফির কাপে এক চুমুক দিয়ে বলল, "হতে পারে। কিন্তু আমায় মাপ করুন। আমার পক্ষে ছোটাছুটি করা সম্ভব নয়।"

ইন্দ্রাণী এবার জেঠুর দিকে ফিরে বলল, "ছোটাছুটিটা আমি করতে রাজি হলে, তুমি কি আমায় গাইড করবে?"

"দেখ, পুলিশ যেখানে কাজ করছে সেখানে এভাবে মাথা গলানোটা ঠিক না। আর তুই এসব করে কী করবি বল তো?"

"ও! দিদি আর বাবাকে হেল্প করার বেলায় সব ঠিক আছে। আমি কিছু করতে চাইলেই সমস্যা। কেন? ওদের গায়ে উর্দি আছে বলে? তোমার কি মনে হয়, আমার দ্বারা হবে না?"

জেঠুমণি একটু চুপ করে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, "তুই হয়তো আমাদের মধ্যে সব থেকে ভালো পারবি। তবু আমি তোকে সাহায্য করতে পারব না।"

"কেন জানতে পারি?"

"দায়িত্বহীন ক্ষমতা মানুষকে তার সীমাবদ্ধতা ভুলিয়ে দেয়। সে সব জায়গায় ঢুকে পড়তে চায় আর তারপর একদিন সে সবকিছু হারিয়ে বসে থাকে। তোর

boierpathshala.blogspot.com

দিদি আর বাবা তাদের চাকরির কাছে সীমাবদ্ধ। ওরা চাইলেও নিয়ম ভেঙে কিছু করতে পারবে না। তুই পারবি, আর ভয়টা সেখানেই।" জেঠুমণি হাতের কাপটা টেবিলে রেখে সদাশিব পাত্রর দিকে ফিরে বলল, "আপনি আসতে পারেন।"

ইন্দ্রাণী মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে সদাশিববাবুর দিকে তাকিয়ে রুক্ষস্বরে বলে উঠল, "আমি জানি, আমায় বিশ্বাস না করাটাই স্বাভাবিক। তবে যদি আপনার আর কোনও রাস্তা খোলা না থাকে, আমাকে আপনার কেসটি দিলে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।" জেঠুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার কারও হেল্প দরকার নেই। এই আমার ফোন নম্বর কাগজে লিখে দিলাম।"

সদাশিব পাত্র আর কোনও কথা না বলে, কাগজটা নিয়ে নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন।

* * * * * * * *

"মা, ও মা... আমার আইডেন্টিটি কার্ডটা কোথায়?" সকাল সকাল শিবানী চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করে ফেলল। সকালে রেডি হয়ে ক্রাইম ব্রাঞ্চ বের হওয়ার সময়ই শিবানী আর তার কার্ডটি কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না। ইনস্পেক্টর হওয়ার পর থেকে সে প্রত্যেকদিন আই কার্ডটি সযত্নে তার ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে রাখে। আজ সেখান থেকে বেপাত্তা। পনেরো-কুড়ি মিনিট ধরে মা, মালতী সবাই খুঁজেও বিফল। শেষমেশ রেগে শিবানী ক্রাইম ব্রাঞ্চে বেরিয়ে যায়।

* * * * * * * *

"নমস্কার। আমার নাম শিবানী রুদ্র, ক্রাইম ব্রাঞ্চ। আপনাদের থানাতেই তো ক-দিন আগে অনীতা পাত্রর কেসটা এসেছে। আপনাদেরই এ.এস.আই ছিলেন।" ডানকুনি থানার এস.আই. বিমলবাবু কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বললেন, "উনি অনীতা পাত্র নন। অনীতা দাস। বিবাহিত। এক ছেলে ও এক মেয়ে আছে। কিন্তু ওঁর কেস ক্রাইম ব্রাঞ্চ তদন্ত করছে কেন?"

"আজ্ঞে, আমি ইন্ডিপেনডেন্টলি ব্যাপারটা দেখছি আর কী। অনীতা আমার বিশেষ পরিচিতা ছিলেন। তাই আর কী..."

boierpathshala.blogspot.com

বিমলবাবু সন্দিগ্ধভাবে তাকালেন, "তা আপনার আইকার্ডটা? আপনি কি শেখর রুদ্রর মেয়ে?"

"আজ্ঞে। এই যে কার্ডটা।"

বিমলবাবু কার্ডটা ভালো করে দেখে বললেন, "হ্যাঁ সব ঠিক আছে। বলুন কী হেল্প করতে পারি?"

"আপাতত ফাইলটা..."

বিমলবাবু একটি ফাইল তাক থেকে টেনে সামনের টেবিলে দিয়ে দিলেন।

* * * * * * * *

সারাদিন পর ইন্দ্রাণী বাড়ি ফিরতেই মা কুন্তলাদেবী বলে উঠলেন, "তুই ফিরলে আগে জেঠু দেখা করতে বলেছে।" ইন্দ্রাণী কোনও কথা না বলে জেঠুর ঘরে ঢুকে দেখল, জেঠু ল্যাপটপে কিছু একটা করছে।

জেঠুমণি মাথা না তুলেই দৃঢ়কণ্ঠে বলল, "শিবানীর আই-কার্ডটা ফেরত দে। ওর নাম করে ডানকুনি থানায় গিয়ে একটা এক্তিয়ারবহির্ভূত কাজ করে এসেছিস। দেখলি তো, যাদের দায়িত্ব থাকে না, তাদের সীমারেখাও থাকে না।"

ইন্দ্রাণী একটু রাগি স্বরেই বলল, "বেশ করেছি। দু-জনে যখন যমজ বোন, এইটুকু ফায়দা না তুললে আমি এগোতে পারতাম না।"

"হুঁ। তা কেসটা কি সদাশিববাবু তোকে দিলেন। নাকি নিজেই?"

"কাল রাতে উনি ফোন করেছিলেন। বললেন, যদি আমি কিছু করতে পারি, উনি কৃতজ্ঞ থাকবেন। পুলিশের রিপোর্টগুলো দেখার দরকার ছিল, তাই দিদির আই-কার্ডটা কাল রাতেই সরিয়ে ফেলেছিলাম।"

জেঠুমণি ল্যাপটপটা বন্ধ করে বলল, "তা কী কী পেলি বল?"

"না। তুমি তো বলেইছ হেল্প করবে না..."

"মাথা ঠান্ডা করে বোস। আমি চাই না আর কোনও গোলযোগ তুই পাকাস। তাই... নে এবার বল।"

ইন্দ্রাণী একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে, "ব্যালেস্টিকের রিপোর্টে কনফার্মড যে দুটি গুলিই অনীতার সার্ভিস রিভলভার থেকেই চলেছিল। একটা

boierpathshala.blogspot.com

বুলেট অনীতার মাথার খুলির উপরের অংশে বড় চিড় ধরিয়ে দিয়ে দেওয়ালে লাগে, অন্যটি ব্ল্যাঙ্ক দেওয়ালে লাগে। প্রথমটায় অনীতার রক্তের ট্রেস ছিল, অন্যটায় ছিল না। তাই ধরে নেওয়া যায়, অন্যটি মিসহিট ছিল। ব্যালেস্টিকের রিপোর্ট থেকে পরিষ্কার, প্রথম গুলিটা যখন দেওয়ালে লাগে তার ইমপ্যাক্ট অনেক কম ছিল। অপেক্ষাকৃত দ্বিতীয় গুলিটার ইমপ্যাক্ট অনেক বেশি ছিল। দ্বিতীয় গুলিটা প্রথমটার থেকে কম দূরত্ব থেকেই ছোড়া, এটাও সেই একই কারণে অনুমান করা হয়েছে। এবার আসি পোস্টমর্টেম রিপোর্টে। বন্দুকের ব্যারেল মাথায় ঠেকিয়েই গুলি করা হয়েছে। গুলি লেগেছে ডানদিক থেকে বাঁদিকে– প্রায় একটি অনুভূমিক সরলরেখা হল গুলির গতিপথ। গুলির আঘাতের চারপাশের চামড়ার অনেকটা অংশই পোড়া ছিল, অনীতার হাতে গান পাউডারের ট্রেস। সব মিলিয়ে একটা পারফেক্ট সুইসাইডে যা যা এভিডেন্স থাকে, সবই ছিল। তাই অন্য কোনও সন্দেহের জায়গা নেই। তা-ও আরও কিছু জানতে বিমলবাবুকে প্রশ্ন করে জানতে পারলাম, সেদিন বিনোদবাবুই তড়িঘড়ি একটি ট্যাক্সি করে অনীতাকে নিয়ে হসপিটালে পৌঁছোন। যখন হসপিটালে পৌঁছেছিলেন তখনও অনীতার জ্ঞান ছিল। অনীতা মারা যায় অপারেশন টেবিলে। ডাক্তার ও নার্সরাও তাদের জবানবন্দিতে একই কথা বলেছে। এখানে বিমলবাবু একটি যুক্তিপূর্ণ পয়েন্ট তুলেছেন, বিভীষণই যদি অনীতাকে গুলি করে থাকে, তাহলে তাকেই আবার বাঁচানোর জন্য হসপিটালে কেন নিয়ে যাবে!"

জেঠুমণি চোখ-মুখ কুঁচকে বলল, "কী! বিভীষণ! সেটা কে?"

"অফফ! বিভীষণ না। বি. ভীষেন। বিনোদ ভীষেন। আসলে সারাদিন বিমলবাবু এতবার 'বিভীষণ বিভীষণ' করছিলেন, যে আমারও তা-ই হয়ে গেছে।"

"বুঝলুম! এটা একটা ভ্যালিড পয়েন্ট তো বটেই। তবে এখুনি তোদের বিভীষণকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ না-দেওয়াই ভালো।"

ইন্দ্রাণী জল খেতে খেতে বলল, "কিন্তু ব্যালেস্টিক রিপোর্ট আর পোস্টমর্টেমের রিপোর্টের পর তো সত্যি বলতে আর কোনও সন্দেহের

boierpathshala.blogspot.com

অবকাশ থাকছে না। ইভ্‌ন বন্দুকের বাঁটে ফিঙ্গারপ্রিন্টটাও অনীতার নিজের! নিদেনপক্ষে যদি এরকম হত যে অনীতা বাঁহাতি আর গুলি চলেছে ডান হাতে, তাহলেও না হয় একটা ভাবার জায়গা ছিল। ধুস, এমন একটা কেস পেলাম, কিছুই নেই এতে!"

জেঠুমণি এবার হেসে উঠল, "তোর গোয়েন্দা গল্পের নায়িকা হওয়াই উচিত ছিল," আরও একচোট হেসে, "ডান হাত-বাম হাত! একদম পারফেক্ট গোয়েন্দা গল্প। জেনারেলি সব গোয়েন্দা গল্পের সুইসাইডকে ওই একটিভাবেই খুনে পর্যবসিত করে তদন্ত শুরু করেন গোয়েন্দারা। কিন্তু সমস্যা হল, বাস্তবে আমরা প্রায় আশি শতাংশ মানুষই ডানহাতি। এই বাকি কুড়ি ভাগ মানুষের মধ্যে আবার বাঁ হাতটি তাঁরা নিজেদের একটি বিশেষ কাজেই শুধুমাত্র ব্যবহার করেন, বাকি সব কাজই ডান হাতে তাঁরা করে থাকেন। যেমন সৌরভ গাঙ্গুলি— ব্যাট করেন বাম হাতে, বাকি সব কাজই করেন ডান হাতে। কলেজে আমার এক বন্ধু ছিল— সে শুধু লিখত বাম হাতে, বাকি সব কাজ ডান হাতেই করত। বাস্তবে এরকম বামহাতির সংখ্যাই বেশি। সত্যি বলতে, যাঁদের বাম হাতটা ডমিনেটিং হ্যান্ড অর্থাৎ সব কাজই প্রায় বাম হাতে করেন এরকম মানুষের সংখ্যাটা বেশ কম। যেমন— দেবশ্রী রায়। তাই যে খুন করেছে, বাঁ হাত যদি তার ডমিনেটিং হ্যান্ড না হয় তাহলে সে ডান হাতেই গুলি চালাবে। একই যুক্তি অনীতার জন্যও খাটে। তাই এসব কপি বুক মার্কা গোয়েন্দার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যা যা দেখছিস, তার মধ্যে কিছু ইললজিক্যাল আছে কি না ভাব।"

"অনীতার আগের স্বামী পার্থর সঙ্গে দেখা করেছি আমি। পার্থর সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, সে যথেষ্টই ফুঁসছে রাগে। গত দু-বছর অনীতার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। অনীতা মারা যাওয়াতে সে ভিতরে ভিতরে কোথাও যেন একটু হলেও খুশি। অনীতার চলে আসার পর থেকে সে পাড়া-প্রতিবেশী আর বন্ধুদের তির্যক মন্তব্যে জেরবার। প্রথমে মুখের উপর তো দরজা বন্ধ করে দিচ্ছিল। দিদির ক্রাইম ব্রাঞ্চের আই-কার্ডটা দেখে কথা বলতে রাজি হল। তা-ও পাঁচ মিনিট পরেই যখন জানতে পারল আমি ব্যক্তিগত পর্যায়ে

boierpathshala.blogspot.com

খোঁজখবর করছি, তখন একপ্রকার বের করে দিল। এটুকু ছাড়া আর কিছুই তো তেমন সন্দেহের পাচ্ছি না।"

* * * * * * * *

পরদিন সন্ধেবেলা ফিরেই ইন্দ্রাণী ছুটতে ছুটতে জেঠুর ঘরে ঢুকে স্লিং ব্যাগটা ছুড়ে সোফায় ফেলে দিল, 'তাড়াতাড়ি এদিকে দেখো,' বলেই হোয়াইট বোর্ডটা টেনে নিয়ে ঘরের মাঝখানে নিয়ে এল। ইন্দ্রাণী বলতে শুরু করল, "দেখো। যখন অনীতার গুলি লাগে, বিভীষণের বয়ানানুযায়ী অনীতা খাটে বসে ব্যাগ গোছাচ্ছিল। পুলিশের রিপোর্টে ও ছবিতে, সারা ঘর জুড়ে এলোমেলো ছড়ানো কাপড়জামা আর একটা খোলা স্যুটকেস। আর বিছানার উপর কিছুটা রক্তের দাগ। এখন মেঝে থেকে খাটের উচ্চতা ৩৬.৫ সেমি। অনীতার বডির উপরের অংশের উচ্চতা ৮৫ সেমি আর নীচের অংশের উচ্চতা ৯৯ সেমি। মানে খাটে বসে-থাকা অবস্থায় অনীতার মাথা মেঝে থেকে প্রায় ১২১.৫ (৩৬.৫ + ৮৫) সেমি উচ্চতায় থাকার কথা। অনীতার খুলি ছুঁয়ে-যাওয়া প্রথম গুলিটির চিহ্ন দেয়ালে মেঝে থেকে ১২১ সেমির উপরে পাওয়া গেছে। এখানেই আমার তোমার কাছে কতকগুলো প্রশ্ন আছে। কোনও মানুষ যখন নিজের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে আত্মহত্যা করে তখন কনুই থেকে বেঁকিয়ে নিজের মাথায় পিস্তল রাখে। মানে টোটাল তিনটে বডি জয়েন্ট থাকে— সোলডার জয়েন্ট, এলবো জয়েন্ট আর কবজির জয়েন্ট। এই তিনটে জয়েন্টই যদি মোটামুটি সমান উচ্চতায় থাকে তাহলেই গুলি স্ট্রেট লাইনে সুইসাইডারের খুলি ভেদ করতে পারে। কিন্তু

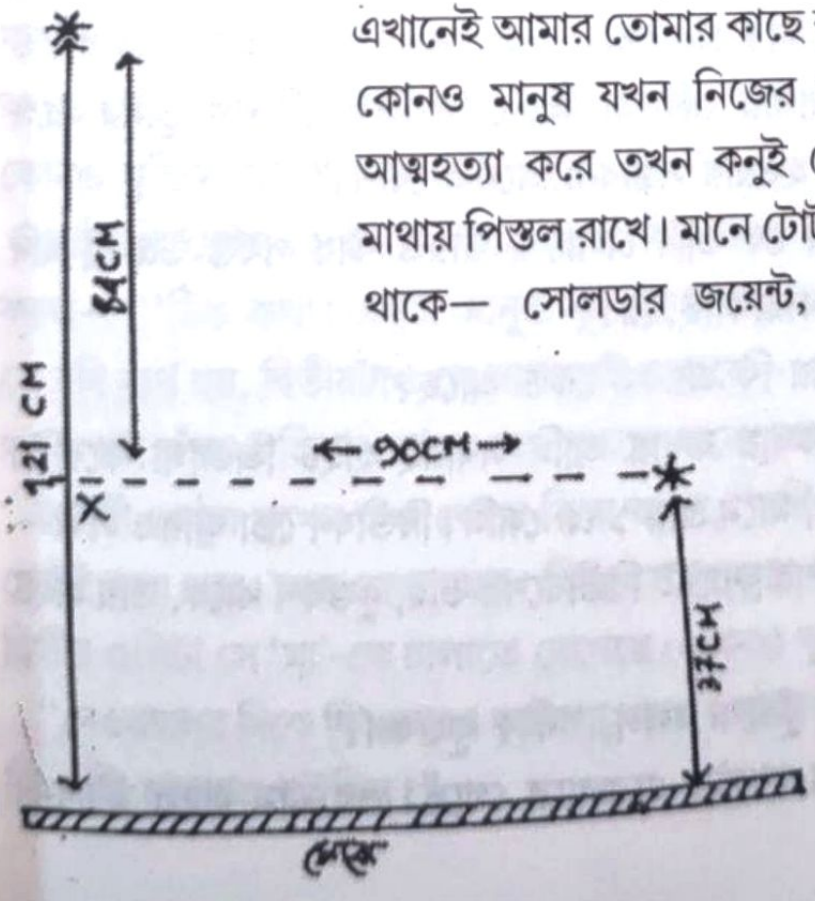

boierpathshala.blogspot.com

মোস্ট অফ দ্য কেসেস, সুইসাইডারের কবজি জয়েন্ট হয় উর্ধ্বমুখী, না হলে নিম্নমুখী। এখন কবজি জয়েন্ট মাত্র এক সেমি উপরের দিকে হলে, মাথার ডানদিকের গুলির ক্ষত থেকে বাঁদিকের ক্ষত আরও উপরের দিকে হবে। মানে গুলিটি যখন দেওয়ালে লাগবে, এই ডিভিয়েশনটা বেড়ে হয়তো আরও ৯-১১ সেমি উপরে হবে। মানে মেঝে থেকে প্রায় ১৩০ সেমি বা তার বেশি। আবার একইভাবে কবজি নিম্নমুখী হলে মেঝে থেকে এই উচ্চতাটা কমে দাঁড়ানোর কথা ১১২ সেমি বা তার কম। তোমার কী মনে হয়?"

জেঠুমণি হোয়াইট বোর্ডের দিকে ইন্দ্রাণীর করা আঁকাজোকাগুলো মন দিয়ে দেখে আস্তে আস্তে বলল, "ঠিক কথা। তাছাড়া এই তিনটে জয়েন্টকে একই উচ্চতায় ভূমির সমান্তরাল রেখে গুলি চালানোটা প্রায় অসম্ভব। কারণ তার জন্য কনুইটিকে যতটা উঁচুতে রাখতে হবে, তাতে ট্রিগার টানতে কবজিতে একটা বিরাট টান অনুভব করবেই যে-কেউই। এখন কথা হল, একটা আত্মহত্যা করতে এত কষ্ট করতেই বা কেউ যাবে কেন! এক যদি সে আত্মহত্যাটিকে একটি শৈল্পিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে না চাইছে! রাগের মাথায় অনীতার কি এতটা ভেবে আত্মহত্যা করার মতো মানসিক অবস্থায় আদৌ থাকা সম্ভব! মনে হয় না। তার থেকে বরং সোজা হাতে আমি যদি কারও পাশে দাঁড়িয়ে তার মাথায় গুলি চালাই, সে গুলির গতিপথ ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল সরলরেখা হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।"

"এগজ্যাক্টলি! আর যে গুলি চালাচ্ছে তারও কাঁধ পর্যন্ত উচ্চতা যদি ১২০–১২১ সেমির কাছাকাছি হয়।"

"আমাদের তালিকায় কি এরকম কেউ আছে?"

"সেটাই সমস্যা! কথায় কথায় আমি সবারই হাইট জিজ্ঞাসা করেছি। সদাশিববাবু পাঁচ-সাত, মানে প্রায় ১৭৪ সেমি। বিভীষণ তো আরও লম্বা— ১৮২ সেমি। আর পাশের ফ্ল্যাটেই বিভীষণের ভাই, কুম্ভকর্ণ থাকে, তার হাইট ১৭৭ সেমি..."

জেঠুমণি চোখ-মুখ কুঁচকে বলল, "কী? কুম্ভকর্ণ!"

"সরি সরি। আমার মাথাটা একেবারে গেছে। ওর নাম রাহুল ভীষেন।

boierpathshala.blogspot.com

কাকাতো ভাই। যা-ই হোক, এখানে আরও একটা খটকা আছে, সেটা বলা হয়নি। খটকাটা দ্বিতীয় গুলিটা নিয়ে। ভালো করে দেখো।" ইন্দ্রাণী প্রথম গুলির চিহ্ন থেকে একটি লম্বালম্বি সরলরেখা টেনে বোর্ডের নীচ পর্যন্ত নিয়ে যায়। দ্বিতীয় গুলির চিহ্ন থেকেও তাই করে, "মেঝের থেকে দ্বিতীয়গুলির উচ্চতা ৩৭ সেমি," এবার দ্বিতীয় গুলির চিহ্ন থেকে একটি অনুভূমিক সরলরেখা টেনে দেয়। প্রথম গুলির চিহ্নের থেকে টানা লম্বালম্বি সরলরেখা আর এই অনুভূমিক সরলরেখাটি যেখানে ছেদ করে সেখানে একটি 'x' চিহ্ন এঁকে দেয়। এবার একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে বলতে থাকে, "এই × চিহ্ন থেকে প্রথম গুলির উচ্চতা ৮৪ সেমি। আর এই × চিহ্ন থেকে দ্বিতীয় গুলিটির অনুভূমিক দূরত্ব ৯০ সেমি। এখন সমস্যা হল কোন গুলিটি আগে চলেছিল সেটা নিয়ে। যদি ধরে নিই, দ্বিতীয় গুলিটি অনীতা আগে চালিয়েছিল, তাহলে সে তার মাথায় না চালিয়ে কোমরের উচ্চতায় খামোখা দেওয়ালে চালাতে যাবে কেন! সে পুলিশে চাকরি করত। প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে অনেকবার গুলি চালিয়েছে, তাই আরও একবার প্র্যাকটিস করে দেখার কোনও মানেই দাঁড়ায় না। আর যদি ধরি, প্রথম গুলিটাই আগে চালানোর পর তখনও সে মারা যায়নি, দ্বিতীয় গুলিটা দেওয়ালে না করে আবার মাথাতেই করা উচিত ছিল। অন্তত যেকোনও সুইসাইডারই তা-ই করবে। তাই দ্বিতীয় গুলিটা চলার কোনও যুক্তিসংগত কারণ পাচ্ছি না।"

জেঠুমণি চেয়ারের থেকে উঠে মাথা নিচু করে পায়চারি করতে শুরু করল— "ঠিক কথা। একটা মানুষ সুইসাইড করতে চায়। প্রথম গুলিতে সে যদি ব্যর্থ হয়, দ্বিতীয়টাও সে মাথাতেই চালাবে— সেটাই স্বাভাবিক। শুধু শুধু একটা ফাঁকা গুলি দেওয়ালে কেন করতে যাবে! তাহলে কি অন্য কেউ..."

ইন্দ্রাণী জেঠুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, "যদিও অনীতার মেয়ে খুব ছোটই বলা যায়। মাত্র সাত বছর। কিন্তু সে আমতা আমতা করে বলেছে, দ্বিতীয় গুলিটা সে 'মা'-কে চালাতে দেখেছে। এখনও খুব ভয়ে ভয়ে আছে!"

"দেওয়ালের দিকে কি কোনও জানালা আছে? মানে বাইরের দিকে কাউকে কি গুলি চালাতে চাইছিল?"

boierpathshala.blogspot.com

ইন্দ্রাণী আবার হোয়াইট বোর্ডে আঁকাজোকা শুরু করে, "হ্যাঁ, জানালা একটা আছে। কিন্তু বাইরে থেকে গুলি চালানোর সম্ভাবনা এখানে নেই। তিনটি কারণ। এক, দুটি গুলিই অনীতার সার্ভিস রিভলভারের। কেউ সার্ভিস রিভলভার থেকে অনীতাকে বাইরে থেকে গুলি করে আবার অনীতাকেই ফেরত দেবে আততায়ীর দিকে গুলি ছোড়ার জন্য... আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। দুই, যেদিকে জানালা তার উলটোদিক থেকে মাথায় গুলিটি ঢুকেছিল আর বেরিয়েছিল জানালার দিক থেকে। তাই বাইরে থেকে গুলি চলার সম্ভাবনা কোনওভাবেই থাকে না। তিন, যে কারণে পোস্টমর্টেম রিপোর্টে আত্মহত্যা বলে মনে হয়েছে, সেই কারণটি। গুলির ক্ষতের চারপাশে চামড়ার বেশ কিছুটা অংশ পোড়া ছিল। মানে বন্দুকের ব্যারেলটি মাথায় ঠেকিয়ে গুলি করা হয়েছে। তাই বাইরে থেকে গুলি লাগা সম্ভব নয় কোনওভাবেই!"

জেঠুমণি চেয়ারে বসে পড়ল, "বস। আর কে কী বলল একবার বল তো! সেটা আগে শুনি।"

ইন্দ্রাণী চেয়ারের উপর বসে পড়ে, "প্রথমে বলি বিভীষণের কথা— খুবই আপসেট। বার বার বলছেন, অনীতা তাঁর ভুলের জন্যই চলে গেছেন। তিনি সেদিন রাগের মাথা চেঁচামেচি না করলে বোধহয় এসব কিছুই হত না। সেদিন বাড়ি ফিরে তিনি অনীতার কাছে টাকা চান। অনীতা তাঁকে টাকা দিতে রাজি হননি। কথা কাটাকাটির পর বিনোদবাবু ঘরের বাইরে গিয়ে সিগারেট খাচ্ছিলেন, এমন সময় গুলির শব্দ শোনেন। প্রথমটায় বুঝতে সময় নেন। দ্বিতীয় গুলির শব্দ হলে তিনি ছুটে ঘরে আসেন। যতক্ষণে শোয়ার ঘরে পৌঁছোলেন, ততক্ষণে অনীতা বেডের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন, হাতে বন্দুক ধরা। অনীতার ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরে মেয়েটি দাঁড়িয়ে।"

"এটা কি ভেরিফাই করলি?"

"বিশেষ কিছু ভেরিফাইয়ের ছিল না। তা-ও রাহুলের সঙ্গে কথা বলেছি। ওরটা আমি রেকর্ডও করেছি, নাও শোনো," ইন্দ্রাণী তার ফোনটা টেবিলের উপর রেখে প্লে করে দিল, "দাদা আর অনীতার সম্পর্ক ভালোই ছিল। দাদার চাকরি যাওয়ার পর থেকে মেজাজটা খিটখিটে হয়ে গিয়েছিল। একটা

boierpathshala.blogspot.com

মেয়েমানুষের ভাত-কাপড়ে কোন্ পুরুষই বা শান্তিতে থাকতে পারে বলুন তো! তা-ও অনীতাভাবি দাদাকে খুব ভালোবাসত, ভাবির বাপের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা ছিল না। আর দাদা মদ খেলে মাথার ঠিক থাকত না। সেদিনও এসে ভাবিকে যা নয় তা-ই বলছিল— 'তুই কি আমার মাথা কিনে নিয়েছিস! আমার ঘাড়ে উড়ে এসে জুড়ে বসেছিস। তোকে থাকতে না দিলে রাস্তায় থাকতে হত তোকে! একটা ফালতু লোককে বিয়ে করে তার কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে আমার অন্ন ধ্বংস করলি এতদিন, সে বেলা কিছু না। আমাকে টাকা দিতে যত তোর সমস্যা'। আমি তখন অফিস থেকেই ফিরছিলাম। বাইরে থেকে শুনলাম, অনীতাভাবিও বলছে— 'আমার আর এখানে ভালো লাগছে না। আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি আজই সব ছেড়ে সবাইকে ছেড়ে, চলে যাব, আর ভালো লাগছে না'।"

ইন্দ্রাণী ফোনটা থেকে নেক্সট বাটনটা টিপতে টিপতে বলল— "সদাশিববাবু খবর পেয়েছিলেন পরদিন সকালে। উনি থাকেন দার্জিলিং-এ। অবিবাহিত। একটি ছোট চায়ের পেটি বানানোর ও কাঠচেরাই কারখানা। তবে অনীতার দেহ দাহ করার সময় তিনি ছিলেন। পার্থবাবু আসেননি। ছেলে-মেয়ে দুটি আপাতত সদাশিববাবুর সঙ্গেই একটি রেস্ট হাউসে আছে। আমি কথা বলেছি ছেলে-মেয়ে দুটির সঙ্গে। ছেলেটি মুখ খুলতে রাজি হয়নি। কেমন যেন একটা রাগ, ভয় আর ক্ষোভে চুপচাপ। মেয়েটি এখনও যথেষ্ট ভীত, আমতা আমতা করে কিছু কথা বলছিল, তা রেকর্ড করেছি। শোনো।" ইন্দ্রাণী ফোনটা আবার প্লে করে। ইন্দ্রাণী আর বাচ্চা মেয়েটির কথোপকথন ভেসে ওঠে।

"তোমার নাম কী?"

"দিশা।"

"তুমি কাকে বেশি ভালোবাসো? মা-কে নাকি বাবাকে?"

"মা-কে।"

"আর বাবা?"

"পুরোনো বাবা?"

boierpathshala.blogspot.com

"হ্যাঁ।"

"ভালোবাসি তো। আমাকে প্রত্যেকদিন একটা করে চকোলেট কিনে দিত।

"আর নতুন বাবা ভালোবাসে?"

"কী জানি? মা বলে, নতুন বাবা নাকি আমাদের পুরোনো বাবার থেকে বেশি ভালোবাসে। কিন্তু এত্ত পচা, এত্ত পচা যে আমার জন্য চকোলেট আনত না। শুধু বলত চকোলেট খেলে নাকি দাঁতে পোকা হয়। আর রাতের বেলা মা-কেও আমাদের পাশে শুতে দিত না। শুধু বলবে কী, ওরা বড় হয়ে গেছে!

"ও তা-ই বুঝি! তা আমিও একটা চকোলেট দেব। সেদিন কী হয়েছিল, আমায় বললে তবে।"

"সত্যি?"

"সত্যি... সত্যি... সত্যি..."

"ওই তো ওইদিন নতুন বাবা এসে টাকা চাইল মা দিল না। দু-জনে গণ্ডগোল করল। মা বলল, সব্বাইকে ছেড়ে চলে যাবে। মা শোয়ার ঘরে চলে গেল। আমার মা-কে বকবে কেন, হ্যাঁ? তাই আমিও নতুন বাবাটাকে বকে দিতে গেলাম কিন্তু আমাকে মারল। আমি মায়ের ঘরে ছুটে যাই। মা দেখি ব্যাগ গোছাচ্ছে। দাদাও ঘরে এসে বলল, নতুন বাবা আমার বোনকে মেরেছে, তুমি কিছু বলবে না! মা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'তোরা অপয়া, তোদের জন্যই আমার জীবনটা শেষ হয়ে গেল!' তারপর দাদা মায়ের উপর রেগে গেল। তারপর দাদা..."

হঠাৎ করেই একটি ছেলের রাগী কণ্ঠ শোনা গেল, "তোকে কতবার বলেছি না, আমাদের বাবা বলেছে অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা বলতে না। যাকে তুই 'নতুন বাবা' বলছিস, সে আমাদের কেউ না। আমাদের মা ভালো না। স্কুলে সবাই বলে। সব বন্ধুরা বলে মা একটা খারাপ মেয়েমানুষ। এখানে কেউ আমাদের ভালোবাসে না।"

ইন্দ্রাণী অসহায়ভাবে জেঠুমণির মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, "এরপর দিশার দাদা আর ওর সঙ্গে কথা বলতেই দেয়নি। ওই নাকি এখন ওর বোনের অবিভাবক।"

boierpathshala.blogspot.com

ইন্দ্রাণী টেবিল থেকে ফোন নিয়ে উঠতে উঠতে বলল, "জানো জেঠু, বাচ্চা ছেলে-মেয়ে দুটিকে দেখে বড় মায়া লাগছিল। এত ছোট বয়সে এরকম। মেয়েটা তো কথা বলতে বলতে আমায় জড়িয়ে ধরছিল। একরত্তি মেয়ে, আমার কোমরসমান। ছেলেটা যদিও আমার বিশেষ কাছে আসেনি, তা-ও মনে হয়, আমার কাঁধের কাছাকাছি হবে। ছেলেটির কবজিতে খেলতে গিয়ে কীভাবে মচকা লেগেছে, ব্যান্ডেজ বাঁধা। আমার মন বলছে, এটা হয় পার্থ না হয় বিনোদ কোনওভাবে করেছে। শুধু কীভাবে করেছে, সেটাই বুঝতে পারছি না।"

জেঠু ইন্দ্রাণী দিকে ফিরে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, "তোকে আগের দিনই বলেছি, নিজের পারসোনাল ইমোশনকে কেস থেকে দূরে রাখ। চোখ ঝাপসা হয়ে গেলে সত্যিটা আর খুঁজে পাবি না। সত্যিটা সামনে এসে দাঁড়ালেও দেখবি, মেনে নিতে মন চাইছে না। তাই মনটাকে এসবের মধ্যে রাখিস না। তা না হলে আমার মতো..." প্রখর রুদ্র একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর বলল, "ঘরে যা। রেস্ট নে।" জেঠুমণি ধীরকণ্ঠে বলল, "মেয়েটার স্কুলটা চিনিস? কাল গিয়ে আলাদা করে কথা বলিস। সঙ্গে দুটো চকোলেট নিয়ে যাস। দেখ আর কী জানতে পারিস। মনে হচ্ছে, কালই ব্যাপারটা সমাধান হয়ে যাবে।"

ইন্দ্রাণী চুপচাপ বেরিয়ে যেতেই প্রখর রুদ্র ফোনটা তুলে নিল, "সদাশিববাবু, কাল সন্ধেবেলা একবার বিনোদবাবুকে নিয়ে আমার এখানে আসবেন। আপনার ভাগনা-ভাগনিদের দয়া করে আনবেন না।"

* * * * * * * *

পরের দিন প্রখর রুদ্রর বসার ঘরে সদাশিববাবু আর বিনোদবাবু উপবিষ্ট হলেন সোফাতে। সামনের টেবিলের উলটোদিকে প্রখর রুদ্র আর পাশের একটা চেয়ারে বসেছে ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রাণীকে যদিও বেশ বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে মুখের উপর এসে পড়েছে।

প্রখর রুদ্রই নীরবতা ভাঙল, "আমাদের জীবন আর সম্পর্কগুলো এত জটিল হয়ে যাচ্ছে যে বাচ্চাগুলোকে বোঝার সময় আর ইচ্ছা দুটোই আমাদের

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

চলে যাচ্ছে। আমাদের জেদ, মিথ্যা গরিমায় ছোট শিশুগুলোর শৈশব পিষে যায়," প্রখর রুদ্র ঘরের মধ্যে উঠে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে সদাশিববাবুর দিকে ফিরে বলল, "ভুল... ভুল আর ভুল। একটা সদ্য কুড়ি বছরের মেয়েকে আপনার বাবা জোর করে বিয়ে দিলেন। আপনার বাবা দুটো অচেনা শরীরকে চার দেওয়ালে বেঁধে দিলেন কিন্তু মেয়ের মনের খবর নিলেন না। আপনার বোন অসুখী সংসার ছেড়ে বাপের বাড়িও গেল না। এবার ভুল করল আপনার বোন, তার ছেলে-মেয়েগুলোর মনের খবর না নিয়ে। আপনাকে একটা পরামর্শ দেব, শুনবেন কি?"

সদাশিববাবু ধীরে ধীরে বললেন, "বলুন।"

"আপনার বোনের শেষ ইচ্ছাটা পূরণ করবেন?"

"হ্যাঁ।"

"আপনার বোনের শেষ ইচ্ছা ছিল ওঁর হত্যাটা আত্মহত্যার রূপ পাক। জীবনের অনেকগুলো ভুলের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে অনীতা একটা ঠিক কাজ করে গেছে। সেটাকে সামনে না-আনাই ভালো। আপনার ভাগনে আর ভাগনিটিকে নিয়ে পারলে অনেক দূরে চলে যান। এখানে ওরা ভালো নেই। যা ঘটেছে ওদের সঙ্গে, আমি প্রার্থনা করি, ওরা যেন সব ভুলে যায়। না হলে, ওদের বাকি জীবনটাও অন্ধকারে ঢেকে যাবে– একবুক হতাশার অন্ধকারে।"

"কিন্তু কে..." সদাশিববাবুকে মাঝপথে হাত তুলে প্রখর রুদ্র থামিয়ে দিল— "আপনার মানসিক সন্দেহের অবসানের জন্য শুধু বলছি যে এটি বিনোদবাবু বা পার্থবাবু কেউই করেননি। আর বিনোদবাবু, কাউকে ভালোবাসলে তার সবটুকু নিয়ে ভালোবাসতে হয়। তার খারাপ-ভালো, অতীত-বর্তমান সবটুকুকেই। অনীতাকে ভালো তো বাসলেন কিন্তু তার অতীতের সাক্ষ্য বয়ে-আনা নিষ্পাপ দুটি শিশুকে ভালোবাসতে পারলেন না। আপনার শাস্তি এটাই, এবার বাকি জীবনটা অনীতার মৃত্যুর অনুতাপকে বুকে জড়িয়ে বেঁচে থাকুন। আপনারা দু-জনেই আশা করি, অনীতার শেষ ইচ্ছাটার মর্যাদা দেবেন। এবার আপনারা আসতে পারেন।" প্রখর রুদ্র শান্ত ও দৃঢ়ভাবে নমস্কার জানালেন। সদাশিববাবু আর বিনোদবাবু ধীরে ধীরে ঘর ছাড়লেন।

ইন্দ্রাণী এবার ধীরে ধীরে মাথা তুলে বলল, "তুমি কি আগেই বুঝতে পেরেছিলে?"

"কাল যখন দুটো গুলির থিয়োরি বললি তখনি একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে যায় আমার কাছে। দ্বিতীয় গুলিটা মেঝে থেকে ৩৭ সেমি উপরে লেগেছিল। আর তোর ওই 'x' চিহ্নের থেকে দ্বিতীয় গুলির দূরত্ব ৯০ সেমি— সেটা অনীতার আপার বডি হাইটের থেকে মাত্র ৫ সেমি বেশি। মানে দ্বিতীয় গুলিটা অনীতাই চালিয়েছিল— খাটের উপর মুখ থুবড়ে পড়ার পর। সেইজন্যই তার হাতে গান পাউডারের ট্রেস ছিল। শুধু প্রথম গুলিটাই চিন্তায় ফেলেছিল। তাই কাল রাতে একবার হসপিটালে ফোন করে সেদিনের ডিউটিরত ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলি। তাঁর কথানুযায়ী অনীতা শেষ মুহূর্তে বার বার বলছিলেন, 'সব গুলি আমি চালিয়েছি। আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী না।' সেটা শুনেই বার বার মনে হচ্ছিল, অনীতা কাউকে বোধহয় বাঁচাতে চাইছে। 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়' —এইটুকুই যখন একটি আত্মহত্যাকারীর জবানবন্দি হিসাবে যথেষ্ট, সেখানে সে গুলির কথা বার বার করে কেন বলেছিল?"

ইন্দ্রাণী তখনও দু-হাতে মাথা চেপে ধরে বসে ছিল। প্রখর রুদ্র বলল, "সবে তো দেখার শুরু, ইন্দ্রা। আমি আগেই বলেছিলাম এসবে নামিস না। আর ইমোশনে জড়িয়ে পড়লে আরও দিন দিন দেখবি, পৃথিবীতে কাউকেই বিশ্বাসযোগ্য লাগছে না। সবাইকেই সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে দিয়েছিস। এইজন্যই তো আমি আজকাল কেস নিই না। নিজে গিয়ে দেখলেই ইমোশনে জড়িয়ে পড়ি আর পৃথিবীটাকে ভীষণ অবিশ্বাসী মনে হয়।"

ইন্দ্রাণীর চোখ ভিজে উঠল, "আমি এখনও ভাবতে পারছি না... কী করে একজন... তা-ও তুমি কখন মোটামুটি আঁচ করেছিলে?"

"তুই যখন কালকে বললি ছেলেটি তোর কাঁধের সমান। হিসাব করে দেখলাম, তার মানে ছেলেটির কাঁধ পর্যন্ত উচ্চতা ওই ১২১ সেমির কাছাকাছিই হবে। সেইজন্যই ওর বোনের সঙ্গে আজ আলাদা করে কথা বলতে বললাম।"

এর মধ্যেই শেখরবাবু তড়িঘড়ি ঘরে ঢুকে বললেন, "দাদা খুব ফেঁসে গেছি। প্লিজ পথ দেখা," ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোর মা-কে

boierpathshala.blogspot.com

চা করতে বল আর খাবারগুলো আনতে বল। আর তুই এখন আয়। দাদার সঙ্গে আমার একটু আলাদা দরকার আছে।"

ইন্দ্রাণী কোনও কথা না বলে চুপচাপ ঘর ছাড়ে। তার চোখের সামনে তখন দুপুরে দিশার সঙ্গে হওয়া কথোপকথন বার বার ভেসে উঠছে।

* * * * * * * *

"এই দেখো দিশা, তোমার জন্য কতগুলো চকোলেট এনেছি।"

"থ্যাঙ্ক ইউ, আন্টি।"

"এবার আমায় বলো তো, তারপর সেদিন কী হল? মা আর দাদার ঝগড়ার সময়?"

দিশা কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, "মা যখন পড়ে ছিল বেডে, মা বলেছে আমাদের কাউকে কিচ্ছু বলতে না। পুলিশকাকুদেরও আমরা তাই কিচ্ছু বলিনি। কাল তোমায় বলেছি বলে দাদা বকেছে আর বলেছে, আমি নাকি মা-কে ভালোবাসি না। তাই মায়ের কথা শুনছি না। কিন্তু আমি তো মা-কে খুব ভালোবাসি তাই বলবই না।"

"এ বাবা, তুমি কিছুই জানো না। সেইজন্যই বলতে পারছ না। জানলে তো তুমি বলবে! ধুস, তুমি কিচ্ছু জানো না।"

দিশা মাথা ঝাঁকিয়ে ওঠে, "না না। আমি জানি। তুমি কিছু জানো না।"

"জানলে তো তুমি বলতে..."

"তুমি কাউকে বলবে না তো, তাহলে বলব..."

"প্রমিস। কাউকে বলবো না..."

"মা-ও কিন্তু বারণ করেছে। কাউকে বলবে না কিন্তু। দাদার সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে দাদা রেগে গিয়ে মা-কে বলল, 'বাবাকে ছেড়ে এই বাজে লোকটার সঙ্গে থাকো! বোনকে মারে আর তুমি কিছুই করো না। তুমি নোংরা।' মা রেগে গিয়ে দাদাকে ঠাস করে একটা চড় মারল, আর দাদা মায়ের বন্দুকটা মায়ের মাথায় ঠেকিয়ে বলল, 'আগে যাও লোকটাকে গিয়ে বোনের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে বলো। না হলে আমি গুলি চালিয়ে দেব। তোমার

boierpathshala.blogspot.com

জন্যই এসব হচ্ছে।' মা কোনওদিকে না তাকিয়ে নিজের মতো কাঁদতে কাঁদতে ব্যাগ গোছাচ্ছিল আর বলছিল, 'সব ভুলই আমার। তোর যা ইচ্ছে হয় কর। আমার আর এসব ভালো লাগছে না।' তারপরই গুড়ুম আর মা খাটের উপর পড়ে গেল। জানো, মায়ের মাথা থেকে রক্ত পড়ছিল। মা খুব কষ্ট করে বন্দুকটা দাদার থেকে নিয়ে দাদাকে বলল, 'বাবান, যদি আমায় একটুকুও ভালোবেসে থাকিস, এক্ষুনি যা করলি, কাউকে বলিস না বাবা। পুলিশ অনেকবার জিজ্ঞাসা করতে পারে। করলে বলিস, তোরা যখন ঘরে ঢুকেছিলি তখন আমি এভাবেই পড়ে ছিলাম। বোনকে দেখিস।' বলেই মা বিছানায় শুয়েই দেওয়ালে আবার গুলি করল। আন্টি আন্টি, আমার টিফিন শেষের ঘণ্টা পড়ে গেছে। কাউকে বোলো না কিন্তু। আমি আসি।"

"এক মিনিট, দিশা। তুমি মিথ্যে বলছ না তো? তোমার দাদা বন্দুক চালাতে জানে?"

—"আন্টি, সত্যি বলছি। মা দাদাকে শেখাত তো। কিন্তু কোনওদিন গুড়ুম করে আওয়াজ হয়নি। সব সময় খুট খুট করেই আওয়াজ হত। ওইদিনই গুড়ুম করে আওয়াজ হল। কী জানি কেন! আমি আসি, আন্টি। বাই... বাই" দিশা স্কুলের মাঠ ছেড়ে ক্লাসের দিকে দৌড়োল।

* * * * * * * *

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ইন্দ্রাণীর মাথাটা ভারী হয়ে আসছিল। জীবনে অনীতা অনেক কিছুই হয়তো ভুল করেছে, কিন্তু যেতে যেতে একটা ঠিক কাজ করে গেছে। কিন্তু ছেলেটি যখন বড় হয়ে নিজের ভুল বুঝবে তখন কি নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে! ইন্দ্রাণীর ঝাপসা হয়ে থাকা চোখে ছেলেটির হাতের ব্যান্ডেজটা ভাসতে থাকে— তার বুঝতে সময় লাগে না, ওটা খেলতে গিয়ে পাওয়া চোট না, অপটুভাবে প্রথমবার রিভলভার-ধরা নরম হাত বুলেটের উলটোদিকের ধাক্কাটা সহ্য করতে পারেনি!

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

চিন্তাই–বাজ ছিনতাইবাজ

সন্ধে ৭টা। কলিং বেল বাজতে না বাজতেই কুন্তলাদেবী নীচে এসে দরজা খুলে দিলেন। শেখরবাবুর এক হাতে চারটে ফাইল, আর অন্য হাতে একঠোঙা ফিশ কাটলেট নিয়ে ফিরেছেন। স্ত্রী কুন্তলাদেবীকে দেখে হালকা হাসার চেষ্টা করলেন। এ হাবভাব কুন্তলাদেবীর বহুদিনের চেনা। অফিসে নিশ্চিত আবার কোনও জটিল কেসের সমাধান হচ্ছে না, তাই যথারীতি ভাশুরের শরণাপন্ন হওয়ার আগাম প্রস্তুতি। শেখর রুদ্র কলকাতা পুলিশের ডি.আই.জি.।

জেঠুমণি সেভাবে কিছু করেন না বলেই পাড়ার সবাই জানে। কিন্তু বাড়ির সবাই জানে, জেঠু না থাকলে শেখরবাবু কোনওদিনই জটিল কেসগুলোর সমাধান করতে পারতেন না। শেখরবাবু সব সময়ই বলেন, "দাদা চাইলে জীবনে অনেক কিছুই করতে পারত, কিন্তু ওর একরোখা আর জেদি মনোভাবের জন্যই কোথাও চাকরি করল না।" এ কথা ঠিকই শেখরবাবুর দাদা কম বয়সে তুখোড় মেধাবী ছাত্র ছিলেন, কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেপরোয়া জীবনই তাঁকে টানল বেশি। বাড়ি থেকে পালিয়েছেন, যখন যেমন কাজ পেয়েছেন করেছেন আর পৃথিবী চষে বেড়িছেন বললেও খুব ভুল হবে না। ওঁর কোনও এক বন্ধু নাকি সেসব ভ্রমণকাহিনি নিয়ে রীতিমতো বিখ্যাত সিরিজ লিখেছেন। তারপর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের টানে ভাইয়ের কাছে ফিরলেন। জটিল কেস নিয়ে শেখরবাবু তার দাদার শরণাপন্ন হলে, শেখরবাবুর মেয়ে ইনস্পেকটর শিবানী খুশি হয় সব থেকে বেশি। জেঠুমণির বয়স বাড়ার জন্য বাইরের ছোটাছুটির কাজগুলোর ভার শিবানীর উপরেই পড়ে। শিবানীর বোন ইন্দ্রাণী অবশ্য জেঠুর ধাতে গড়া— ছন্নছাড়া গোছের!

শেখরবাবু হাত-মুখ ধুয়ে পরিপাটি হয়ে ফাইলগুলো নিয়ে দাদার ঘরে

গেলেন। ইন্দ্রাণী জেঠুর ঘরে কেমন একটা চুপচাপ বসে আছে— উদাস দৃষ্টি। শেখরবাবু তড়িঘড়ি ঘরে ঢুকে বললেন, "দাদা, খুব ফেঁসে গেছি। প্লিজ পথ দেখা," ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোর মা-কে চা করতে বল আর খাবারগুলো আনতে বল। আর তুই এখন আয়। দাদার সঙ্গে আমার একটু আলাদা দরকার আছে।" ইন্দ্রাণী চুপচাপ মাথা নিচু করে ঘর ছাড়ে। এর মধ্যে কুন্তলাদেবী ফিশ কাটলেট আর চা নিয়ে চলে এসেছেন। এসব দেখে জেঠুমণি হেসে বলল, "দেখ শেখর, ঘুস দিয়ে লাভ নেই। কেস পছন্দ হলে নেব, না হলে তোর ওই অফিসের কূপমণ্ডূপগুলোকেই দিস।"

"দাদা, দয়া করে বাঁচা। সাড়ে তিন মাস ধরে সতেরোজনকে জেরা করেও কোনও লাভ হয়নি। ওদিকে বড়কর্তাদের আর সামলে রাখা যাচ্ছে না, আর মিডিয়া তো আছেই," শেখরবাবু ফাইলগুলো টেবিলে রাখলেন। এর মধ্যে শিবানীও ফিরে এসেছে।

"বল আগে, তারপর দেখছি," জেঠুমণি একটা ফিশ কাটলেট তুলে নিয়ে চেয়ারে আয়েশ করে বসল।

"তিন মাস আগের ঘটনা। গড়িয়াহাটের কাছে, একটু ভিতরের দিকে ভরদুপুরে হার ছিনতাই..."

জেঠুমণি কাটলেটে একটা কামড় দিয়ে বলল, "তোর কি ডিমোশন হল? হঠাৎ ছিনতাইবাজ ধরছিস?"

শেখরবাবু চায়ের কাপে চুমুক মেরে বললেন, "আসলে হার ছিনতাই করে পালানোর সময় সাতজনকে গুলি করেছে। পাঁচজনই স্পট-ডেড। আশা করি এবার তুই বুঝছিস, কেন কেসটা নিয়ে এত হইচই।" শেখরবাবু একটা সবুজ ফাইল এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এতে ওখানকার কিছু লোকজনের বয়ান আছে। সবার বক্তব্য মোটামুটি একই। একজন বাইক-আরোহী মুখে কালো কাপড় বেঁধে হার ছিনতাই করে পালাচ্ছিল। রাস্তায় সামনে যাকে পেয়েছে তাকেই গুলি করে দিয়েছে। গড়িয়াহাটের কাছাকাছি এসে বাইক ফেলে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেছে। বাইকের বাস্কেট থেকে আততায়ীর জামা আর বাইকের কাগজপত্র উদ্ধার হয়েছে। সেসব দেখেই বাইক মালিকের সঙ্গে দেখা

boierpathshala.blogspot.com

করে আমরা জানতে পারি, বাইকটা দু-দিন আগেই চুরি করা হয়েছে। থানায় চুরির রিপোর্টও আছে। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেও মালিকের বিরুদ্ধে সন্দেহজনক কিছুই পাইনি।"

"কোনও প্রত্যক্ষদর্শী?"

শেখরবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "সেভাবে কেউ নেই। ওই যার হার চুরি হয়েছে, ওই একজন মহিলা আর একজন বলেছেন, তিনি কিছু আগেই নাকি বাইকটিকে তাঁর পাশ দিয়ে যেতে দেখেছিলেন। আসলে দুপুরের সময়। অলিগলি ভিতরে মোটামুটি ফাঁকাই ছিল। তাই গুলির শব্দ শোনার পর আশপাশের বাড়ির লোকজন যে এক-দু-জন যতক্ষণে বাইরে আসে, ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে।"

জেঠুমণি চেয়ারে সোজা হয়ে বসল, "কিন্তু এই ধরনের ছিনতাই তো সাধারণত দু-জন করে থাকে। একজন বাইক চালায়, অন্যজন পিছনে বসে।"

"হয়তো লাইনে নতুন। এখনও কোনও শাগরেদ জোটেনি।"

"লাইনে নতুন! তাহলে এত তাড়াতাড়ি পিস্তল জুটিয়ে ফেলল! ব্যালেস্টিক রিপোর্ট কী বলছে?"

"অটো নাইন এম এম," শেখরবাবু একটা লাল ফাইল দাদার দিকে এগিয়ে দিলেন।

জেঠুমণি এবার চেয়ারে আয়েশ করে বসে হেসে উঠল, "তোর এতদিন পুলিশে চাকরি করাটাই বৃথা।"

শেখরবাবু ঘাড় চুলকাতে চুলকাতে বললেন, "কেন দাদা?"

"তা নয় তো কী? একটা ছিঁচকে ছিনতাইবাজের কাছে বড়জোর একটা দেশি বন্দুক থাকতে পারে, যাকে ওই পুলিশি ভাষায় তোরা 'কাট্টা' বলিস। তা বলে একটা অটোমেটিক নাইন এম এম পিস্তল! তার উপর একজন! এ ধরনের ছিনতাই দু-জন করে— একজন ভারসাম্য বজায় রেখে হাই স্পিডে বাইক চালায়, অন্যজন মুহূর্তের মধ্যে হার, দুল হ্যাঁচকা টানে নিয়ে পালিয়ে যায়। আর এখানে আপনাদের অতিথি চলন্ত বাইক থেকে প্রায় নির্ভুল নিশানায় পথচারীদের গুলি করতে করতে পালিয়ে যায়।"

boierpathshala.blogspot.com

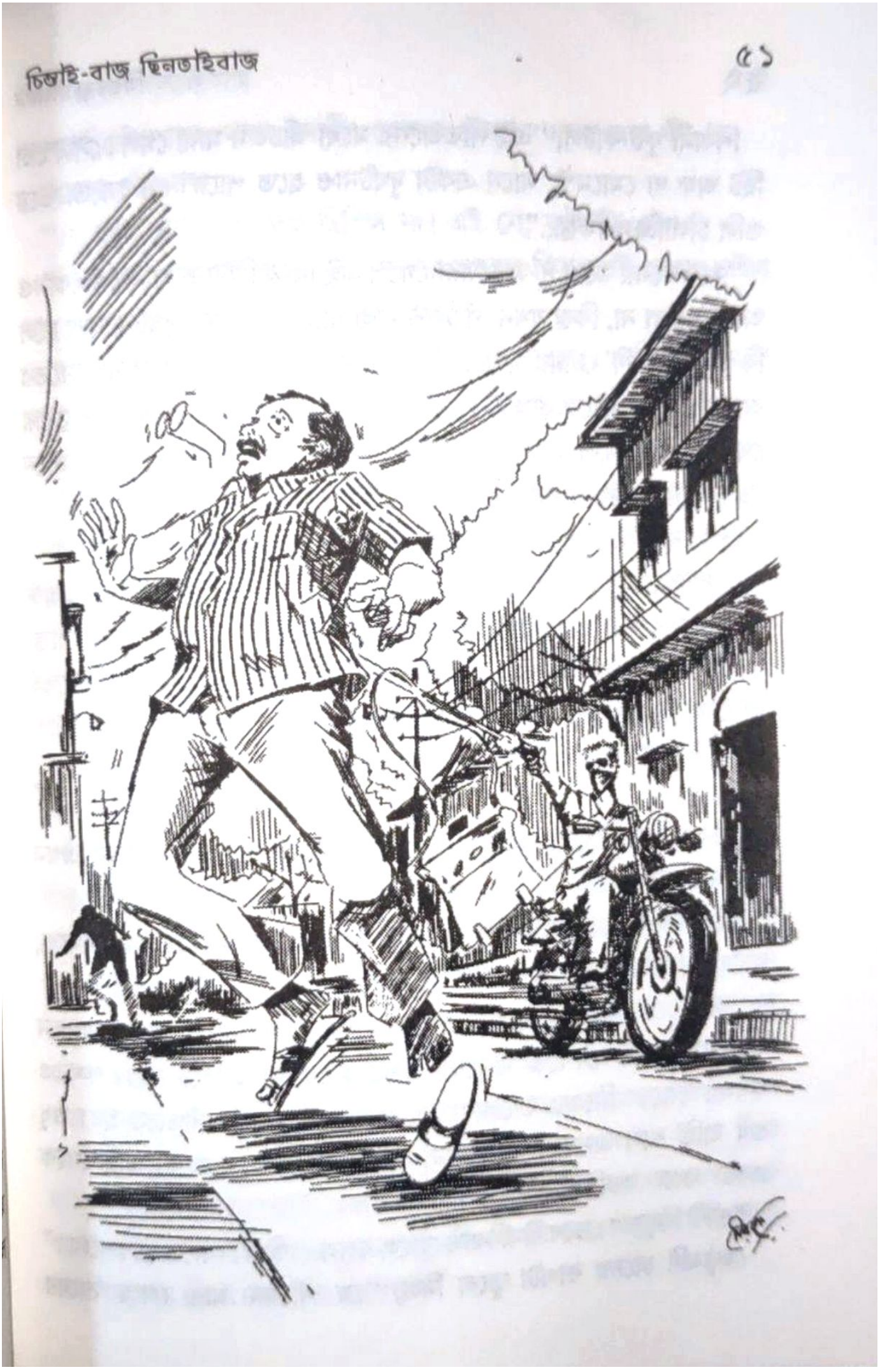

boierpathshala.blogspot.com

শিবানী ফুট কাটল, "এই সাতজনের মধ্যে পাঁচজন মারা গেল। সেটা তো হিট অফ দ্য মোমেন্ট, মানে একটা দুর্ঘটনাও হতে পারে। সে হয়তো ভয়ে গুলি চালাচ্ছিল কিন্তু..."

"সাতজনের মধ্যে দু-জন মারা গেলে এই থিয়োরিটাতে আমারও কোনও আপত্তি ছিল না, কিন্তু যখন পাঁচজন মারা যায় তখন স্রেফ দুর্ঘটনা বলা চলে কি?" জেঠুমণি চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি করতে লাগলেন। হাতের আঙুলগুলোর ফাঁকে একটা পেন ঘুরিয়ে চলেছেন, আর সেই সঙ্গে ড্রয়ার থেকে এক টুকরো চকোলেটও মুখের মধ্যে চলে গেছে। শিবানী জানে জ্যেঠুমণির মস্তিষ্ক এখন সব সম্ভাবনাকে মেপে নিচ্ছে।

শেখরবাবু চোখ বড় বড় করে বললেন, "তাহলে?"

"সেটাই তো বুঝছি না রে। চেনটা ছিনিয়ে নেওয়ার পর একজন ছিনতাইবাজ চেষ্টা করবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালিয়ে যাওয়ার। দুপুরের সময়, রাস্তা মোটামুটি খালি যখন ছিলই, খামোখা অতগুলো খুন করে লোক জড়ো করতেই বা গেল কেন? ঠিক আছে, ফাইলগুলো রেখে যা। তারপর দেখছি।"

* * * * * * * *

পরদিন সকালে ইন্দ্রাণী চা দিতে গেলে জেঠুমণি বলে উঠল, "কী রে, এখন কেমন লাগছে?"

"হ্যাঁ, কিছুটা ভালোই, কিন্তু অনীতার ব্যাপারটা এখনও ঠিক মন থেকে, মানে মন মানতে চাইছে না।"

"আমি তো আগেই বলেছিলাম, এ রাস্তায় পা না বাড়াতে। এখানে অপরাধ দেখতে দেখতে মানুষের উপরেই বিশ্বাস হারিয়ে যায়। কখনও কখনও হয়তো নিজের ভালোবাসার মানুষের বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে হয়। শুধু শুধু বাড়ি বসে এসব কথা ভাবলে আরও মন খারাপ হবে। তার থেকে একটা কাজ করবি?"

ইন্দ্রাণী কিছুক্ষণ ভেবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, "কী কী করতে হবে বলো?"

জেঠুমণি চায়ের কাপটা তুলে নিল, "যে পাঁচজন মারা গেছে তাদের

boierpathshala.blogspot.com

সম্পর্কে খোঁজখবর, মানে ইদানীং কোনও টেনশন এসব আর কী...”

“কোন পাঁচজন?

“ও, কাল রাতে তো তুই ছিলিস না। এই নে, ফাইলটা দেখ।”

“কিন্তু কাল তো ব্যাপারটা বাবা আমার সামনে ডিসকাসই করতে চাইল না। আমার কি এটাতে ঢোকা ঠিক হবে?”

“তুই কাজটা কর। আমি শেখরের সঙ্গে কথা বলে নেব। আমি এই কেসটা আমার বেস্ট চোখটা দিয়েই দেখতে চাই। তাই তোকে পাঠানো।”

“ও.কে.।”

“যে দু-জন বেঁচে আছে তাদের সঙ্গে কথা বলবি, যে মহিলার হার চুরি গেছে তার সঙ্গে। আর-একজন সাক্ষীর কথা বলা আছে তার সঙ্গেও। কোনও কিছু খটকা লাগলে ভালো করে খেয়াল করবি।”

“ও.কে., আমি এখনই চলে যাচ্ছি।”

“আরে শোন শোন, পাঁচ- পাঁচটা খুনের ব্যাপার। এভাবে হঠাৎ করে কেউই মুখ খুলবে না। তাই নিজেকে সাংবাদিক বলে পরিচয় দিস। তোর ? বেকার ফোটোগ্রাফার বন্ধু, দীপ্তকে সঙ্গে নিয়ে নিস।” ইন্দ্রাণী লাজুক হেসে মাথা নিচু করে ‘আচ্ছা’ বলে ছুটে বেরিয়ে যায়।

দীপ্তজিৎ ইন্দ্রাণীর কলেজের বন্ধু। দু-জনে একসঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছে। দীপ্তর ইন্দ্রাণীর প্রতি একটু হালকা ব্যথা আছে। সেটা ইন্দ্রাণী জানলেও খুব একটা পাত্তা দেয় না। আসলে দীপ্ত একবার শিবানীকে ইন্দ্রাণী ভেবে ভ্যালেন্টাইন'স ডে-র দিন একগোছা গোলাপের তোড়া দিয়েছিল। দু-জনে যমজ বোন হওয়ার কারণে এসব হয়েই থাকে। দীপ্ত ব্যাপারটা বোঝার পর এমন লজ্জায় পড়ে যায় যে তারপর থেকে সে বেচারা আর কোনওদিন সাহস করে উঠতে পারেনি। প্রত্যেকবারই তার মনে হয়, এবারও বোধহয় ভুল জনকেই মনের কথা বলতে যাচ্ছে! আগের বার তো অল্পের উপর দিয়ে গেছে। ভাগ্যিস প্রোপোজটা অন্তত ভুল জনকে করেনি। না হলে তো জুতো একটাও হয়তো বাইরে পড়ত না। জেঠুমণি এই ব্যাপারটা জানে। তাই মাঝে মাঝেই সেটা নিয়ে ইন্দ্রাণীর লেগপুলিং করে।

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

ইন্দ্রাণী দীপ্তকে নিয়ে দুপুরের দিকেই বেরিয়ে পড়ে। দু-জনে ট্যাক্সি নিয়ে দক্ষিণ কলকাতার একটা সাততলা আবাসনের সামনে এসে দাঁড়ায়। তিনতলার ৩০৩ নম্বর ফ্ল্যাট তাদের গন্তব্য। কলিং বেল বাজাতে একজন মহিলা দরজার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়ায়, "হ্যাঁ বলুন?"

দীপ্ত এগিয়ে যায়, "আমরা 'ভোরের খবর' সংবাদপত্র থেকে আসছি।"

দীপ্ত দ্রুতহাতে একবার নিজের আই-কার্ডটা তুলে ধরে, যাতে সংবাদপত্রের লোগো আর দীপ্তর ছবিটা ঠিক করে দেখা যায়; নাম-ঠিকানাগুলো হাতের আড়ালেই ঢাকা থাকে। কারণটা খুব স্বাভাবিক— আই-কার্ডটা দীপ্তর ফটোশপের কামাল! দীপ্ত আবার বলে— "আমরা কি প্রতিমা বসুর সঙ্গে কথা বলতে পারি? মানে ক-দিন আগে একটা হার ছিনতাইয়ের ব্যাপারে আর কী... সেই ব্যাপারেই কথা বলতাম।"

মহিলা এবার দরজা ছেড়ে দেন, "আসুন। আমিই প্রতিমা বসু।"

ইন্দ্রাণী আর দীপ্ত গিয়ে সোফায় বসে। ইন্দ্রাণী সময় নষ্ট করতে চায় না। বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করছে। তারা যে আসল সাংবাদিক না, সেটা এই মহিলা বোঝার আগেই কাজ সারতে হবে, "আচ্ছা, ঘটনার দিন ঠিক কী হয়েছিল, বলবেন আমাদের?"

মহিলা উলটোদিকের সোফায় বসে শুরু করেন, "ও পাড়ায় আমার এক বান্ধবীর বাড়ি। ছেলেকে স্কুলে দিয়ে ওর ওখানে একটা কাজে গিয়েছিলাম। দুপুরে ফেরার সময় ওই ভিতরের রাস্তাটা একটু ফাঁকা-ফাঁকাই থাকে। কিছু চায়ের দোকান-টোকান খোলা থাকে। আমি হেঁটে মোড়ের দিকে আসছিলাম। হঠাৎই গলায় একটা হ্যাঁচকা টান আর গলায় একটা যন্ত্রণা অনুভব করলাম। আমি টাল সামলাতে না পেরে রাস্তার উপরে পড়ে যাচ্ছিলাম। কোনওক্রমে সামলে রাস্তাতেই গলায় হাত চেপে বসে পড়ি। বুঝতে পারলাম গলাটা বেশ চিরে গেছে। রক্ত বেরোতে শুরু করেছে। এর মধ্যেই হঠাৎ করে ঠাঁই ঠাঁই শব্দ শুনে মাথা তুলে তাকিয়ে দেখি বাইকে করে একটা লোক বেশ দূরে চলে গেছে আর রাস্তার উপরে দু-জন পড়ে কাতরাচ্ছে। আর রাস্তা রক্তে ভেসে যাচ্ছে।"

ইন্দ্রাণী থামিয়ে দেয় মাঝপথে, "এক মিনিট। আপনি চোর চোর বলে চেঁচাচ্ছিলেন। আর ওঁরা ওই বাইকওয়ালাটাকে আটকাতে এসেছিলেন। তা-ই তো?"

প্রতিমাদেবী কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন, "না তো। আমি 'চোর' 'চোর' করে চিৎকার করিনি। আমার তখন যন্ত্রণায় এমন অবস্থা, রাস্তার বসে পড়েছিলাম। ওই লোকগুলো হয়তো বাইকওয়ালাটাকে হার ছিনতাই করতে দেখেছিল, সেইজন্যই হয়তো এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু আমি চিৎকার করিনি। একজন যদিও 'খুন' 'খুন' করে চিৎকার করেছিল। চোখের সামনে দেখলাম, তাদেরও গুলি করেই রাস্তার টার্নটা ঘুরে গেল। তারপর আর দেখতে পাইনি। যদিও তারপরও বেশ কিছু গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম। এর মধ্যে আশপাশের বাড়ি থেকে লোকজন বেরিয়ে আসে। তাদেরই একজন আমায় জল-টল দেয়। রাস্তার উপরে পড়ে-থাকা লোকগুলোর জন্য অ্যাম্বুলেন্সে খবর দেয়। পুলিশ আসে। আমায় জিজ্ঞাসাবাদ করে।"

ইন্দ্রাণী যেন কিছুক্ষণের জন্য চিন্তিত হয়ে যায়। অদ্ভুত, বড়ই অদ্ভুত! প্রতিমা বলে ওঠে, "আচ্ছা, এটা কবে ছাপা হবে?"

দীপ্ত মুখ ফসকে বলে ফেলে, "কোথায় ছাপা হবে?"

মহিলার ভ্রূ কুঁচকে গেল, "মানে? এই যে বললেন, আপনারা ভোরের খবর থেকে আসছেন! আপনার আই-কার্ডটা দেখি। তখন নামটা দেখা হয়নি।"

দীপ্ত এবার প্রমাদ গুনল। ইন্দ্রাণী একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে দীপ্তর দিকে তাকায়, গলা মোলায়েম করে বলে, "আপনার সাক্ষাৎকার ছাপা হবে। কয়েকদিনের মধ্যেই ছাপা হবে।"

"ও হ্যাঁ, আপনার আই-কার্ডটাও দেখি। আমার ঠিক লাগছে না আপনাদেরকে।" মহিলা টেবিলের পাশের থেকে ফোনটা তুলে একটা নম্বর ডায়াল করে চেঁচিয়ে ওঠে— "সিকিয়োরিটি, তাড়াতাড়ি ফ্ল্যাট ৩০৩।"

ইন্দ্রাণী ততক্ষণে ব্যাগটা বগলদাবা করে নিয়েছে, দীপ্তর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললে, "ভাগ..."

boierpathshala.blogspot.com

দু-জনে মিলেই দৌড় লাগায় খোলা দরজা দিয়ে সিঁড়ির দিকে। প্রতিমা পিছন থেকে চিৎকার জুড়ে দেয়, "সিকিয়োরিটি... চোর, চোর... না... ডাকাত ডাকাত।"

দু-জনে আর পিছনে দেখে না। দৌড় লাগিয়ে একদম বড়রাস্তার সামনে থেকে ট্যাক্সি নিয়ে তাতে বসে স্বস্তি।

ইন্দ্রাণী একবার রেগে ওঠে, "তোকে দিয়ে না কোনও কাজ হবে না। একটা ভালো দিকে এগোচ্ছিল, উনি পুরো ব্যাপারটা ঘেঁটে ঘ করে দিলেন।"

দীপ্ত একটু ব্যাজার মুখে বলে ওঠে, "আমি কী করব! আমার কি খেয়াল ছিল অত!" ইন্দ্রাণী হাতের ব্যাগটা দিয়ে দীপ্তকে মারতে থাকে আর দীপ্ত চেঁচাতে থাকে, "আর হবে না, আর হবে না। এবার ছেড়ে দে।"

কিছুক্ষণ পর ইন্দ্রাণী শান্ত হয়, "দেখ, এবার যে লোকটা গুলি লাগার পরও বেঁচে ছিল; সেই লোকটার বাড়ি যাচ্ছি। ওখানে যদি গণ্ডগোল করেছ-না, মেরে তক্তা বানিয়ে দেব।" দীপ্ত কিছু বলে না। বাইরের দিকে তাকিয়ে একটু মিচকি হাসে।

ঘণ্টাখানেক পর উত্তর কলকাতার একটা ঘিঞ্জি এরিয়াতে এসে ইন্দ্রাণীরা নামে। সামনে একটা বস্তি আছে। পুলিশের ফাইলের ঠিকানা অনুযায়ী লোকটা এখানেই থাকে। মিনিট পনেরো খোঁজাখুঁজির পর পেয়ে গেল। টিনের চালের একটা বাড়ি, নিচু ছাত, তিনটে ঘর। ঢোকার মুখে সামনেই রান্নার সরঞ্জাম। তার পরের ঘরে একটা খাট, দুটো চেয়ার, আলমারি আর ছোট্ট একটা টিভি।

ইন্দ্রাণী একটা চেয়ারে বসে লোকটাকে জিজ্ঞাসা করে, "আপনার নাম তো সদাশিব পান্ডা?"

খাটে বসে লোকটা উত্তর দেয়, "হ্যাঁ।" লোকটার বয়স ত্রিশের বেশি না। মুখে চাপ দাড়ি, বাঁ কানে একটা দুল আছে। চুলগুলো ডানদিক থেকে বাঁদিকে টেনে আঁচড়ানো। বাঁ কাঁধে ক-দিন আগের ছিনতাইবাজের গুলির জখমটা এখনও যে ভালোই ভোগাচ্ছে, দেখলেই বোঝা যায়। ভদ্রলোক হাতটা ঠিকমতো নাড়াতে পারছেন না। কাঁধে এখনও ব্যান্ডেজ লাগানো।

ইন্দ্রাণী আবার জিজ্ঞাসা করে, "আপনার তো কাঁধে একটা গুলি লেগেছিল—

boierpathshala.blogspot.com

ফ্লেশ উন্ড। সেদিন কী হয়েছিল দয়া করে একবার বলবেন, সদাশিববাবু?"

লোকটা একমুখ হেসে বলে, "আমাকে আবার বাবু-টাবু বলে লজ্জা দেবেন না। আমি তো ওই দালালির ব্যবসা করি। মানে আর কী ওই জমি, ফ্ল্যাট কেনা-বেচা। খুব বেশি যে টাকাপয়সা আছে এ লাইনে তা নয়। তবে কোনওমতে চলে যায়। আমার বাঁ কাঁধে গুলি লেগেছিল। ফ্লেশ উন্ড কি না অত জানি না, ডাক্তার তো ওরকমই কিছু বলছিল। হাড়ে লাগেনি, শুধু পেশিতে গুলি লেগেছে। তা হ্যাঁ, সেদিনের কথা! সেদিন ওই একখানা ফ্ল্যাট দেখে ফিরছিলাম আর কী। হঠাৎ করে পিছনে যেন সে বোম ফাটার মতো আওয়াজ। বুঝলেন কিনা? সে মানে প্রথমটায় তো আমি বেশ চমকে উঠি। পর পর কয়েকটা। পিছন ফিরে দেখি, মুখে কালো কাপড়-বাঁধা একটা লোক হাতে বন্দুক নিয়ে সজোরে বাইক চালিয়ে আসছে। চোখের সামনে কয়েকজনকে গুলি করে দিল।"

"কতজন মনে আছে?"

"কী যে বলেন! তখন আমার ভয়ে গলা শুকিয়ে গেছে! অত খেয়াল নেই। পুলিশ আসার পর শুনলাম নাকি গুলি করেছে। তার মধ্যে তো পাঁচজন শুনলাম স্পট-ডেড়। আর আমার আগে যে মহিলাকে গুলি চালিয়েছে সে তো এখনও কোমায়। কী যা-তা ব্যাপার।"

ইন্দ্রাণী এবার সদাশিবের চোখে চোখ রাখে, "আপনি কি ছিনতাইবাজটাকে আটকাতে চেষ্টা করেছিলেন?"

সদাশিব যেন ভয়ে পিছিয়ে যায়, "কী যে বলেন! একটা 'চোর' 'চোর' শুনেছিলাম বটে। কিন্তু আপনি বাঁচলে বাপের নাম। আমিও চেঁচাচ্ছিলাম কিন্তু আটকানোর সাহস পাইনি।"

"পিছনে 'চোর' 'চোর' বলে চিৎকার হচ্ছিল? নাকি 'খুন' 'খুন' করে?"

সদাশিব একটু আনমনা হয়ে বলে, "কী জানি, হতেও পারে খুন খুন করে চিৎকার," একটু ঘাড়টা চুলকে অপরাধীর মতো বলে, "আসলে তখন অত খেয়াল ছিল না, ভয়ে। আর গুলি লাগার পরে তো যন্ত্রণায় আরও মানে সে কী যন্ত্রণা কী বলব আপনাকে!"

boierpathshala.blogspot.com

"পুলিশকে কিছু বর্ণনা দিতে পেরেছেন? যা ভয়ে ছিলেন বলছেন, তাতে সেগুলো ঠিক তো?"

সদাশিব হাতের মধ্যে হাত ঘষে— "ওটা ঠিক আছে। লোকটাকে খুব বেশি সময় ধরে দেখিনি, তবে কাছ থেকে দেখেছি। তাই মোটামুটি একটা শারীরিক বর্ণনা দিয়েছি। মুখ তো এমনিতেই ঢাকা ছিল। কিন্তু ও ধরতে পারবে না, দেখবেন।"

"কেন?"

সদাশিব যেন একটু আশাহত হয়ে বলল, "আরে, শহরে এত ছিনতাইবাজ। কোথায় খুঁজবে? একটা স্কেচ হলে তা-ও এক কথা। কিছুই তো নেই!"

ইন্দ্রাণী বলে ওঠে, "কেন? ফিঙ্গারপ্রিন্ট?"

"ধুস। ওসবে কিচ্ছু হবে না। পুলিশ কি এখন গড়িয়াহাটের মোড়ে সবাইকে দাঁড় করিয়ে হাতের ছাপ নেবে? ওসব থেকেও কিছু হবে না। ও পালিয়ে গেছে। আপনারাও ছেপেই বা কী করবেন? যাদের সব্বনাশ হওয়ার হয়ে গেছে।"

ইন্দ্রাণী একবার 'হুম' বলে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। তারপর বলে, "আচ্ছা ঠিক আছে। এখন আসি। প্রয়োজন হলে আবার আসব। নমস্কার।"

দীপ্ত আর ইন্দ্রাণী দু-জনেই বাড়ি ফেরার পথ ধরে।

* * * * * * * *

বিকেলের দিকে ইন্দ্রাণী এসে মৃত পাঁচজনের সমস্ত তথ্য জেঠুমণির হাতে তুলে দেয়। আগামী ক-দিন ইন্দ্রাণী আর দীপ্ত ঘটনাস্থলের বেশ কিছু ছবি তোলে। আশপাশের লোকজনদের সঙ্গেও কথা বলে। এর মধ্যে হাসপাতালে অন্যজন আহতকে দেখতে যায়। আহত মহিলা এখনও কোমাতে, মাথার খুলি ছুঁয়ে একটা গুলি, আর-একটা বুকের বাঁ পাশে হৃৎপিণ্ডের একটু উপরে। ডাক্তাররা বলছেন, কপালজোরে বেঁচেছেন। এর মধ্যে শেখরবাবু অবশ্য তার দাদার ঘর থেকে একশোবার পায়চারি করে গেছেন কিন্তু এখনও কোনও আশার আলো দেখতে না পেয়ে বেশ হতাশ।

boierpathshala.blogspot.com

* * * * * * * *

বালিগঞ্জ প্ল্যাটফর্মে সকাল সকাল ভীষণ ভিড়। প্রত্যেকদিনের অফিসযাত্রীরা তড়িঘড়ি এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে। এর মধ্যেই ট্রেনের ঘোষণা হয়ে গেছে। টিকিট কাউন্টারে বসা মধ্যবয়স্ক লোকটিকে সবাই শাপশাপান্ত করছে আর তাড়া দিচ্ছে। একটি মেয়েও সকাল সকাল লাইনে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখছে।

পিছন থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠল, "ও দিদি, সামনে এগোন-না!" মেয়েটি সামনে তাকিয়ে দেখে, কিছু লোক অনেকটাই এগিয়ে গেছে। সে-ও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে আবার এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে। মেয়েটির হাতে কিছু বই, আর একটি সকালের খবরের কাগজ। শহরে আস্তে আস্তে ঠান্ডা পড়ছে। মেয়েটির গায়েও একটি হালকা সবুজ রঙের চাদর। মেয়েটি টিকিট কাউন্টারের সামনে এসে পড়েছে, "আমাকে একটা শিয়ালদার..." মেয়েটি পিছন ঘুরে কিছু একটা দেখেই ছুটে বেরিয়ে যায়। টিকিট কাউন্টারের লোকটি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করতে থাকে, "আরে, আপনার টিকিটটা। আরে টাকাটা..." পিছন থেকে লোকজনও চেঁচাতে থাকে, "ও দিদি..." কিন্তু ততক্ষণে মেয়েটি প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে উলটোদিকের রাস্তা ধরে ছুটতে ছুটতে একটি লোকের সঙ্গে ধাক্কা খেল। লোকটির হাতের চা আর শিঙাড়াটা পড়ে গেল, আর মেয়েটির হাতের বই ও খবরের কাগজটা। লোকটি একটু বিরক্ত হয়েই বলে ওঠে, "ধ্যাত"। লোকটি আরও ভালো করে খেয়াল করে বলল, "আরে ম্যাডাম, সেদিন আপনিই তো আমার বাড়িতে এসেছিলেন!" মেয়েটি হালকা হেসে বলে, "আর বলবেন না। অফিসে খুব লেট হয়ে গেছে," মেয়েটি নিচু হয়ে বইগুলো তুলতে থাকে। লোকটি সকালের কাগজটা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে মেয়েটিকে ফেরত দেয়, "আপনার কাগজটা।"

"থ্যাঙ্ক ইউ। আর সরি, আপনার সকালের চা-টা মাটি করলাম।"

"আরে না না।"

"আসি।" মেয়েটি আর কথা বাড়ায় না। তাড়াতাড়ি পা চালায়।

boierpathshala.blogspot.com

* * * * * * * *

দু-দিন পর সকালে জেঠুমণি শেখরবাবুকে একটা খবরের কাগজ এয়ারটাইট পলিপ্যাকে দিয়ে বললেন, "এটা ল্যাবে পাঠাস।"

"কেন?"

"বাইকে পাওয়া ফিঙ্গারপ্রিন্টের সঙ্গে মিললে, তুই তোর আততায়ী পেয়ে গেছিস ধরে নে।"

শেখরবাবু একটু চোখ বড় বড় করে বললেন, "কী বলছিস দাদা! এটা কার ফিঙ্গারপ্রিন্ট? আর কোথা থেকেই বা পেলি?"

জেঠুমণি সকালের চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, "সেটা পরে জানলেও চলবে। আগে কনফার্ম হওয়াটা দরকার। এটা জোগাড় করে নিয়ে এসেছে তোমারই ছোটকন্যে।"

"কিন্তু ইন্দ্রাণীকে এসবে জড়ানোর কী দরকার ছিল? আমাকে বললেই আমার লোক পাঠিয়ে দিতাম।"

জেঠুমণি একটা বিজ্ঞের হাসি হেসে বলল, "সবাইকে দিয়ে সব কাজ হয় না। ধর তুই যদি এখন বাড়িতে রান্নাবান্না করতিস আর বউমা লালবাজার যেত, তাহলে বউমা হয়তো লালবাজারটা সামলে দিলেও দিতে পারত; কিন্তু তোর রান্নার ঠেলায় আমাদের সবাইকে সন্ন্যাস নিতে হত।"

জেঠুমণির কথা শুনে বাইরে থেকে দুই বোন শিবানী আর ইন্দ্রাণী হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল। শেখরবাবু এবার একটু অভিমানী ভঙ্গিতে বললেন, "তবু আমায় একবার জানাতে পারতিস। তোর কি মনে হয়, আমি কিছুই জানি না? কিছুই পারি না? এবার এই কাগজটায় ম্যাগনেটিক ডাস্ট দিয়ে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডেভেলপ করা হবে। এসব আমি দাঁড়িয়ে থেকে কতবার দেখেছি। ইন্দ্রাণী কি এসব জানে?"

জ্যেঠুমণি ভ্রূ কুঁচকে বলল, "কী টেস্ট? স্বাভাবিক। হাতের কাছে সবকিছু করে দেওয়ার লোক থাকলে এরকমই যে, না জেনেই শো অফ করবি; সেটাই স্বাভাবিক। ওই ফিঙ্গারপ্রিন্টটা গতকালকে সকালের দিকে সংগ্রহ করা।"

boierpathshala.blogspot.com

শেখরবাবু হাতের কাগজটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তাতে কী? তুই মেয়েদের সামনে বেশি-জানা ভাবটা ছাড়। আমি অনেক ক্রাইম স্পটে থেকে নিজে দেখেছি— ম্যাগনেটিক ডাস্ট থেকে কাগজের উপর থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করতে। তোর যদি ভুল মনে হয়, তুই বল!"

"সেটা আমি কেন! লালবাজারের আর-একজন 'ফুলিশ' আছেন, তিনি বলবেন।" জেঠুমণি শিবানীর দিকে তাকাল।

শিবানী কপট রাগের ভঙ্গিতে বলল, "আমি মোটেই 'ফুলিশ' না। আমি জানি বারো-তেরো ঘণ্টা পরের ফিঙ্গারপ্রিন্ট কাগজের উপর থেকে ম্যাগনেটিক ডাস্ট দিয়ে সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব। আমাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট মূলত ঘাম অথবা সিবামের মাধ্যমেই কোনও সারফেসে থেকে যায়। আমাদের সিবামের ৯৮%-ই হল জল। তাই কাগজের মতো সারফেস তা বারো-তেরো ঘণ্টার মধ্যে শুষে নেয়। ম্যাগনেটিক ডাস্ট মূলত ওই জলীয় অংশের উপস্থিতির উপরেই নির্ভরশীল।"

জেঠুমণি আর-এক চুমুক চা নিয়ে বলল, "তাহলে উপায়?" শিবানী আর শেখরবাবু দু-জনের মুখ দেখতে লাগলেন। জেঠুমণি বলল, "যার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল, এবার সে একটু চেষ্টা করে দেখুক।"

ইন্দ্রাণী তখনও কেমন যেন কুঁকড়ে আছে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "আয়োডিন টেস্ট। ক্রিস্টাল আয়োডিনকে রুম টেম্পারেচারের থেকে কিছুটা বেশি উষ্ণতায় কাগজের উপর বোলানো হলে হালকা বাদামি রঙের ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যায়। কিন্তু এই পদ্ধতির সমস্যা হল, আয়োডিন উবে গেলেই আবার প্রিন্ট অদৃশ্য হয়। তবে এই পদ্ধতিতে খরচ কম, তাড়াতাড়ি হয় এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট নষ্ট হওয়ার কোনও সুযোগই প্রায় থাকে না। কিন্তু ঠিক যত তাড়াতাড়ি হয়, তত তাড়াতাড়ি মিলিয়েও যায়। যদিও এনহ্যান্সার লাগালে তা স্থায়ী হয়, কিন্তু তার জন্য যথেষ্ট দক্ষ হাতের প্রয়োজন; সঙ্গে ধৈর্য। সেই তুলনায় ডি.এফ.ও. টেস্টে পরিশ্রম কম। করা সহজ। সিবামের অ্যামিনো অ্যাসিডের উপস্থিতিতে ডি.এফ.ও এজেন্ট হালকা গোলাপি-বেগুনি বর্ণ ধারণ করে। যা যে-কোনও আল্ট্রা-ভায়োলেট রে বা হালকা সবুজ

boierpathshala.blogspot.com

আলোর নীচে আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কাগজ ঘামের অন্য অংশগুলির মতো অ্যামিনো অ্যাসিডকে শুষে নেয় না, যেমন— ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, শুগার, ল্যাকটিক অ্যাসিড, কোলিন, ক্রিয়েটিনিন। এই উজ্জ্বল রঙের ফিঙ্গারপ্রিন্টকে হালকা কমলা রঙের কাচের উপর দিয়ে ফোটো তুলে সংরক্ষণ করা হয়। কারণ, এটি ফোটো-সেনসেটিভ। ত্রিশ মিনিট পরই যদিও ধীরে ধীরে ফেড হতে থাকে এই রি-এজেন্ট। এ ছাড়া, ইদানীং একটি নতুন টেস্ট এসেছে, রিভার্স ন্যানো গোল্ড ডাস্ট টেস্ট...”

জেঠুমণি থামিয়ে দিয়ে বলে, “কী করছিস! আর বলতে হবে না। এ দেশে এখনও মনে হয় না, রিভার্স ন্যানো গোল্ড ডাস্ট টেস্ট কোথাও হয়! তাই আর বলে লাভ নেই। এমনিতেই লালবাজারের মুখ পুড়িয়ে দিয়েছিস তুই...” এবার শেখরবাবুর দিকে ঘুরে বলল, “আশা করি এবার আর ওর যোগ্যতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। ডি.এফ.ও.-টাই করিস। হয়ে যাবে।”

* * * * * * * *

অবশেষে রবিবার দুপুরে অফিসের আরও দুই উচ্চপদস্থ পুলিশকর্তাকে সঙ্গে নিয়ে শেখরবাবু তাঁর দাদার ঘরে সমবেত হন, সঙ্গে অবশ্যই ইন্দ্রাণী। রবিবারের মধ্যাহ্নভোজের পর ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে জেঠুমণি বলতে শুরু করল, “প্রথমেই বলে রাখি, কেসটা মোটেই ছিনতাইয়ের ছিল না, ছিল খুনের।”

শেখরবাবুর বন্ধু দীনেশবাবু বলে উঠলেন, “হ্যাঁ, সে তো বটেই। ছিনতাই করতে গিয়েই তো খুনগুলো হল।”

জেঠুমণি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, “আজ্ঞে না। খুনটা ঢাকার জন্য ছিনতাই করা।”

“ও। তার মানে আপনি বলতে চান দিনেদুপুরে কলকাতায় পাঁচটা সিরিয়াল কিলিং?”

“মশাই, সিরিয়াল কিলিং-এর বেসিক রুলই হল একসময় একটা খুন। এখানে তো পাঁচটা!”

এবার দীনেশবাবু একটু বিরক্ত হয়ে উঠলেন, “কী যে মশাই বলতে চাইছেন

boierpathshala.blogspot.com

আপনি, কিছুই বুঝছি না!"

শেখরবাবু বললেন, "দাদা, একটু ভেঙে বলবি?"

"তাহলে শোন। তোদের রিপোর্টেই অন্য একজন মহিলা সাক্ষীর কথা বলা আছে। আততায়ীর বাইক দেখে যিনি শনাক্ত করেছেন যে ঘটনাস্থলের কিছু আগে ওই বাইকটি তার পাশ কাটিয়ে আগে গিয়ে ছিনতাই করে। ওই মহিলার গলায় আর কানে মিলিয়ে প্রায় পাঁচ গ্রাম সোনার গয়না ছিল ওইদিন," জেঠুমণি শেখরবাবুর দিকে তাকাল।

"তাতে কী?"

জেঠুমণি একটা ফাইল এগিয়ে দিয়ে বলল, "তোদের রিপোর্ট বলছে ছিনতাই হওয়া হারের ওজন দুই গ্রামের বেশি না। এই ধরনের ক্রাইমে প্রথমে ছিনতাইবাজ টার্গেট ঠিক করে তারপর অপারেশন। এখন তোদের ছিনতাইবাজ ত্রিশ-চল্লিশ ফুটের মধ্যে পাঁচ গ্রামের সুযোগ থাকতে মাত্র দু-গ্রামের জন্য এত কষ্ট কেন করতে যাবে?"

দীনেশবাবু আর শেখরবাবু একসঙ্গে বলে উঠলেন, "তাহলে?"

"তাহলে মানেটা খুবই সোজা। গলির মুখে সে কোনও বিশেষ কাউকে খুন করার জন্যই ওয়েট করছিল। যেই তাকে দেখল অমনি যাকে সামনে পেয়েছে তার হার নিয়ে চম্পট। যাতে হঠাৎ করে দেখে মনে হয়, ছিনতাই করতে গিয়ে খুনগুলো আততায়ী ধরা পড়ার ভয়ে করেছে।"

দীনেশবাবু একটু অবাক চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহলে বাকি খুনগুলো?"

"ডাবল প্রোটেকশন। যাতে খুনের তদন্ত হলেও আসলে কে টার্গেট ছিল, বোঝা না যায়। সব ক-টা বডিই পেভমেন্টের উপর পাওয়া গেছে। মানে সেই অর্থে কেউই রাস্তায় নেমে সামনে থেকে আততায়ীকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেনি। পোস্টমর্টেম রিপোর্টও বলছে, সব ক-টা গুলি লেগেছে তেরচা হয়ে, প্রায় আট থেকে দশ ফুট দূর থেকে। অথচ মৃতদের যে-কেউই যদি বাধা দেওয়ার জন্য আততায়ীর সামনাসামনি এসে থাকত, তাহলে না তো গুলিগুলো অতটা তেরচা হয়ে লাগত আর না তো দূরত্ব চার থেকে পাঁচ

boierpathshala.blogspot.com

ফুটের বেশি হত।"

শেখরবাবু অস্ফুটে বলে উঠলেন, "আর বাধা না দিলে, শুধু শুধু একটা ছিঁচকে ছিনতাইবাজ গুলি চালাতে যাবেই বা কেন?"

"একদম ঠিক ধরেছিস শেখর। আর চলন্ত বাইক থেকে নিশানা লাগানো সহজ না। অথচ তোদের ছিনতাইবাজ দশটা গুলি চালাল আর সব ক-টাই নির্ভুলভাবে হয় কারও খুলি ফুটো করে দিল না হয় হৃৎপিণ্ড। ওই শেষ দু-জন বাদ দিলে!"

দীনেশবাবু টেবিল থেকে এক গ্লাস জল নিয়ে কোনওক্রমে খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহলে আসল টার্গেট কে ছিল?"

জেঠুমণি ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, "সেটা জানতে পারতাম না এই ওয়াটসন ছাড়া।" ইন্দ্রাণী লাজুক হাসিতে মাথা নামিয়ে নিল। জেঠুমণি আবার শুরু করল, "প্রথম যিনি মারা গেছেন, একজন ঠিকে ঝি, তাই একে সহজেই বাদ দেওয়া যায়। এরপর রাস্তার পাশের চা-ওয়ালা, বাদ। জুয়েলারি দোকানের মালিক— হতে পারে। এরপর কলেজছাত্রী— হতে পারে। পরের জন একজন প্রোমোটার— হতে পারে। এখন ব্যাপার হল, একজন কলেজ ছাত্রীকে মারার জন্য এত প্ল্যান করাটা অতিনাটকীয়, বিশেষ করে সে যখন বিশেষ কেউ না। জুয়েলারি দোকানের মালিকের সম্প্রতি কোনও গণ্ডগোল বা টেনশন ছিল না বলেই ওয়াটসন ম্যাডাম খোঁজখবর করে জানিয়েছেন।" জেঠুমণি ইন্দ্রাণীর দিকে মিটিমিটি চোখে হাসল, "কিন্তু এই প্রোমোটার ভদ্রলোকের কিছুদিন ধরেই তাঁর পার্টনারের সঙ্গে ব্যাবসার ভাগাভাগি নিয়ে উত্তেজনা চলছিল। উনি ব্যাবসার সমস্ত অংশীদারিত্ব দাবি করে কোর্ট-কেস করেছেন। এই পার্টনারটিও প্রায় কেস হারার মুখে। তাই এই প্রোমোটার মশাইকে মারা অথবা নিজে আত্মঘাতী হওয়া ছাড়া তাঁর কাছে আর কোনও উপায় থাকছে না।"

শেখরবাবু লাফ মেরে চেয়ার থেকে উঠে বললেন, "তাহলে আততায়ী কে, সেটা জানতে পেরেছ?"

জেঠুমণি আয়েশ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, "বা রে, তোকে তো

boierpathshala.blogspot.com

ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে দিয়েছি। তুই বলেছিস নাকি ম্যাচও করেছে। তাহলে যা, এবার ধরে আন।"

"ভারী অদ্ভুত তো! তুই তো ফিঙ্গারপ্রিন্টটাই দিয়েছিস, কার তো বলিসনি। এখুনি দে। আর নয়, অনেক হয়েছে," শেখরবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

জেঠুমণি হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিয়ে বলল, "অত তাড়া কীসের? আততায়ী বেশ আত্মবিশ্বাসী যে সে পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পেরেছে। তাই সে কোথাও পালাবে না। ওয়াটসন ম্যাডাম নিজে গিয়ে কথা বলে এসেছেন তার সঙ্গে।"

"মানে!"

"মানে, পুলিশ একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর বয়ান রেকর্ডই করেনি!"

"কে?"

"সেদিন একজন অন্ধ স্কুলশিক্ষক সবে বাড়ি ফিরছিলেন, তখনই এসব ঘটে। তাঁর ইন্টারভিউয়ের রেকর্ডিং দীপ্ত তিনটে নিউজ চ্যানেল থেকে নিয়ে এসেছে। একবার দেখ," জেঠুমণি টিভি-টা চালিয়ে দিল, 'সেদিন আমি সবে সদর দরজা খুলে ঘরে ঢুকেছি, এমন সময় একটা কান-ফাটানো গুলির আওয়াজ শুনলাম, তারপরই খুন-খুন চিৎকার। তারপর দুটো পর পর, আবার একটা, আবার একটা। তারপর দুটো পর পর। এরপর আবার দুটো, শেষে আবার একটা।'

শেখরবাবু অধৈর্য হয়ে বললেন, "এর থেকে কী বুঝব?"

জেঠুমণি মিচকি হেসে একটা ফাইল খুলে সাতজনের ছবি টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখল, "পুলিশি রিপোর্ট অনুযায়ী মৃত এবং আহত ব্যক্তিদেরও রাস্তার উপরে ঠিক এই ক্রমেই পাওয়া গিয়েছিল বলে উল্লেখ আছে। প্রথমে ঠিকা ঝি, একটা গুলি মাথায়। দ্বিতীয় চা-ওয়ালা, দুটো গুলি— একটা মাথায়, অন্যটা বুকে। তৃতীয় জুয়েলারি মালিক, একটা গুলি— বুকে। কলেজছাত্রী, একটা গুলি— মাথায়। পঞ্চম আমাদের প্রোমোটার মশাই, দুটি গুলি— একটা মাথায় আর একটা গলায়। এরপরই যত গণ্ডগোল। ষষ্ঠ হলেন আমাদের আহত ব্যক্তি, কাঁধে একটা গুলি; অথচ গুলি চলল দু-বার। সপ্তম স্থানে

boierpathshala.blogspot.com

কোমায় থাকা মহিলা যার দুটি গুলি লেগেছিল, কিন্তু গুলি চলল একবার।"

দীনেশবাবু বললেন, "একজন অন্ধের শোনা শব্দকে কি আমরা বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি না? উনি ভুলও তো শুনতে পারেন? হতেও পারে, ষষ্ঠবার দুটি গুলি চলল, কিন্তু একটা মিস হয়েছিল।"

জেঠুমণি হেসে বলল, "আপনি যা নিজে দেখেছেন, বলার সময় কি তা বার বার বদলে ফেলেন দীনেশবাবু? এক যদি আপনি নিজে জেনেশুনে মিথ্যে না বলছেন। অন্ধদেরও শব্দটা অনেকটা আমার-আপনার দেখার মতোই। ওই একই দিনই তিনটে আলাদা আলাদা চ্যানেলে উনি একই বয়ান দিয়েছেন। তা ছাড়া পুলিশি রিপোর্টেও দশটা গুলির কথা বলা আছে, কোনও মিস হওয়া গুলির কথা নেই। ওঁর বয়ান শুনলেও দশটা গুলির হিসেবই পাওয়া যায়, বেশি বা কম নয়।"

শেখরবাবু এবার উত্তেজনায় দাদার হাত ধরে বলে উঠলেন, "আর কথা বাড়াস না দাদা। আততায়ী কে বল— আমাদের বাঁচা এবার।"

জেঠুমণি হা হা করে হেসে বলল, "মড়ার পোস্টমর্টেম হয়, আহতদের নয়। তোদের আততায়ীও সেই সুযোগই নিয়েছিল। আর একজন আহতকে সন্দেহ করার কথা কার বা মাথায় আসবে?"

দীনেশবাবু ঝুঁকে পড়লেন, "তার মানে বলতে চাইছেন আহত ষষ্ঠ লোকটাই আততায়ী? কীভাবে?"

জেঠুমণিও দীনেশবাবুর দিকে ঝুঁকে পড়ল, "যে আততায়ী আট ফুটের দূরত্ব মিস করে না, তার পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ মিস করাটা কি খুব লজিক্যাল? ডাক্তারের সঙ্গে ইন্দ্রাণী কথা বলেছে, ওই লোকটিকে একদম কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে বলে উনি কনফার্ম করেছেন। গুলির ক্ষতের চারপাশটা পোড়া ছিল অনেকটাই। খুব ভুল অনুমান না করলে, আততায়ী ষষ্ঠবার দুটি গুলি চালায় দূরের মহিলাটিকে। তাই এবার আর লক্ষ্য অব্যর্থ হল না। সপ্তমবার নিজেই নিজের কাঁধে একটি গুলি চালাল। সামনেই গড়িয়াহাটের মোড়ে পুলিশ বুথ, ট্র্যাফিক পুলিশ— সব মিলিয়ে বেশি দূর পালাতে পারত না। তার উপর পর পর গুলির শব্দে সবাই বাইরে আসতে শুরু করে দিয়েছিল। তাই

boierpathshala.blogspot.com

এর থেকে ভালো গা-ঢাকা দেওয়ার উপায় তার কাছে আর কিছু ছিলও না।"

দীনেশবাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "সবই আমি বুঝলাম। আপনার যুক্তি সবই অভ্রান্ত। কিন্তু একটা অন্ধের বয়ানকে এতটা গুরুত্ব কোর্ট না-ও দিতে পারে।"

জেঠুমণি হালকা হেসে ভারিক্কি চালে বলল, "সব যদি আমি আর আমার ভাইঝিটি করে, তাহলে আর পুলিশ কী করবে বলুন দেখি? যে আততায়ী এত নিখুঁত নিশানায় গুলি চালায়, সে যে শার্প শুটার সুপারি কিলার— এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইন্দ্রাণীকে দেওয়া বয়ানে সে বলেছিল, আগে কোমায় থাকা মহিলাটির গুলি লাগে, পরে তার। কিন্তু পুলিশের সংগ্রহ করা স্পট রিপোর্টে সিকোয়েন্সটা ঠিক উলটো। আসলে আততায়ী সদাশিব পান্ডা নিজের অজান্তেই তার ভিস্যুয়াল মেমোরিতে যা ছিল, সেটাই বলে ফেলেছে। সে সেদিন আগে মহিলাটিকে গুলি করে, পরে নিজেকে। তাই সেদিন তার বাড়িতে ইন্দ্রাণীকেও ভুলবশত সত্যিটাই বলে ফেলেছে। ওর বাড়ি তল্লাশি করুন, পিস্তলটি পেয়ে যাবেন। তখন ব্যালেস্টিক রিপোর্ট থেকে কোর্টে আততায়ীকে দোষী সাব্যস্ত করা কি খুব কঠিন হবে, দীনেশবাবু? আর ব্যাঙ্ক চেক করলে আশা করি কে সুপারি দিয়েছিল সে কথাও জেনে যাবেন।

আচ্ছা, আপনারা সেদিন মনে হয় ওই সদাশিব পান্ডাকে কোনও জেরা বা তল্লাশি করেননি, না?"

"না... মানে...! তখন উনি তো গুলি-টুলি লেগে কাহিল অবস্থা। তাই সেদিন ঠিকানা আর ফোন নম্বর নিয়েই আমরা ছেড়ে দিই। পরের দিন জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলাম অমরা।", দীনেশবাবু একটু অপ্রস্তুতভঙ্গিতে মাথা চুলকোতে থাকলেন।

জেঠুমণি বলল, "ওখানেই একটা মস্ত ভুল হয়েছিল। ঐ সময়ে সদাশিব পান্ডার কাছে সম্ভবত পিস্তলটি ছিল। সেদিনই যদি আপনারা তার তল্লাশি নিতেন তাহলে হয়তো ব্যাপারটি এতদূর গড়াতই না।"

শেখরবাবু বড় করে একটা দম ছেড়ে বললেন, "উফফ দাদা, তুই আমায় বাঁচালি। যাই, এবার মালটাকে গারদে ঢোকানোর ব্যবস্থা করি।"

দীনেশবাবু হাসিমুখে উঠে দাঁড়িয়ে জেঠুমণির দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন,

boierpathshala.blogspot.com

"শেখরবাবুর কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছিলাম। দেখা হয়ে ভালো লাগল। কিন্তু আপনার নামটা?"

জেঠুমণি দীনেশবাবুর সঙ্গে করমর্দন করতে করতে বলল, "প্রখর রুদ্র।"

* * * * * * * *

"প্রখরবাবু, আমি লালবাজার থেকে দীনেশ বলছিলাম। আপনার কথাই ঠিক। আমরা পিস্তল পেয়ে গেছি। তবে একটা খারাপ খবরও আছে।"

প্রখর রুদ্র ফোনের রিসিভারটা নিয়ে কানের আরও কাছে এনে বলল, "কী?"

ফোনের ওপার থেকে দীনেশবাবুর হতাশ গলা, "আজ্ঞে, লোকটি আজ অন্য কারও শিকার হয়েছে। কেউ আর্সেনিক দিয়ে হত্যা করেছে। শুধু ফোনে একটি নম্বর ছিল 'ডার্ক হর্স' নামে সেভ করা। নম্বরটি ভুয়ো নামে নেওয়া। অদ্ভুতভাবে এই ফোনে আর কোনও নম্বর ছিল না। যদিও আমাদের কেসের সঙ্গে কোনও যোগ আছে কি না জানি না, জাস্ট অদ্ভুত লাগল তাই জানালাম।"

প্রখর রুদ্র চেয়ারে সোজা হয়ে বসল, "ডার্ক হর্স! আই সি। আর সুপারির ব্যাপারটা?"

"আজ্ঞে, ওটাও ভুয়ো। একজন বৃদ্ধাকে হাজার দশেক টাকা দিয়ে তাঁর নামে অ্যাকাউন্ট খুলে সেখান থেকে কিলারকে টাকা ট্রান্সফার করা হয়েছে। বয়েসের কারণেই মহিলা কিছুই ঠিক করে বিবরণ দিতে পারেননি। যাক, ছাড়ুন ওসব কথা। আমাদের কেসটা তো সল্‌ভ হল আপনার দয়ায়। ও, আর-একটা কথা, আপনি দুশ্চিন্তা করতে পারেন ভেবে শেখরবাবু এসব বলতে বারণ করেছিলেন। তা-ও আপনি এতটা হেল্প করেছেন, আমাদেরও তো কিছু দায়িত্ব থেকেই যায়। আপনি অযথা টেনশন করবেন না। ভালো থাকুন।"

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

ছিন্নভিন্ন ছিন্নমস্তা

"হ্যা...হ্যালো। বারুইপুর থানা?"

"হ্যাঁ বলুন।"

"শি...শিগগির আসুন স্যার... আম... আর... বা... ড়ির সাম...নে"

"কী হয়েছে আপনার বাড়ির সামনে?"

"খুন... রক্ত... চারদিকে পড়ে আছে।"

"দেখুন, আপনি ভয় পাবেন না। প্লিজ আপনি ভালো করে বলুন। আপনার ঠিকানা বলুন, আমরা এখুনি আসছি।"

"খুব ভ–য় করছে। আমার বাড়ির সামনে রক্ত ছড়ানো... দুটো কাটা পা... মেয়েটাকে আস্ত রাখেনি... তাড়াতাড়ি আসুন স্যার।"

"আপনি কি কাউকে দেখতে পেয়েছেন?"

"আজ্ঞে, সকাল পাঁচটার দিকে একটা গাড়ির আওয়াজ হয়েছিল। কিন্তু তখন তো দেখিনি। ছ-টার সময় মর্নিং ওয়াক করতে যাওয়ার সময় দেখি এই অবস্থা।"

"ঠিক আছে, আসছি আমরা। আপনি কিছুতে প্লিজ হাত দেবেন না, বাড়ি থেকে বের হবেন না।"

* * * * * * * *

শিবানীর টেবিলের ফোনটা দুপুরের দিকে বেজে উঠল, "বানী, বাবা বলছি। একবার আমার রুমে আয় তো।" শিবানী আর কোনও কথা না বাড়িয়ে ডি.আই.জি.-র ঘরের দিকে পা বাড়াল। ঘরের বাইরে থেকে চড়া সুরে কিছু তর্কবিতর্ক শুনতে পেল। একটু ভয়ে ভয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়াল, "স্যার, আসব?"

পুলিশের ডি.আই.জি., শেখর রুদ্র সম্পর্কে শিবানীর বাবা হলেও অফিসে শিবানী হাইলি প্রফেশনালিটি মেনে চলে, যতই হোক তার বসের বস বলে কথা। ঘরে ঢুকতেই শেখরবাবু বললেন, "আয়। তোর বস, চ্যাটার্জি চায় এই কেসটা তুই দেখ একবার।"

শিবানী দেখল, তার বস প্রদোষ চ্যাটার্জি চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে তার দিকে মিচকি মিচকি হাসছেন।

ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার নিয়ে বসতেই খেয়াল করল, ঘরের ভেতরের দিকে সোফাতে একটি মোটা করে মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক বসে আছেন। পরনে মভ রঙের শার্ট আর ছাই রঙের প্যান্ট– পরিপাটি করে গোঁজা। চ্যাটার্জি না ঘুরেই বললেন, "বারুইপুর থানার ও.সি., মৃণাল দেব। একটা ভয়ংকর কেস এসেছে। বারুইপুর থানা আমাদের সহায়তা চায়। কী মৃণালবাবু, আপনিই বলুন।"

"আজ্ঞে, গত দুই সপ্তাহে এই নিয়ে চারটে মার্ডার হয়েছে। শুধু মার্ডার বললে ভুল হবে। নৃশংসভাবে। আগের সপ্তাহে মঙ্গলবার প্রথম খুন হন এক বছর ছত্রিশের মহিলা। নগ্ন দেহ পাওয়া যায় হরিনাভি থেকে বারুইপুরের দিকে আসতে একটা ফাঁকা মাঠে। এরপর বৃহস্পতিবার খুন হন বছর ত্রিশের এক মহিলা। সকালে বারুইপুর স্টেশন থেকে কিছু এগিয়ে রেললাইনের উপরে বডি পাওয়া যায়। ধড় থেকে মাথা আলাদা। নগ্ন মহিলাদেহ। মাথা পাওয়া যায় বেশ অনেকটা দূরে। বারুইপুর মহিলা থানা সংলগ্ন নতুনপাড়ার একটা মাঠের পাশে ময়লার স্তূপ থেকে। পলি প্যাকেটে বাঁধা। পরের সপ্তাহে খুন মঙ্গলবার রাতে। যথারীতি বডি পাওয়া যায় পরদিন সকালে, মাদারহাট চিলড্রেন'স পার্কে। এবার আর দুই নয়— বডি তিন খণ্ড। মস্তকটি পার্কের একধারে, দুটি পা-সহ মহিলার নিম্নাঙ্গ অন্যধারে আর মধ্যভাগের অনাবৃত মহিলাদেহ খণ্ডটি কিছু দূরের দুর্গা মন্দিরের পিছনে। আর চতুর্থ মহিলা— আজ সকালে আমরা চাম্পাহাটি–ঘটকপুকুর রোডের উপর বাবা পঞ্চাননের মন্দিরের সমানে একটি বাড়ি থেকে ফোন পেয়ে ছুটে যাই। গিয়ে দেখি দুটো কাটা পা, উরুর অংশ থেকে কাটা। দেহের বাকিটা আমরা পাইনি। এখনও ওই ভিকটিমদের বাড়িতে খবর নেওয়া আর জিজ্ঞাসাবাদ করা ছাড়া আর

boierpathshala.blogspot.com

কোনও বিশেষ প্রোগ্রেস হয়নি। তাই আজ সকালে প্রদোষবাবুকে ফোন করে একবার কেসটা নিয়ে মিট করার আগ্রহ প্রকাশ করি।"

শিবানী একবার তার বাবা আর একবার তার বসের দিকে তাকায়। প্রদোষবাবু বলেন, "তোমার কী মত হে? একবার দেখবে নাকি?"

শিবানী বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে। শেখরবাবুও স্মিত হেসে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানান। এবার শিবানী শুরু করে, "এই চারটে খুন কোরিলেটেড নাকি আলাদা ঘটনা? তেমন কোনও ক্লু?"

মৃণালবাবু কয়েকটি ছবি এগিয়ে দিলেন, "মনে তো হচ্ছে একই খুনে! দেহাংশ থেকে হলুদ, সিঁদুর, গন্ধক, কর্পূর— এসবের ট্রেস পাওয়া গেছে। আর ফরেনসিক বলছে, বেশ শার্প ছুরি দিয়েই দেহ খণ্ড খণ্ড করা হয়েছে।"

"প্রথমটা মঙ্গলবার, দ্বিতীয়টা বৃহস্পতিবার, তৃতীয়টা মঙ্গলবারে আর একটা আজ। আজ তো বৃহস্পতিবার। খুব সম্ভবত পরের খুনও আগামী মঙ্গলবার হতে চলেছে!"

মৃণালবাবু চোখ কুঁচকে শেখরবাবুর দিকে তাকালেন। শেখরবাবু হাঁ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, "মাথাটা কি এক্কেবারে গেছে? কিছুই দেখলি না, ঠিকঠাক শুনলি না। এদিকে বলে দিলি আগামী মঙ্গলবার আবার খুন!"

শিবানী ঠোঁট উলটে বলল, "সিঁদুর, গন্ধক, কর্পূর— এত কিছুর পরও কি তোমরা সত্যিই দেখতে পারছ না? আততায়ী কোনও একটি বিশেষ পূজার মাধ্যমে মেয়েগুলিকে বলি চড়াচ্ছে। আর সেই কারণেই মঙ্গলবার আর বৃহস্পতিবারেই সে এই পূজাগুলি করছে। আর ক-টা খুন হবে বলতে পারছি না। তবে এই ধরনের নরবলি সাধারণত বিজোড় সংখ্যায় হয়। খুন চারটে হয়েছে। মানে বিজোড় হতে মিনিমাম আরও একখানা দরকার!"

এমনিতে শিবানী অফিসে পেশাদারিত্ব মেনে চলে ঠিকই, কিন্তু উত্তেজনার চরম মুহূর্তে সে কখন যেন 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমে এসেছে নিজেও বুঝতে পারেনি।

ঘরে সকলে একে অন্যের মুখের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। মৃণালবাবু ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "তাহলে উপায়?"

boierpathshala.blogspot.com

শিবানী বলে ওঠে, "মৃতদের কোনও কমন লিঙ্ক?"

"চার নম্বর মহিলার তো এখনও শনাক্তকরণ হয়নি। বাকি দু-জন পেশায় দেহ ব্যবসায়ী ছিলেন! আর দ্বিতীয়জন অবিবাহিতা ছিলেন।"

প্রদোষবাবু চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে শেখরবাবুর দিকে ফিরে বললেন, "বুঝলেন স্যার, মনে হচ্ছে কোনও স্বনিযুক্ত সমাজসংস্কারক নিজ হাতে এইসব দেহ ব্যবসায়ীকে সাফ করার ব্রত নিয়েছে! বুঝলেন কিনা, ওই আর কী নীতি-পুলিশ টাইপ!"

শিবানী ঝুঁকে পড়ে বলল, "সেটা হতে পারত, কিন্তু এক্ষেত্রে দুটো খটকা রয়েই যায়। আমাদের নীতি-পুলিশ খুনি একজন বেশ্যাকে খুন করতে চায়— তা বেশ! শুধু শুধু তাকে পুজো করতে যাবে কেন? আর দ্বিতীয়জন অবিবাহিত ছিল।"

চ্যাটার্জি মুখের কথা ছিনিয়ে নিয়ে বলল, "আরে বুঝলে না? শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া। দেবতার উদ্দেশে বলি চড়ানোর আগে শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া!"

"সেটা মেনে নিলেও আরও একটা খটকা থেকে যায়। নীতি-পুলিশের যদি যৌনতা এতটাই অস্বস্তিদায়ক হয়, তাহলে সে খুন করার পর নগ্ন নারীদেহ ছড়িয়ে রাখবে কেন? নগ্ন নারীদেহ না চাইতেও যৌনতারই প্রতীক হিসেবে ধরা হয়।"

এবার প্রদোষ চ্যাটার্জি একটু বিরক্ত হয়ে উঠলেন, "এরকম একটা বিকৃতমস্তিষ্কের কাজের লজিক খোঁজা পাগলামি। তার মনে হয়েছে, তাই নগ্ন দেহাংশ ছড়িয়ে দিয়েছে!"

শিবানী আর বেশি কথা না বলে শুধু বলে, "হুম"।

মৃণালবাবু অসহায়ভাবে তাকিয়ে বললেন, "তাহলে এখন আমরা কী করি?"

শিবানী বলল, "আপনি চাইলে সব রিপোর্টের এক কপি করে রেখে যেতে পারেন। আমি যদি কিছু জানতে পারি, আপনাকে জানাব।"

এর মধ্যেই মৃণালবাবুর মোবাইল বেজে ওঠে, "ও আচ্ছা... পাওয়া গেছে... হ্যাঁ, তোমরা খুঁজতে থাকো। না হলে শনাক্ত করা সমস্যা হয়ে যাবে যে..."

boierpathshala.blogspot.com

মৃণালবাবু ফোন রেখে বললেন, "আজ্ঞে, দেহের নিম্নাঙ্গের অংশটুকু পাওয়া গেছে— মানে উরুর উপর থেকে পেট অবধি। পেট থেকে উপরের বাকি অংশ আমার লোকেরা খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

চ্যাটার্জিবাবু গম্ভীর মুখে বললেন, "বুঝলে হে মৃণাল। পরের মঙ্গলবার নাইট ডিউটি বাড়িয়ে দাও!"

মৃণালবাবু উঠতে যাবেন, হঠাৎ শিবানী প্রশ্ন করে বসল, "আপনি তো অনেকদিন হল বিপত্নীক। আপনার ছেলেও বোধহয় আপনার সঙ্গে থাকে না? সম্ভবত আই.আই.টি. দিল্লি?"

মৃণালবাবু চমকে উঠে বললেন, "হ্যাঁ... মানে... আমার ছেলের যখন পাঁচ বছর বয়স তখনই আমার স্ত্রী মারা যান। ছেলে এখন আই.আই.টি. দিল্লিতেই পড়ে, ফাইনাল ইয়ার ইলেকট্রিক্যাল। আমি একাই থাকি।"

"যদি কিছু মনে না করেন, বলি কী এখন কালার ব্লাইন্ডদের জন্য অনেকরকমই লেন্স বেরিয়েছে। চাইলে সেগুলো ব্যবহার করতে পারেন। আপানার অসুবিধা কিছুটা কমবে।"

মৃণালবাবু আরও ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, ছেলেও বলছিল বটে। দেখি কবে ডাক্তারের কাছে যাওয়া যায়!"

মৃণালবাবু আর কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। প্রদোষবাবু কিছুক্ষণ শিবানীর দিকে তাকিয়ে থেকে শেখরবাবুর দিকে অবাকভাবে চাইলেন। শেখরবাবু মুচকি হেসে শিবানীকে বললেন, "দেখ, আমি জানতে চাই না; তুই কীভাবে এসব বললি! জেঠুর স্বভাব দিন দিন তুইও পাচ্ছিস! এসব না-করাই কি ভালো নয়?"

প্রদোষবাবু টেবিল চাপড়ে বললেন, "বাট আই ওয়ান্ট টু নো।"

শিবানী বলল, "তেমন রকেট সায়েন্স না, স্যার। ওঁর মোবাইলের ব্যাক কভারটা একটা কাস্টমাইজ কভার যার পিছনে একটি কমবয়সি ছেলের সঙ্গে ওঁর ছবি, সঙ্গে লেখা, 'মাই সুপারড্যাড'। তাই বুঝলাম ছবিটি ওঁর ছেলের। কভারেরই একটা সাইডে একটা লোগো ছিল— 'Rendezvous'। এটি হল আই.আই.টি. দিল্লির কালচারাল ফেস্টের নাম। বিভিন্ন বড় বড় ইউনিভার্সিটিতে

boierpathshala.blogspot.com

তাদের কালচারাল ফেস্টের সময় এরকম বিভিন্ন মার্চেন্ডাইজ দেওয়া হয়— যেমন কফি কাপ, টি-শার্ট। ওদের হয়তো আগের বছর কাস্টমাইজড মোবাইল ব্যাক কভার দিয়েছিল। সেটিই সে বাবাকে উপহার দিয়েছে।"

প্রদোষ চ্যাটার্জি বললেন, "আর বিপত্নীক?"

"আজ্ঞে, ওর মোবাইলের ওয়ালপেপারে দেখলাম। মোটামুটি বছর ত্রিশের মহিলার ছবিতে একটি ফুলের হার লাগানো। মানে দেওয়ালে টাঙানো ছবিটির মোবাইল ক্যামেরায় ছবি তোলা আর কী। রিসেন্টলি ওই মহিলা মারা গিয়ে থাকলে, মোবাইলেই তোলা বা কোনও না কোনও ডিজিটাল পিকচারই ওয়ালপেপারে থাকত। শুধু শুধু একটা দেওয়ালে টাঙানো ঝাপসা হয়ে-আসা ছবির পিকচার তুলে মোবাইলের ওয়ালপেপার করতে হত না। ভদ্রলোকের এখন বয়স প্রায় পঞ্চাশ। তাই ওই মহিলার মৃণালবাবুর স্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।"

"মায়ের ছবিও তো হতে পারত?"

"আজ্ঞে, তার সম্ভাবনা কম। বছর ত্রিশের মহিলার ছবিটি যদি ওঁর মায়ের হয়, সেক্ষেত্রে ছবিটি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হত। ওঁর মায়ের ত্রিশ বছর বয়সে কালার ফোটোগ্রাফ এ দেশে সহজলভ্য ছিল না।"

প্রদোষবাবু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে নিজের মোবাইলটি টেবিল থেকে তুলে পকেটে ভরে নিলেন, "আর কালার ব্লাইন্ডের ব্যাপারটা?"

"উনি নিজেই বললেন, উনি একা থাকেন। সব কাজ উনি নিজেই করেন। ওঁর জামা-প্যান্ট-জুতো সব পরিপাটি। ভদ্রলোক ফিটফাট থাকতে ভালোবাসেন। সেখানে মভ কালার শার্টের একটি বোতামের সুতোর রং নীল। বোতামটি ছিঁড়ে যাওয়ায় ভদ্রলোক নিজেই সেলাই করেছেন। এরকম ফিটফাট একটি লোক, এরকম ভুল তখনই করতে পারেন যখন তিনি দুটো রঙের পার্থক্য করতে পারেন না। মানে সহজ, উনি কালার ব্লাইন্ড— যেসব রঙের সঙ্গে লালের মিশ্রণ থাকে, সেগুলির রেড কালার এলিমেন্ট ওঁর চোখ দেখতে পায় না।"

"আর যদি কোনও দরজি করে থাকত?"

শিবানী হো হো করে হেসে বলল, "তাহলে তার দোকান এতদিনে উঠে

boierpathshala.blogspot.com

যেত।"

প্রদোষবাবু আর কোনও কথা না বলে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, "দেখো যদি মৃণালবাবুকে কোনও হেল্প করতে পারো!"

শিবানী উত্তর দিল, "হ্যাঁ স্যার নিশ্চয়ই চেষ্টা করব... আপনার স্ত্রী কি বাপের বাড়ি গেছেন নাকি অন্য কোথাও?"

প্রদোষবাবু পিছন ঘুরে একবার দেখেই গটগটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। শেখরবাবু শিবানীর দিকে ফিরে বললেন, "এবার এটা কীভাবে?"

"এত বছর ধরে তো ওঁর সঙ্গে কাজ করছ। কখনও ইউনিফর্মে ময়লা দেখেছ? আর একই অফিসে কাজ করার সুবাদে মোটামুটি আমাদের জানা, ওঁর স্ত্রী-র শুচিবাই স্বভাবের কথা। কিন্তু আজকে ওঁর প্যান্টের পিছনে কালকের বৃষ্টির পরের হালকা কাদার ছিটেগুলো এখনও রয়ে গেছে।"

* * * * * * * *

পরের দিন শুক্রবার, শিবানী সন্ধেবেলা অফিস থেকে সোজা ফিরেই জেঠুর ঘরে ঢুকে গেল। দেখল, জেঠু ল্যাপটপে বসে কিছু একটা করছে আর ইন্দ্রাণী পাশের সোফাতে আধশোয়া হয়ে টক্সিকোলজির একটা বই পড়ছে। শিবানী দু'জনের দিকে একবার দেখে বলল, "আমার কাছে একটা ইন্টারেস্টিং কেস আছে, তোমরা কি শুনবে?"

প্রখর রুদ্র কিছু না বলে একবার মুখ তুলে তাকাল। ইন্দ্রাণী বইয়ের থেকে মুখ না তুলেই জিজ্ঞাসা করল, "বাবা কি জানে, আজ তুই আবার নিজে ড্রাইভ করে ফিরেছিস? তোর কিন্তু এখনও লাইসেন্স হয়নি।"

"বেশি ফ্যাচ ফ্যাচ করিস না। ক-দিনের মধ্যেই পেয়ে যাব। তোকে কে বলল, আমি ড্রাইভ করে এসেছি?"

"তোর ইউনিফর্ম। সবে গাড়ি থেকে নেমে এলি তো। তাই কাঁধের কাছের সিটবেল্টের দাগটা হালকা হলেও বোঝা যাচ্ছে।"

"সে লোকে গাড়ির সামনে বসলেও সিট বেল্ট পরে।"

প্রখর রুদ্র বলল, "সেক্ষেত্রে সিটবেল্টের দাগ বাঁ কাঁধের উপরে থাকবে।

boierpathshala.blogspot.com

ড্রাইভিং সিটে বসলে তবেই ডান কাঁধে ছাপ পড়বে। যা-ই হোক, তোর কেসটা বল।"

শিবানী আর বেশি কিছু কথা না বাড়িয়ে মৃণালবাবু যা যা বলেছিলেন সেসব বলতে শুরু করল। জেঠুর টেবিলে সব রিপোর্ট সাজিয়ে দিল। আর ইন্দ্রাণী সোফাতে শুয়ে শুয়েই ভিকটিমদের পিকচার ল্যাপটপে সিডি ঢুকিয়ে দেখতে লাগল। শিবানীর বলা শেষ হলে প্রখর রুদ্র পোস্টমর্টেম রিপোর্টটার দিকে চোখ রেখে বলল, "ইন্টারেস্টিং!"

শিবানী ঝুঁকে পড়ে বলল, "কী হল?"

"রিপোর্টে বলছে, যে তিনজনের বডি পাওয়া গেছে তাদের ভ্যাজাইনাতে পুরুষের প্রি-ইজাকুলেশন বডি ফ্লুইড পাওয়া গেছে। কিন্তু সিমেন নয়। এমনকী ভিকটিমদের পিউবিক হেয়ারেও— ইজাকুলেশন বডি ফ্লুইড আছে কিন্তু সিমেনের কোনও ট্রেস মাত্র নেই। এমনকি সারা দেহের কোথাও সিমেনের সামান্য ট্রেস নেই। আজব তো।"

ইন্দ্রাণী ছবিগুলো জুম করে দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে বলল, "হুম। যেন সেক্স করতে করতে হঠাৎই মনে হল, না আজ থাক, অনেক হয়েছে। আবার বাকিটা কাল হবে। আচ্ছা বানী, তুই তো বললি, শার্প ছুরি ব্যবহার করা হয়েছে। তা-ই না?"

শিবানী বলল, "হ্যাঁ, ফরেনসিক তা-ই বলছে।"

জেঠুমণি বলল, "চতুর্থ বডির সব পার্ট খুঁজে পাওয়া দরকার। তবে তুই বোধহয় ঠিক দিকেই এগোচ্ছিস। পরের খুনটা মঙ্গলবারেই হচ্ছে।"

ইন্দ্রাণী সোফাতে উঠে বসে সোজা হয়ে বলল, "তোরা কি জানিস, তোদের আততায়ী পার্কিনসনের মতো কোনও নার্ভের অসুখে ভুগছে?"

শিবানী ঝুঁকে পড়ে বলল, "মানে?"

"দেখ," ইন্দ্রাণী ছবিগুলোকে জুম করে দেহের কাটা অংশগুলোর উপর রাখল, "ধারালো ছুরি দিয়ে কাটা। তাই কাটা জায়গাগুলো শার্প। কোনও ঘষে ঘষে বলপ্রয়োগ করে কাটার চিহ্ন নেই। কিন্তু কাটার লাইনটা মোটেই একই রেখায় নয়— কখনও কাটতে কাটতে ভিতরের দিকে চলে গেছে অনেকটা,

boierpathshala.blogspot.com

আবার কখনও বাইরের দিকে। ছুরি ধারালো হলে সাধারণত এরকম তখনই হতে পারে যদি কাটার সময় তার হাত কাঁপতে থাকে। আর এরকম একজন ঠান্ডা মাথার খুনের হাত ভয়ে কাঁপবে না নিশ্চয়ই।"

এবার জেঠুমণি বলল, "একবার পারলে মৃণালবাবুকে ফোন করে বডির বাকি পার্টগুলো খুঁজে পেল কি না জিজ্ঞাসা কর তো? আর কোনও ফিঙ্গারপ্রিন্ট? আর কোনও প্রত্যক্ষদর্শী?"

শিবানী ফোন করে কিছুক্ষণ কথা বলে জেঠুর দিকে ফিরে বলল, "হ্যাঁ বাকি বডি পার্টগুলো পেয়েছে— যথারীতি ছিন্নমস্তক ও দেহের ঊর্ধ্বাংশ— পেট থেকে গলা অবধি। আর প্রত্যক্ষদর্শী বলতে চতুর্থ দেহখণ্ডগুলি যার বাড়ি থেকে পাওয়া গেছে— সেই নীহার চৌধুরি, আর ওঁরই পাড়ার নাইটগার্ড। দু-জনে প্রায় একই সময়ে দেখতে পান। একজন বাড়ি থেকে বের হয়েই, অন্যজন রাস্তা থেকে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট সহজ নয়। আমাদের স্কিনের উপর লিভিং বডিতেই ফিঙ্গারপ্রিন্ট সাস্টেন করে পাঁচ মিনিট। সেখানে মৃত শরীরে তো খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব।"

ইন্দ্রাণী মাথা না তুলেই জবাব দিল, "RTX"

"মানে?"

প্রখর রুদ্র উত্তর দিল, "রুথেনিয়াম ট্রেটা-অক্সাইড। হাইলি আনস্টেবল রিঅ্যাকটিভ এজেন্ট উইথ অর্গ্যানিক কম্পাউন্ডস। ঘামের অরগ্যানিক ইনসলিবেল কমপাউন্ডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে রুথেনিয়াম ডাই-অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়। যা অনেক বেশি স্টেবল আর রং গাঢ় ছাই। মূলত মৃতদেহের উপর থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডেভেলপ করতে কাজে লাগে। এবারের বডি পার্টসগুলো লালবাজার পাঠাতে বল। আই অ্যাম শিয়োর কিছু না কিছু পাওয়া যাবে। এত নৃশংসভাবে মানুষগুলোকে কেটেছে, কিছু না কিছু ফিঙ্গারপ্রিন্ট তো ভুলবশত হলেও থেকেই যাবে।"

শিবানী একবার ইন্দ্রাণীর দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকায়। তারপর মৃণালবাবুকে ফোন করে, "আই ওয়ান্ট অল দ্য বডি পার্টস অ্যাট লালবাজার নাও।"

boierpathshala.blogspot.com

* * * * * * * * *

সোমবার সকালের ব্যস্ত অফিসের ফাঁকে জেঠুমণিকে শিবানীর ফোন, "মৃণালবাবু বেশ কাজের লোক। আর অভিজ্ঞও বটে। কোনও ক্লু না পেয়ে এলোপাথাড়ি সন্দেহজনক সবার ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়েছেন ও জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। সব আপডেট দিয়েছেন। সব ভিকটিমের ফোন কল-লিস্ট বের করে আঁতিপাতি করে সব তোলপাড় করে ফেলেছেন। সবার মধ্যে একটি নম্বর কমন— নীহার চৌধুরি।"

"আচ্ছা! স্ট্রেঞ্জ! ভদ্রলোক কী বলছেন?"

"জেরার মুখে তিনি স্বীকার করেছেন। একা থাকেন। তাই আর কী বিভিন্ন এসকর্ট সার্ভিসে তাঁর চেনাজানা আছে। সেখান থেকেই তিনি মাঝে মাঝে এই সমস্ত মহিলাকে ফোন করে রাতে তাঁর বাড়ি আসতে বলে থাকেন। দ্বিতীয় মহিলাটি তাঁর অফিসের পরিচিত নিজেই বাড়িতে ডেকেছিলেন। বুঝতেই পারছো ব্যাপারটা... কী জন্য আর না-ই বা বললাম!"

"ফিঙ্গারপ্রিন্ট কী বলছে?"

"ফিঙ্গারপ্রিন্ট ম্যাচ করেছে। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। উনি স্বীকার করেছেন, ওই সব ক-টি মহিলার সঙ্গেই খুনের আগের রাতগুলিতে তিনি শারীরিকভাবে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন। তাই ওদের দেহে নীহার চৌধুরির ফিঙ্গারপ্রিন্ট থাকতেই পারে। অস্বাভাবিক কিছুই না।"

"আর প্রি-ইজাকুলেশন বডি ফ্লুইডের ব্যাপারটা?"

"ওই আবার ডেড এন্ড। উনি নিজেই স্বীকার করেছেন, ওদের সঙ্গে শারীরিকভাবে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। কারও সঙ্গে সেক্স করাটা তো আর অপরাধের মধ্যে পড়ে না। তার বেসিসে কী করে আমরা কাউকে খুনের কেস দিতে পারি? আমরা আমাদের মতো করে কড়া জেরা করে যাচ্ছি। কিন্তু উনি একই কথাই বলছেন। ওঁর মতে ওই মহিলারা তাঁর বাড়ি থেকে বের হওয়ার পরই হয়তো কেউ তাদের টার্গেট করেছিল। ওঁর মতে, কেউ ওঁকে ফাঁসাতে চেষ্টা করছে। তাই এসব।"

boierpathshala.blogspot.com

"সন্দেহের তালিকায় কারও নাম দিয়েছেন?"

"বলছেন, অনিমেষ ঘোষ। পাড়ার ক্লাবের সেক্রেটারি। কয়েকবার নাকি নীহারবাবুকে শাসিয়েছেন, 'ভদ্র পাড়ায় এসব করলে, একদম শেষ করে দেব' বলে। এক মাস আগে নাকি একবার পাড়ার কিছু ছেলেকে নিয়ে অনিমেষ ঘোষ এসেছিলেন— নীহারবাবুকে গণধোলাই দিতে। নীহারবাবু পুলিশে ডায়েরিও করেছিলেন। বারুইপুর থানার সে রিপোর্টের কপি মৃণালবাবু ফ্যাক্সও করেছিলেন। নীহারবাবু মিথ্যে বলছেন না।"

"খুনগুলো শুরুও হয়েছে সপ্তাহ তিনেক আগে থেকেই... তাহলে এখন কী করবি ভাবছিস?"

"জেরা চালিয়ে যাব। যদি শেষ পর্যন্ত কিছুই না পাই, তাহলে আর কী করব! আপাতত ছেড়ে দেওয়া ছাড়া তো উপায় নেই।"

"ঠিক আছে, যেটা ভালো বুঝিস তোরা। নতুন কিছু জানতে পারলে জানাস। আর আমি দেখি, আমার মতো করে কিছু খুঁজে পাই কি না!"

প্রখর রুদ্র ফোন রেখে ইন্দ্রাণীকে নীচে ডেকে আনল, "এই দু-জনের ব্যাপারে একটু খোঁজখবর করে আয়। নীহার চৌধুরি আর অনিমেষ ঘোষ।"

ইন্দ্রাণী বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে একবার শিবানীকে ফোন করে, "আচ্ছা, গত বৃহস্পতিবার যখন মৃণালবাবু লালবাজার এসেছিলেন তখন চতুর্থ ভিকটিমের ঠিক কী কী পাওয়া গিয়েছিল?"

ওপার থেকে শিবানীর উত্তর, "কেন? দুটো পা। লালবাজারেই তো ওঁর ফোন আসে যে উরু থেকে পেট পর্যন্ত অংশ তাঁর লোকেরা খুঁজে পেয়েছেন।"

"দুটো কাটা পায়ের ছবি দেখেছিস তুই ভালো করে?"

"হ্যাঁ। দুটো পা। কোথাও কিছু নেই আর অনাবৃত। কোনও অলংকারও নেই।"

"হুম। সেটাই ভাবছি। অথচ দুটো পা দেখেই মৃণালবাবু বলে দিলেন মহিলা মৃতদেহ। আর তখনও পোস্টমর্টেম হয়নি। এমনি সময় হলে তাও হয়তো বিশ্বাস করা যেত। কিন্তু ওরকম একটা শকের মুহূর্তে কি আদৌ সম্ভব! যা-ই হোক, তুই রাখ, আমি দেখছি।"

boierpathshala.blogspot.com

"ধুর। সে হয়তো আগের তিনজন মহিলা ছিলেন তাই..." ইন্দ্রাণী আর শিবানীর পুরো কথা না শুনেই ফোন কেটে দেয়।

* * * * * * * *

"হ্যালো... হ্যালো... শেখর? আমি দাদা কথা বলছি।"

ফোনের ওপার থেকে শেখর রুদ্র ফোন ধরেছেন— "হ্যাঁ দাদা, বল রে। একটু লেট হচ্ছে ফিরতে, তুই চিন্তা করিস না। এক ঘণ্টার মধ্যে বের হচ্ছি।"

প্রখর রুদ্র উৎকণ্ঠাভরা গলায় বলল, "সেটা নয়। ইন্দ্রাণী সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। মাঝে দুপুরে একবার ফোন করেছিল। কিন্তু এখন তো রাত আটটা বাজতে যায়। ফিরল না। ফোনটাও সুইচ অফ বলছে।"

"ও আচ্ছা। আরে আজকালকার মেয়ে। আছে বন্ধুদের সঙ্গে। হয়তো ফোনে চার্জ নেই। আর ঘণ্টাখানেক দেখি। এর মধ্যে না ফিরলে দেখছি।"

প্রখর রুদ্র ফোন রেখে শিবানীকে কল করল, "ইন্দ্রাণী এখনও বাড়ি ফেরেনি। সকালে তুই ফোন করার পর ক-টা কাজ দিয়ে বারুইপুর পাঠিয়েছিলাম। এখন ফোনটাও অফ। তোর বাবা ব্যাপারটা গুরুত্ব দিচ্ছে না। কিন্তু আমার ব্যাপারটা মোটেই ভালো লাগছে না।"

শিবানী আঁতকে উঠে জবাব দেয়, "কী বলছ কী তুমি? তুমি ওকে একা একা এরকম পাঠিয়ে দিলে? আর ও কি পাগল? ঠিক আছে, তুমি ফোন রাখো, আমি দেখছি।" শিবানী ফোন রেখেই কন্ট্রোলরুম ফোন করে, "দাসবাবু, আমি একটি ফোন নম্বর পাঠাচ্ছি। প্লিজ লাস্ট লোকেশন কোথায় তাড়াতাড়ি জানান।" শিবানী বারুইপুরের দিকে গাড়ি ছোটায়।

* * * * * * * *

এখনও ইন্দ্রাণীর মাথাটা ঝিমঝিম করছে। চোখ ঝাপসা। শুধু সে দেখতে পারছে, তার চারদিকে বৃত্তাকারে মোমবাতি জ্বলছে। সামনে ধূপ, ধুনো, গন্ধক, কর্পূর ছড়ানো। মোমবাতির আলোকবৃত্তের বাইরে একটি লোক আলখাল্লার মতো পোশাক পরে নিচু হয়ে একটা লাল মলাটের বই থেকে কিছু মন্ত্র বিড়বিড়

boierpathshala.blogspot.com

করে পড়ে যাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে উপরের দিকে দু-হাত তুলে সামনের অগ্নিকুণ্ডে ঘি ঢেলে দিচ্ছে। অন্ধকারে লোকটির মুখ দেখা না গেলেও ইন্দ্রাণী জানে সেটা কে! তাই চিৎকার করে বলতে চাইল, 'শয়তান, তোর খেলা শেষ'। কিন্তু পারল না। এতক্ষণে ইন্দ্রাণী বুঝল, তার মুখে কাপড় গুঁজে দেওয়া হয়েছে। এবার একটা ভয়ের গাঢ় গন্ধ ইন্দ্রাণীর নাক দিয়ে ফুসফুসে ঢুকে এলোপাথাড়ি চিৎকার করতে থাকল। কিন্তু তার শব্দ শুধু ইন্দ্রাণীই পাচ্ছে।

* * * * * * * *

কন্ট্রোলরুম থেকে শিবানীর ফোনে ফোন আসে। ইন্দ্রাণীর ফোন শেষ ধরা পড়েছে বারুইপুরের স্টেশন রোডের উপরে। তারপর আর পাওয়া যাচ্ছে না। শিবানী বুঝতে পারে না স্টেশন রোডের মতো এত বড় জায়গায় কোথায় ইন্দ্রাণীকে খুঁজবে! শিবানীর ফোনে হঠাৎ বিকাশের ফোন। কলেজে পড়তে বিকাশ, শিবানী, ইন্দ্রাণী, আসিফ ও মৌলিকের পাঁচজনের একটি গ্রুপ ছিল। যারা বিভিন্ন রহস্য সমাধান করে নিজেদের মধ্যে একটা সিক্রেট ফেসবুক গ্রুপে শেয়ার করত। এটা অনেকটা তাদের কাছে একটা গেমের মতো ছিল। কে কতটা কাউকে দেখেই তথ্য সংগ্রহ করে ফেলতে পারত তার খেলা। কিন্তু সেসব পাঁচ বছর আগের কথা।

তাই এই টেনশনের মুহূর্তে শিবানী ফোনটা কেটে দেয়। বিকাশ আবার ফোন করে। এবার শিবানী অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধরার সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ বলে ওঠে, "ইন্দ্রাণী কোথায়?"

"মানে? তুই কিছু জানিস নাকি? ইন্দ্রাকে সন্ধে থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"আমি এই ভয়টাই করছিলাম। কলেজে থাকতেও ডাকাবুকো স্বভাবের ছিল। এখনও বদলাল না। আমাদের সিক্রেট ফেসবুক গ্রুপে ও ছ-টার দিকে লাইভ এসেছিল। একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছিল। মনে হচ্ছিল, ও লুকিয়ে লোকটার জবানবন্দি রেকর্ড করছিল। আমি অফিস থেকে ফিরে জাস্ট দেখে হাড় হিম হয়ে গেল। তুইও তাড়াতাড়ি দেখ। কোনও বড় বিপদ হওয়ার

boierpathshala.blogspot.com

আগেই ওকে খুঁজে বের কর। জায়গাটার এক কিমি রেডিয়াসে একটা মন্দির আর মসজিদ দুটোই আছে। ইশার আজান আর মন্দিরের সন্ধ্যারতির ঘণ্টার শব্দ দুটোই ভিডিয়োতে ভীষণই হালকা হলেও পাওয়া যাচ্ছিল।"

"তোকে অনেক থ্যাঙ্কস রে। বাকিটা আমি দেখছি।"

শিবানী মৃণালবাবুকে ফোন করে, "প্লিজ তাড়াতাড়ি স্টেশন রোড আসুন। আমার বোন ওই শয়তানটার খপ্পরে পড়েছে। আমি দশ মিনিটে বারুইপুর ঢুকছি।"

* * * * * * * *

অন্ধকারে লোকটা মন্ত্র পড়া শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে, "হে মা, আমায় শক্তি দে।" নিজের কালো আলখাল্লাটা একটা টানে খুলে দিয়ে নগ্ন শরীরে হাতে একটা লম্বা ধারালো ছুরি নিয়ে ইন্দ্রাণীর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। ইন্দ্রাণী ভয়ে গোঙাতে থাকে। ছটফটিয়ে ওঠে কিন্তু তার হাত-পা সব বাঁধা। লোকটা ইন্দ্রাণীর কানের কাছে এসে হিসহিসে গলায় বলতে থাকে, "তুমি অনেক জেনে গিয়েছিলে, মামণি। তোমার মাধ্যমেই আমি এবার শক্তি পাব।"

ধারালো ছুরির ফলা দিয়ে একটানে ইন্দ্রাণীর সালোয়ার কেটে দু-টুকরো করে ফেলে লোকটি। অন্য হাত দিয়ে কর্পূর, গন্ধক আর হলুদ-মেশানো চূর্ণ ইন্দ্রাণীর উন্মুক্ত ঊর্ধ্বাঙ্গে ঘষে দিতে থাকে। কর্পূর আর গন্ধকের গাঢ় গন্ধে ইন্দ্রাণীর দম বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। ভয়ে আর ঘৃণায় সে কঁকিয়ে ওঠে। লোকটি এবার ইন্দ্রাণীর ঊর্ধ্বাঙ্গের অন্তর্বাসের স্ট্র্যাপের উপর ধারালো ছুরিটা রেখে কাটতে উদ্যত হয়। ইন্দ্রাণী ভয়ে ছটফটিয়ে চেঁচাতে চেষ্টা করে। লোকটা খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে, ইন্দ্রাণীর ঘাড়ের কাছে লম্বা জিভ দিয়ে সাপের মতো চেটে দেয়। ইন্দ্রাণী নিজের হাত-পাগুলো টেনে ছাড়ানোর চেষ্টা করে। লোকটা স্ট্র্যাপের উপর ধীরে ধীরে ছুরিটা ঘষতে থাকে। ইন্দ্রাণীর চোখ জলে ঝাপসা হয়ে আসে— এক মুহূর্তে বাড়ির সবার কথা মনে হতে থাকে।

"তোমার খেলা শেষ, শয়তান," এরপরই গুড়ুম করে একটা গুলির

boierpathshala.blogspot.com

আওয়াজ। ইন্দ্রাণী চোখ খুলে তাকিয়ে দেখে, শিবানী দরজা ভেঙে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পিছনে উলঙ্গ দেহে লোকটা পড়ে আছে। কাঁধে গুলির ক্ষত থেকে রক্ত পড়ছে। শিবানী ছুটে এসে মেঝেতে পড়ে-থাকা কালো আলখাল্লাটা নিয়ে ইন্দ্রাণীকে জড়িয়ে ধরে। মৃণালবাবু ও তাঁর কনস্টেবলরা ঘরে ঢুকে লোকটাকে পাকড়াও করে ফেলে। লোকটা রাগে ফুঁসতে থাকে। শিবানী ইন্দ্রাণীর বাঁধন খুলে দেয়। ইন্দ্রাণী শিবানীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। শিবানীর চোখেও জল চলে আসে। তা-ও সামলে নিয়ে বলে, "গুড জব, ইন্দ্রা। শয়তানটার ফাঁসি যাতে হয়, আমি দেখব। এখন বাড়ি চল, সবাই চিন্তা করছে।"

ইন্দ্রাণী এবার কিছুটা ধাতস্থ হয়ে নিজের দিকে ইশারা করে বলে, "কিন্তু এই অবস্থায় গেলে বাবা আমাকে মেরেই ফেলবে। আর জেঠুকেই এসবের জন্য দায়ী করবে।"

"ও.কে.। দাঁড়া, আমি দেখছি," শিবানী বাইরে থেকে মৃণালবাবুকে ডেকে পাঠায়, "মৃণালবাবু, বলছি, আপনি তো একাই থাকেন। আপনার বাড়ির বাথরুমটা যদি একটু ব্যবহার করা যেত। মানে ইন্দ্রার যা অবস্থা..."

"আরে নিশ্চয়। এতে বলার কী আছে! আসুন। আর আমি একটা কনস্টেবলকে পাঠিয়ে এক্ষুনি পাশের কোনও দোকান থেকে ওর একটা পোশাকের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

"থ্যাঙ্ক ইউ, মৃণালবাবু। আর-একটা অনুরোধ। আপনারা ভিডিয়ো এভিডেন্স তো পেয়েই গেছেন। আততায়ীর জবানবন্দি। আমার মনে হয়, কোর্টে আপনাদের শাস্তি নিশ্চিত করতে আর কোনও অসুবিধা হবে না। শুধু একটা অনুরোধ, বোনের এই ব্যাপারটা যদি লালবাজার পর্যন্ত না পৌঁছোয় তাহলে কৃতজ্ঞ থাকব।"

"ও.কে.। তা-ই হবে, শিবানী। তোমরা দুই বোনই খুব সাহসী। তোমরা সুস্থ থাকো।"

* * * * * * *

boierpathshala.blogspot.com

রাত সাড়ে দশটা। শিবানীর সাদা স্কোরপিওটায় দুই বোন সামনে উঠে পড়ে। মৃণালবাবুর বাড়ির থেকে ভালো করে স্নান করে, নতুন পোশাক পরে ইন্দ্রাণী গাড়ির সামনে ভয়ে কুঁকড়ে বসে রয়েছে। শিবানী চুপচাপ স্টিয়ারিং হাতে বাড়ির দিকে গাড়ি ছোটায়। ইন্দ্রাণী অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে, "বিনা লাইসেন্সে গাড়ি চালালে বাবা বকবে।"

শিবানী কিছু না বলে, পকেট থেকে তার সদ্য পাওয়া লাইসেন্সটা ইন্দ্রাণীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, "আর আপনি বিনা লাইসেন্সে যেটি করলেন, সেটা নিয়ে কিছু বলবেন কি?"

"পারফেক্ট ক্রাইম ছিল। লোকটার নিজের জবানবন্দি ছাড়া কোনও প্রমাণই লোকটার বিরুদ্ধে কোর্টে ওর অপরাধ প্রমাণ করতে পারত না। ছাড়া পেয়েই যেত। তোদের এত চেষ্টাতেও মুখ খুলেছিল কি? তাই ওকে ধরতে কাউকে না কাউকে টোপ হতেই হত।"

"তা বলে নিজেকে? তুই কি পাগল?

"না, আসলে অসতর্ক হয়ে পড়েছিলাম। এসেছিলাম শুধু জিজ্ঞাসাবাদটুকুই করতে। কিন্তু সেটাই যে জবানবন্দি হয়ে যাবে, বুঝতে পারিনি। যখন বুঝলাম তখনই বিপদ বুঝেই আমাদের পুরোনো গ্রুপে ফেসবুক লাইভ চালিয়ে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, তুই নিশ্চয়ই ভিডিয়োটা দেখেই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়বি।"

শিবানী ইন্দ্রাণীর হাতটা চেপে ধরে, "সরি রে, এতটাই বিজি ছিলাম যে ফেসবুক দেখা হয়নি। সত্যি গুড জব। তোকে চিন্তা করতে হবে না। বাড়িতে সামলে নিয়েছি। বলেছি, তুই শপিং-এ গিয়েছিলি। ফোনে চার্জ ছিল না। তুই তোর বন্ধুর ফোন থেকে আমায় ফোন করেছিলি। আমরা একসঙ্গে ফিরছি।"

"হুম। থ্যাঙ্ক ইউ। ভিডিয়োটা কি তুই পুরোটা দেখেছিলি?"

"না রে, পুরোটা দেখার মতো তখন সময় ছিল না।"

ইন্দ্রাণী আর কিছু না বলে শিবানীর ফোনটা খুলে ফেসবুক গ্রুপ থেকে ভিডিয়োটা চালিয়ে গাড়ির সামনে রাখে। ভিডিয়োটা চলতে থাকে। লুকিয়ে হাতে ধরা ফোন-ক্যামেরার ওপারের মুখটি শিবানীর চেনা— নীহার চৌধুরি।

boierpathshala.blogspot.com

ভিডিয়ো কথোপকথন শুনতে শুনতে শিবানী গাড়ি চালাতে থাকে।

* * * * * * *

ভিডিয়োর এপারের মহিলা কণ্ঠের প্রথম প্রশ্ন, "আপনাকে আবার করে এসে এসব প্রশ্ন করার জন্য খুব দুঃখিত। কিন্তু আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আমার ক্লায়েন্ট গত সপ্তাহে খুন হয়েছেন। পুলিশের সন্দেহ আপনার দিকে, তাই কিছু প্রশ্ন করতে চাই।"

নীহার চৌধুরি শান্ত চোখে বলেন, "করুন।"

"আপনার জেনোফোবিয়া আছে তো?"

নীহার চৌধুরি একটু থতমত খেয়ে বললেন, "না... না... আপনাকে কে বলল?"

"মিথ্যা বলে লাভ নেই। আপনি তিন মাস যে মনোবিদের কাছে সেশনের জন্য যেতেন, তার সব রিপোর্ট আছে। সেই ডাক্তারও বলেছেন, জেনোফোবিয়ার কারণে আপনি মানসিকভাবেই ভেঙে পড়ছিলেন। একই কারণে আপনার বিয়ে টেকেনি। চিকিৎসাটা বন্ধ না করলেই পারতেন।"

"সেসব আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনি নাক না গলালেই ভালো লাগবে। কোন বেশ্যাটা আপনার ক্লায়েন্ট?"

"সেটা বলতে আমি বাধ্য নই।"

"তাহলে আমিও আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই..."

"সেক্ষেত্রে আমার সমস্ত প্রমাণ পুলিশকেই দিয়ে দিতে বাধ্য হব। তারা তাদের মতো করেই বাকি কথা আপনার থেকে জেনে নেবে। সেটা বোধহয় খুব একটা সুখকর হবে না। এমনিতেই পুলিশ আপনাকে সন্দেহ করছে। তারপর আমার সংগ্রহ করা প্রমাণগুলি পেলে বোধহয় ব্যাপারটা শুধুমাত্র জিজ্ঞাসাবাদে সীমাবদ্ধ থাকবে না।"

"কী প্রমাণ? একটু শুনি?"

"আজ সকালে মৃণালবাবুকে জিজ্ঞাসা করি, গত বৃহস্পতিবার সকালে আপনার এখান থেকে শুধু দুটি পা দেখেই কী করে নিশ্চিত হলেন ওটা

boierpathshala.blogspot.com

কোনও মহিলার? পায়ে কোনও গয়না নেই, নেলপালিশ নেই। অনেক ভেবে বললেন, কনস্টেবল সুদীপ তা-ই বলেছিল। আমি সুদীপকেও একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। তার উত্তর ছিল, ফোনে আপনি তাকে বলেছিলেন। এবার আপনি বলবেন কি আপনি কী করে জানলেন?

নীহারবাবুকে একটু অপ্রস্তুত দেখায়— "না মানে, মহিলাই হবে..."

ইন্দ্রাণীর কণ্ঠ আবার শোনা যায়, "আমি বলি। আপনিই এই চারজনকে খুন করলেন। প্রথম তিনটে ঠিকই ছিল। চতুর্থ খুনটা করে ভোরে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময়ই বাধল বিপত্তি। পাড়ার তিন-চারটি কুকুর আপনাকে ঘিরে ধরে এমন শোরগোল বাধাল, যে নাইটগার্ড ছুটে এল। আমার কষ্টকল্পনা নয়। ওই গার্ডটি নিজেই বলেছে, একঝাঁক কুকুরের ডাক শুনেই সে আপনার বাড়ির দিকে ছুটে এসেছিল। অবস্থা বেগতিক বুঝে আপনি নিজেই পুলিশে ফোন করলেন। কিন্তু এটা যেহেতু আপনার প্ল্যানে ছিল না, তাই উত্তেজনায় একটা ভুল করে বসলেন। ওটা না হলে বোধহয় আমিও এতটা শিয়োর হতে পারতাম না।

"হা... হা... সবই ঠিক কিন্তু কোর্টে কীভাবে প্রমাণ করবে? কেউ আমাকে মারতে দেখেনি। আর আমি নিজেই স্বীকার করেছি, ওই মহিলাদের সঙ্গে আমার শারীরিক সম্পর্ক ছিল। তা-ই ফিঙ্গারপ্রিন্ট থেকে শুরু করে বডি ফ্লুইড কোনও কিছুই আর ভ্যালিড থাকে না।"

"কিন্তু বোধহয় এখনও কেউ একটা জিনিস খেয়াল করেনি, তা-ই আপনাকে ধরতে পারেনি।"

"কী?"

"ওই যে আপনার জেনোফোবিয়া! যে কারণে আপনি একটিও শারীরিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ করতে পারেননি। যে কারণে ওই মহিলাদের ভ্যাজাইনাতে শুধু আপনার প্রি-ইজাকুলেশন ফ্লুইডই পাওয়া গেছে, কিন্তু সিমেন না। আর আপনার হাতের কম্পন। প্রথমে ভেবেছিলাম পার্কিনসন ডিজিজ। তবে আপনাকে এখন দেখে বুঝছি আপনারটা পার্কিনসন নয়। আপনি উত্তেজিত হয়ে পড়লে তবেই আপনার হাত কাঁপতে থাকে। আমি যখন এসেছিলাম,

boierpathshala.blogspot.com

আপনি স্বাভাবিক ছিলেন। এখন আপনার হাতে কম্পন শুরু হয়েছে। রেয়ার নার্ভ ডিসঅর্ডার। তবে আপনার ফোন কলটা সত্যিই মাস্টারস্ট্রোক ছিল। নিজের ফোন থেকেই সবাইকে ফোন করেছিলেন এবং সেটা স্বীকারও করে নিলেন। যেন আর পাঁচটা লোকের মতোই শারীরিক খিদে মেটাতেই ফোন করেছিলেন। পারফেক্ট। প্রমাণ থেকেও নেই।"

নীহার চৌধুরি হেসে উঠলেন, "হা... হা... হা। ওই আইডিয়াটার জন্যই যে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করেছি।"

"মানে?"

"তারাপীঠের শ্মশান তান্ত্রিকবাবা বলেছিলেন, আমার জেনোফোবিয়ার একমাত্র উপায় হল সেক্সুয়ালি যারা খুব অ্যাকটিভ তাদের সঙ্গে কোনও প্রোটেকশন ছাড়াই শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা, তারপর তাদের বিধিমতে বলি চড়ানো। শারীরিকভাবে ঘনিষ্ঠ হলে আমার সিমেন মহিলা শরীরে থাকবে, আমি বুঝেই গিয়েছিলাম। শুধু বুঝছিলাম না, কী করে পুলিশকে ধোঁকা দেওয়া যাবে। না হলে, আজ না হোক কাল পুলিশ আমার কাছে পৌঁছোবেই। তখনই একদিন পেপারে বিজ্ঞাপন দেখলাম—'ডার্ক হর্স, কনসালটেন্ট ক্রিমিনাল। যেকোনো অপরাধকে পারফেক্ট ক্রাইমে রূপ দিতে সিদ্ধহস্ত। চটজলদি সমাধান। আপনার পরিচয় থাকবে গোপন।' সঙ্গে একটি মেল আই.ডি.। আমার সমস্যা মেল করলাম। দু-দিনের মধ্যে সমাধান এল। সঙ্গে পঞ্চাশ হাজারে রফা হল।"

ইন্দ্রাণীর কেমন যেন জড়ানো কণ্ঠস্বর ক্যামেরার পিছন থেকে শোনা গেল, "আর কতজনকে খুন করবেন আপনি! আপনার দেহখণ্ডের সংখ্যা তো ফিবোনোচি সিরিজে বাড়ছে।"

"ওসব ফিনোচি-ফিচি বুঝি না। গুরুদেব বলেছিলেন, প্রথমটা একখণ্ড, পরেরটা দুই, তারপর তিন, তারপর পাঁচ, তারপর আট... ক-টা খুন করতে হবে জানি না। গুরুদেব বলেছেন, যতদিন না আমি শক্তি পাব ততদিন। তুমি কি জানো, মামণি, আমি এত কিছু তোমায় কেন বলছি?

ইন্দ্রাণীর জড়ানো গলা শোনা যায়— "কে... কেন?"

boierpathshala.blogspot.com

"গুরুদেব বলেছিলেন, যখনই এই দেহখণ্ডের সিরিজে কোনও জোড় সংখ্যা আসবে, তখন আমাকে একটি কুমারী মেয়ে বলি দিতে হবে। আর আজ রাতে তোমার বলি চড়বে, মামণি! তুমি আসতেই যে জলটা খেয়েছ ওটায় ঘুমের ওষুধ ছিল। আজই তোমার শেষদিন।"

ফোনটা ইন্দ্রাণীর হাত আলগা হয়ে মেঝেতে পড়ে যায়। নীহারবাবু উঠে এসে ফোনটা তুলে নিয়ে, আছাড় মেরে ভেঙে ফেলেন।

* * * * * * * *

রুদ্র পরিবারের রাতের খাওয়ার টেবিলে যথারীতি সবাই একসঙ্গে খেতে বসে। শিবানী এ কথা, সে কথা করে ইন্দ্রাণীকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে। বাবা-মা কিংবা জেঠু জেনে গেলে ইন্দ্রাণীকে অনেক বকা শুনতে হবে! আর বাবা জেঠুর উপরেও রাগারাগি করবে। তার এই ব্যাপারটা কারও না-জানাই ভালো। ইন্দ্রাণী চুপচাপ খেতে থাকে। হঠাৎই হোয়াটসঅ্যাপে একটা মেসেজ আসে। ফোনটা অন করতেই দেখে, ওয়ান মেসেজ ফ্রম জেঠুমণি। ইন্দ্রাণী প্রখর রুদ্রর দিকে তাকাতেই তিনি নিজের মোবাইলটা প্লেটের পাশে রেখে ইন্দ্রাণীকে মেসেজটা দেখার ইশারা করলেন।

ইন্দ্রাণী খুলে দেখল— "গুড জব। ওয়েল ডান। প্রাউড অফ ইউ। কিন্তু পরের বার থেকে সাবধান হতে হবে। সব বার দৈবাৎ শিবানী যাবে না! তোর নখের নীচের হলুদের কণাগুলো রয়ে গেছে, আর গায়ের কর্পূর আর গন্ধকের গন্ধটা এখনও হালকা হলেও আছে। বি কেয়ারফুল।"

ইন্দ্রাণী রিপ্লাই দিল, "শিবানী দৈবাৎ যায়নি। ওর জন্য ট্রেস ছেড়ে দিয়েছিলাম। ও-ই দেখতে দেরি করেছে।"

পিছন থেকে মা, কুন্তলাদেবী চেঁচিয়ে উঠলেন, "সারাক্ষণ শুধু ফোন আর ফোন। খাওয়ার সময়টা একটু বাদ দে-না।" ইন্দ্রাণী আর কিছু না বলে চুপচাপ খেতে থাকে।

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

যন্ত্র মন্ত্র তন্ত্র

ঘুটঘুটে অন্ধকার— বাইরে প্রায় কিছুই দেখা যায় না। অন্ধকারে কিছু গাছ আর ঝোপঝাড় নিজেদের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে যেন কীসের ষড়যন্ত্র করে চলেছে! মাঝে মাঝে প্যাঁচার একটা কর্কশ ডাক শোনা যাচ্ছে। একটা ছোট ইটের দেওয়ালের দুই কামরার ঘরের ভিতরে কারা যেন নিচু স্বরে কথা বলছে। ইটের গাঁথুনির গা বেয়ে দীর্ঘদিনের পুরোনো শ্যাওলার উপর একটা টিকটিকি নিঃশব্দে ওত পেতে বসে আছে— পরের শিকারের অপেক্ষায়। দূরের শ্মশানে ধিক ধিক করে জ্বলতে-থাকা আগুনের হালকা রেখা এখান থেকে দেখা যায়।

বাড়ির সামনে অনেকটা খোলা জায়গায় একটা কুকুর ঘুরতে ঘুরতে কান খাড়া করে দেয়। ঘরের মধ্যে নিচু স্বরে কেউ বলে ওঠে, "বাবা, আপনি সব দেখতে পান? মানে স...অ...ব?"

"জানি রে জানি। তোদের মতো অর্বাচীন এসব কথা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমি বর্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ সব দেখতে পাই। তুই কী জানতে চাস বল?"

"আমরা আর কী জানতে চাইব! আমরা আপনার পদতলে থাকতে চাই। আমরাও কি আপনার মতো জ্ঞান লাভ করতে পারব?"

"সে কি অত সহজ রে বেটা। তার জন্য শবসাধনা করতে হবে। সে বড় কঠিন সাধনা। জীবনে যা নিশ্চিত তার জ্ঞান যদি হয়ে যায়, দেখবি, বিশ্বের সব গূঢ় রহস্য তোর কাছে ধরা দিয়েছে।"

"বাবা, জীবনে কী নিশ্চিত?"

"মৃত্যু। তাকে যদি তোরা দেখতে পাস তাহলেই সব জানা হয়ে যাবে!"

"মৃত্যু? আপনি কি বাবা তার মানে নিজের মৃত্যু দেখতে পান?"

"হাঁ রে বেটা। দেখতে পাই বটে। আমার আর বেশি দিন নেই।"

"সে কী বলছেন বাবা! আপনি আমাদের ছেড়ে গেলে আমরা কী করব?"

"চিন্তা করিস না। আমি যাওয়ার আগে তোদের সব শিখিয়ে যাব। এখন তোরা আয়।"

* * * * * * * *

ক-দিন ধরে ইন্দ্রাণী বেশ কুঁকড়ে আছে। বারুইপুরের কেসটার কথা ভাবলেই এখনও শিউরে উঠছে। সব দেখে জেঠুমণি শিবানীকে ক-দিনের ছুটি নিয়ে একসঙ্গে ঘুরতে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন। শিবানীও ভেবে দেখল, ক-দিনের জন্য বাইরে গেলে ইন্দ্রাণীর মুড চেঞ্জ হবে। তাই জেঠুমণি আর দুই বোন তারাপীঠের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে। প্রখর রুদ্র নিজে নাস্তিক ঠিকই কিন্তু তীর্থস্থানগুলোতে যাওয়াতে তার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। তার মতে, এইরকম ধর্মস্থলগুলিতে গড়ে-ওঠা সব মন্দির, মসজিদ বা গির্জার গায়ে নিজস্ব শিল্পকলা থাকে। সেগুলো অবাক হয়ে দেখতে হয় আর ভাবতে হয়, মানুষের ধর্মবিশ্বাস থেকে এই শিল্পসত্তাটুকু সরিয়ে নিলে আর কিছুই পড়ে না!

শনিবার সকালে তিনজন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। দুপুরের দিকে পৌঁছে, শিবানীরা বামাক্ষ্যাপা মন্দিরের পাশেই হাঁটা-পথে হাফ কিমি দূরে একটা লজে ওঠে। দুটো ঘর– একটাতে দুই বোন থেকে যায়, অন্যটায় জেঠুমণি প্রখর রুদ্র। সেদিনই লজে জিনিসপত্র রেখে মন্দিরটা ঘুরে আসে ওরা। দুই বোন মন্দিরের মধ্যে গেলেও প্রখর রুদ্র অবশ্য চারপাশটাই ঘুরে দেখছিলেন।

পরের দিন ভোরে উঠে ৭টার মধ্যে ব্রেকফাস্ট করে নিয়ে তিনজন একসঙ্গে চারপাশটা হাঁটতে বের হয়। ইন্দ্রাণী আগের থেকে ভালো বোধ করলেও কথা এখনও কমই বলছে। প্রখর রুদ্র ও শিবানী লজের নীচে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রাণীর জন্য অপেক্ষা করছিল। নভেম্বরের সকাল। এখানে আস্তে আস্তে ভালোই ঠান্ডা পড়ছে, তাই ইন্দ্রাণী সবার জন্য হালকা চাদর আনতে গেছে। এর মধ্যেই শিবানী একটি লোককে দেখে থমকে দাঁড়ায়, "আরে, প্রতীকবাবু। এখানে?"

লোকটিও হাসিমুখে এগিয়ে আসে, "আরে শিবানী ম্যাডাম, আপনি

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

এখানে?"

"হ্যাঁ মানে ওই, ছুটি কাটানো। জেঠু আর বোনকে নিয়ে এসেছি।"

"ছুটি কাটাতে এরকম জায়গায়?"

"বোঝেনই তো, পুলিশের চাকরিতে সারাদিন চোর-ডাকাতের পিছনে ছুটেই দিন কাটে আমার। তাই পাপক্ষালন করতে আর কী..." শিবানী হো হো করে হাসতে থাকে।

প্রতীকও হেসে উত্তর দেয়, "কী যে বলেন আপনি! আপনারা তো বরং পাপ কম করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।"

"তবে সত্যি আপনার গাড়িটি সেদিন না পেলে কিন্তু ডিসেরগড় কেসটার হয়তো সমাধানই হত না। আপনার কাছে চিরঋণী থেকে যাব!"

"বলছেন? আপনার ঋণ মকুব হতে পারে, যদি আপনি চান।"

শিবানী একটু লাজুক হেসে বলে, "কীভাবে?"

"দেখুন, এখানে ভালো কফি শপ তো নেই। তবে মোড়ের মাথায় একটা কচুরির দোকান আছে। আপনি চাইলে সান্ধ্য জলযোগটা আমরা ওখানেই করতে পারি। গরম গরম জিলিপিও থাকে বিকেলের দিকটা।" প্রতীক একটু এগিয়ে এসে শিবানী চোখের দিকে তাকায়। শিবানী চোখ নামিয়ে নেয়।

ইন্দ্রাণী নীচে এসে দাঁড়াতেই প্রখর রুদ্র একটু সরস কণ্ঠে বলে ওঠে, "তা সন্ধ্যে জলযোগে আমরা সবাই কি নিমন্ত্রিত, নাকি শুধু আমার বড়ভাইঝিটি?"

প্রতীক এতক্ষণে প্রখর রুদ্র ও ইন্দ্রাণীকে দেখে থতমত খেয়ে গেল, "ও... না... মানে... ও আপনারা যমজ বোন! হ্যাঁ, সবাই আসবেন। আমি আসি এখন।" প্রতীক তাড়াতাড়ি উলটো মুখে হাঁটা লাগায়।

প্রখর রুদ্র শিবানীকে হেসে বলে, "তোমার নতুন বন্ধুটির আমাদের সঙ্গ ঠিক পছন্দ হয়নি মনে হচ্ছে। সুন্দরী মহিলার সঙ্গে কি আর বুড়ো দারোয়ান কেউ পছন্দ করে!... হা...হা...হা।" ইন্দ্রাণীও এবার খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

শিবানী লাজুক ভঙ্গিতে উত্তর দেয়, "ধুস, এরকম কিছুই না। ভদ্রলোক ডিসেরগড়ের কেসটাতে খুব সাহায্য করেছিলেন তাই। হয়তো আবার কোনও ওষুধের কোম্পানির মাল নিতে এসেছিলেন।"

boierpathshala.blogspot.com

"সে তো ঠিকই। সুন্দরী মহিলা, তায় পুলিশ। সাহায্য না করে উপায় কী! আর আমাদের বাড়িতে তো কোনও ডাক্তার নেই। তাই একটা হাফ ডাক্তারই বা কম কীসে!"

শিবানী এবার কপট রাগের ভঙ্গি করে বলল, "উফফ জেঠু, তোমরা পারোও বটে। চলো, আমরা বরং ঘুরে আসি। কী বলিস ইন্দ্রাণী।"

ইন্দ্রাণী অন্যমনস্কভাবে বলে উঠল, "বারো হাত কাঁকুড়ের... তেরো হাত বিচি। ও হ্যাঁ, চল চল।"

তিনজনে চারিদিকটা ঘুরতে ঘুরতে মহাশ্মশানের কাছাকাছি একটা ভিড় দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে। শ্মাশানের কাছাকাছি জনবসতি ক্রমশ হালকা হয়ে আসে। সেখানে ফাঁকা জায়গায় সরু রাস্তার পাশে পুরোনো ইটের গাঁথুনি-দেওয়া একটা বাড়ি। উপরে ছাদ নেই— অ্যাসবেস্টাসের ছাউনি দেওয়া। বাড়ির সামনে গলায় লাল উত্তরীয় ও লাল খাটো কটিবস্ত্র পরিহিত লম্বা চুল-দাড়ির তান্ত্রিক গোছের লোকজনদের ভিড়, সঙ্গে আশপাশের কিছু দোকানদার আর পুলিশ। পুলিশ দেখে শিবানী একটু এগিয়ে গিয়ে একটি কনস্টেবলকে জিজ্ঞাসা করে, "কী হয়েছে, দাদা?" কনস্টেবলটি আপাদমস্তক দেখে বলে, "ঘুরতে এসেছেন, ঘুরুন-না দিদি। কেন এসবে জড়াচ্ছেন। একটা তান্ত্রিক আত্মহত্যা করেছে। এখানে দাঁড়ালে আপনাকেও জেরার মুখে পড়তে হবে। তার থেকে বরং যান।"

শিবানী স্মিত হেসে বাড়িটির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। কনস্টেবলটি এবার রে রে করে তেড়ে যেতে থাকে, "আরে দিদি, আপনাকে বললাম-না! এখান থেকে যান। বেকার আমাদের কাজে ঝামেলা করছেন।"

"আজ্ঞে, আমি লালবাজারে ক্রাইম ডিপার্টমেন্টের ইনস্পেকটর। দেখি আপনাদের কোনও সাহায্য করতে পারি কি না," শিবানী মোবাইল থেকে নিজের আইকার্ডের একটা ছবি দেখাল। এবার কনস্টেবলটি একটা স্যালুট ঠুকে বলল, "আসুন ম্যাডাম এদিকে।"

প্রখর রুদ্র নিচু গলায় ইন্দ্রাণীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভাঙে, বুঝলি? তোর দিদিও তা-ই।" ইন্দ্রাণী মুখ ব্যাজার করে

boierpathshala.blogspot.com

বলল, "ঘুরতে এসে আমার এসব ভালো লাগে না। কী যে করে!"

তিনজন কনস্টেবলটিকে অনুসরণ করে সামনের ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকল। ঢুকতেই একটা ছোট বসার ঘরের মতো— সেখানে তিন-চারটে বসার টুল আছে। সব ক-টাতেই টকটকে লাল রং করা। চুন-খসা দেওয়ালের চারদিকে পুরোনো বছরের ধুলো-জড়ানো ক্যালেন্ডারগুলো তখনও ঝুলছে—সব ক-টাতেই হয় মা কালী, না হয় মা তারার ছবি। ঘরের অন্যধারে মেঝেতে একটা ছোট গ্যাস আভেন আর কিছু বাসনকোশন। ভিতরের ঘরটা একটু বড়— মেঝের একধারে মাটিতেই একটা মাদুর পাতা। ঘরের অন্য কোনায় একটা কুঁজো মেঝেতে নামানো আর একটা টুল ঘরের মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। আর তান্ত্রিকবাবা তাঁর নিজেরই উত্তরীয়ের ফাঁস গলায় জড়িয়ে পাখার থেকে ঝুলছেন।

ভিতরে থাকা পুলিশ অফিসারটি শিবানীদের দেখে খেপে গেলেন। কনস্টেবলটির দিকে ফিরে বললেন, "এ কী কানাই? এরা কারা? এদের নিয়ে ভিতরে চলে এলে?" কনস্টেবল কানাই এবার ভীত স্বরে বলল, "আজ্ঞে, এই দিদি লালবাজারের ক্রাইম বিভাগ। দেখতে চাইলেন!" অফিসারটি আরও খেপে উঠলেন, "কেন? কেস কি লালবাজারে গেছে এখনও? যেখানে পারবেন এঁরা সেখানেই নাক গলাবেন নাকি? আমরা কি আমাদের কাজটা পারি না?"

প্রখর রুদ্র একটু ঠান্ডা গলায় বলল, "আহা, আপনি ওভাবে ভাবছেন কেন? আপনার কেস আপনারই থাকবে। আমরা তো শীতের ছুটি কাটাতে এসেছিলাম। রাস্তায় এরকম দেখে মনে হল একবার দেখি যদি হেল্প করতে পারি! বুঝতে পারছি, আপনার ব্রেকফাস্টটাও ঠিকমতো হয়নি। কিন্তু মাথা গরম করে আর কী করবেন বলুন।"

অফিসারটি এবার হতচকিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "মানে? আপনি কে? কী করে জানলেন?"

"আমার নাম প্রখর রুদ্র। আপনার প্যান্টের একটি বেল্টলুপ আপনি ছাড়িয়েছেন, দেখার সময় হয়নি। পিছনের দিকে ইউনিফর্মটাও ঠিকঠাক গোঁজা

boierpathshala.blogspot.com

নেই। আমার বাড়িতে দু-জন পুলিশ আছেন। তাই ভালোভাবেই তাঁদের স্বভাব আমি জানি। আর কিছু হোক আর না হোক, তাঁরা ইউনিফর্মটা খুব যত্ন করে নিখুঁতভাবে পরেন। সব পুলিশই তা-ই করার চেষ্টা করেন, এক তাড়ায় না থাকলে। গলায় জড়ানো মাফলারে হালকা পাউরুটির গুঁড়ো এখনও লেগে আর একটু ডানদিকে বোধহয় সকালের পাইন্যাপেল ফ্লেভার জেলি। মানে আজ ব্রেকফাস্টটা আর বসে করার সময় হয়নি। সেটা বোধহয় এই কেসের জন্যই।"

অফিসারটি মাফলার খুলে ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, "আপনি তো মশাই মারাত্মক! আপনি কি প্রাইভেট ডিটেকটিভ?"

"আজ্ঞে না। আমি কনসালটেন্ট ডিটেকটিভ।"

"মানে?"

"মানে বুড়ো বয়সে কচি সাজার ইচ্ছে... হা...হা...হা... ওই আজকালকার ছেলে-মেয়েরা করে যে ফ্রিল্যান্সিং। আমিও তা-ই। সবাই তাদের সমস্যা কনসাল্ট করতে আসে, আমি পরামর্শ দিই। বুড়ো বয়সে আর কি প্রাইভেট ডিটেকটিভদের মতো ছোটাছুটি মানায়? কোনও প্রোজেক্ট, মানে আর কী কোনও কেসে দরকার হলে ছোটাছুটি করার লোক হায়ার করি... বিনি পয়সায়।" বলে প্রখর রুদ্র হাসতে থাকলেন।

"মানে?"

"মানে, আমার ছোটভাইঝি ইন্দ্রাণী।"

এবার অফিসারটি একটু নরম হয়ে বললেন, "আচ্ছা আচ্ছা। আমার নাম দিব্যেন্দু। সকাল সকাল কী ফ্যাসাদ দেখুন দেখি। আজ ডোমটাও ছুটিতে। পাশের শ্মশান থেকে একজন ডোম খুঁজতে লোক পাঠিয়েছি। দেখা যাক কতক্ষণে এসে পৌঁছোয়! আপনারা প্লিজ কিছুতে হাত না দিয়ে দেখবেন। আর প্রখরবাবু, যদি কিছু আলোকপাত করতে পারেন, খুব ভালো হয়।"

প্রখর রুদ্র একটু চোখ ছোট করে বলল, "আপনার কী মনে হয়?"

"দেখুন, চারদিকে দেখে যা বুঝছি, ঘরে ফোর্স এন্ট্রির কোনও চিহ্ন নেই। বডি উপর থেকে ঝুলছে। আর পায়ের নীচে টুলটা গড়াগড়ি খাচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছেন। ঘরে এখনও কোনও তৃতীয় ব্যক্তির ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাইনি। সব দেখে

boierpathshala.blogspot.com

তো মনে হচ্ছে আত্মহত্যাই। শুধু একটা ব্যাপারে একটু খটকা..."

শিবানী বলে ওঠে, "কী ব্যাপার?"

দিব্যেন্দু মাথা চুলকে বললেন, "কী জানি, সাধুসন্তের মর্জি! কিন্তু উনি যদি আজ সকালে আত্মহত্যা করার কথা ভেবে রেখে থাকেন, তাহলে কাল রাত্রে ওঁর দু-জন চেলার সঙ্গে মধ্যরাতের পূজা শেষে তাদের কেন আজ সকাল আটটায় আসতে বলেছিলেন, সেটাই বুঝছি না।"

"সে হয়তো উনি চেয়েছিলেন, যে ওঁর মৃতদেহটি তাড়াতাড়ি উদ্ধার হোক তাই।"

"ও না, সরি। পুরোটা বলাই হয়নি। আসলে আজ সকাল দশটায় গুরুজির এক ভক্তের একটা শুদ্ধিকরণ পূজা ছিল। তার ব্যবস্থা করার জন্যই শ্মশান তান্ত্রিকবাবা চেলাদের আসতে বলেছিলেন। এখন আমি এটা বুঝছি না, উনি যদি আজ রাতেই আত্মহত্যা করবেন বলে ঠিক করেন; তাহলে সকাল দশটায় পূজা রাখবেন কেন!"

কানাই বলে ওঠে, "স্যার, আমার মনে হয় কী— রাতের পূজার পর ওই চেলা দুটোই শ্মশান তান্ত্রিকবাবাকে মেরে রেখে গেছে। হয়তো পূজার প্রণামির ভাগবাটোয়ারা নিয়ে গণ্ডগোল। ও দুটোকে কড়কে দিলেই সব বলে দেবে।"

দিব্যেন্দু একটু চিন্তিত মুখে বললেন, "তার জন্য কানাই, আগে নিশ্চিত হতে হবে এটা খুনই, আত্মহত্যা নয়।"

প্রখর রুদ্র এবার এগিয়ে গিয়ে উপর থেকে নীচ অবধি ঝুলন্ত মৃতদেহটা দেখল, "কানাই, একবার এই টুলটা সোজা করো তো।"

কানাই এসে রুমাল দিয়ে টুলটার এককোনা ধরে দাঁড় করিয়ে দিল। প্রখর রুদ্র দিব্যেন্দুর দিকে ফিরে বলল, "এই নাও প্রমাণ— খুনের। এবার কড়া জিজ্ঞাসাবাদ করতেই পারো।"

দিব্যেন্দু মৃতদেহের উপর থেকে নীচে অবধি হাঁ করে দেখে বললেন, "বুঝলাম না। যদি একটু ভেঙে বলেন।"

প্রখর রুদ্র একবার ইন্দ্রাণী আর একবার শিবানীর দিকে তাকাল। শিবানী জেঠুর মুখের দিকে একবার তারপর দিব্যেন্দুবাবুর মুখে দিকে তাকিয়ে হাঁ করে

boierpathshala.blogspot.com

রইল। ইন্দ্রাণী ধীরে ধীরে এবার নিজে ক-দিনের কুঁকড়ে-যাওয়া খোলসটা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে থাকল, "কেউ যখন গলায় দড়ি দেয়, তাকে উঁচু কিছুর উপর দাঁড়িয়ে গলায় দড়িটা বেঁধে দাঁড়ানোর জায়গাটা লাথি মেরে সরিয়ে দিতে হয়। এখানে টুলটা এক ফুটের মতো উঁচু। শ্মশান তান্ত্রিকবাবার উচ্চতা বড়জোর পাঁচ ফুট চার বা পাঁচ। উপর থেকে ঝুলন্ত দড়ির অংশ প্রায় দশ ইঞ্চি। সব যোগ করলে হয়, প্রায় সাত ফুট তিন ইঞ্চির মতো। কিন্তু পাখার ব্লেড থেকে ঘরের মেঝের দূরত্ব প্রায় আট ফুট। তার মানে প্রায় সাড়ে আট ইঞ্চি মিসিং। সেটা কোথায়?"

ইন্দ্রাণী এবার তান্ত্রিকবাবার পায়ের দিকে ইশারা করে, "এই টুল থেকে বাবাজির ঝুলন্ত দেহের পায়ের মাঝের দূরত্ব সাড়ে আট ইঞ্চি। এখন প্রশ্ন হল, ঝুলন্ত অবস্থায় যদি বাবাজির পা টুল টাচই না করে, তাহলে তিনি টুলটি লাথি মারলেন কী করে? নাকি মারা যাওয়ার পর গুরুজির আট ইঞ্চি হাইট কম হয়ে গেল! মানেটা খুব সহজ। ওঁকে ঝোলানোর পরই টুলটা নীচে ফেলে রাখা হয়েছে। খালি চোখে না-ধরা পড়াটাই স্বাভাবিক। জেঠুমণি টুলটাকে দাঁড় করাতে না বললে, আমিও বুঝতে পারতাম না।"

কানাই অত্যন্ত বোকার মতো বলে বসল, "ও ঘরে উঁচু টুল আছে। হয়তো সেটায়..."

দিব্যেন্দু ধমকে উঠলেন, "থাক, হয়েছে! বাবাজি উঁচু টুলে দাঁড়িয়ে আত্মহত্যা করে, আবার ও ঘরে টুলটা রেখে এসেছিলেন বুঝি? বেকার না বকে চেলা দুটোকে গাড়িতে তোলো ভালোমতো কড়কাতে হবে।"

বাইরে এসে এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে ইন্দ্রাণী দেখল, খোলা জায়গাটার একটু দূরে একটা হাড়জিরজিরে কুকুর মরে পড়ে আছে। উবু হয়ে কুকুরটার কাছে গিয়ে বসল। সামনের পা-টা তুলে ধরে একবার দেখল। এদিক-ওদিক ইন্দ্রাণী একটা লম্বা লাঠিজাতীয় কিছু খুঁজছিল। না পেয়ে অবশেষে পাশে ছাইয়ের গাদায় পড়ে-থাকা একটা আধপোড়া হাড় নিয়ে কুকুরটির মুখের সামনের অংশটা ফাঁক করে দাঁতগুলো ভালো করে দেখতে থাকল। মুখের চামড়ার চারপাশে গাঢ় রক্তের দাগ। ইন্দ্রাণী ব্যাগ থেকে রুমালটা বের করে

boierpathshala.blogspot.com

নিয়ে রক্তের ছিটের কিছুটা স্যাম্পল নিয়ে একটা কাগজে মুড়ে রাখল। ইন্দ্রাণী ঘুরে চেঁচিয়ে বলল, "দিব্যেন্দুবাবু, এখানে একটা কুকুর..."

দিব্যেন্দুবাবু দূর থেকেই বললেন, "হ্যাঁ ইন্দ্রাণী। আমরা দেখেছি। ক-দিন ধরেই কুকুরটা খুব ভুগছিল শুনলাম। কাল রাতে হয়তো বাবাজির শোকে এটাও গেছে।"

"কিন্তু এর মুখে যে রক্ত..."

"আরে ম্যাডাম, রাস্তার কুকুর ছিল। কোনও মাংসের দোকান-টোকান থেকে খেয়ে থাকবে! আমি দেখছি, ওটাকে মাটিচাপা দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। আপনি একটু এদিকটায় আসবেন। একটা পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে।"

দিব্যেন্দুবাবু উলটোদিকে হাঁটা দিলেন। শিবানী হাতছানি দিয়ে ডাকল। ইন্দ্রাণী বুঝল এসব বলে লাভ নেই। উঠে পড়ে দিব্যেন্দুবাবুকে অনুসরণ করল। ঘরের সামনের খোলা জায়গাটায় মাটির উপর কালো-সাদা ছাইয়ে ভরে আছে। সেই নরম ছাইয়ের উপরেই বেশ বড় সাইজের বুটের রাস্তা অবধি বেশ কয়েকটি ছাপ। শিবানী নিচু হয়ে বেশ কাছ থেকে দেখে বলল, "উডল্যান্ডের জুতো। নীচের লোগোটা মোটামুটি পরিষ্কার পড়া যায়। তবে ছাপটা ততটা গভীর না। মানে খুব একটা নতুন জুতো না। মোটামুটি ছয়-সাত মাস পুরোনো। তার বেশি হলে, জুতোর নীচের লোগোর ছাপটা আর এতটা গোটা-গোটা হত না। আরও ক্ষয়ে যাওয়া উচিত ছিল।"

জুতোর পাশে দিব্যেন্দু একটা একশো টাকার নোট রেখে দু-তিনটে ছবি নিয়ে বললেন,"সাইজ দেখে যা মনে হচ্ছে, নয় কি দশ সাইজের জুতো।"

শিবানী একটু ভেবে বলল, "তার মানে হাইট প্রায় পাঁচ-দশ থেকে ছয় ফুটের কাছাকাছি।"

ইন্দ্রাণী এর মধ্যেই জুতোর ছাপের সামনে বসে বার বার মাটির উপর পাশাপাশি মাথা রেখে একবার ডানদিক থেকে একবার বাঁদিক থেকে ছাপগুলো দেখতে থাকল। প্রখর রুদ্র এসব কাণ্ড দেখে বলল, "আরে, আরে, করিস কী? তোর চুলে সব ছাই লেগে যাচ্ছে যে।" ইন্দ্রাণী যেন কিছুই শুনতে পায়নি, সেভাবেই নিজের চুলের কাঁটাটা টেনে খুলে ফেলে। ইন্দ্রাণীর লম্বা

boierpathshala.blogspot.com

কালো চুল গড়াগড়ি দিতে থাকে মাটিতে। তার যদিও সেদিকে খেয়াল নেই। চুলের কাঁটাটা নিয়ে পায়ের ছাপের বিভিন্ন অংশে কী যেন মাপতে থাকে!"

শিবানী এবার বিরক্ত হয়ে বলল, "কী হল রে?"

ইন্দ্রাণী এবারও কোনও কথা না বলে মাটির উপর হামাগুড়ি দিয়ে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে আরও কয়েকটা পায়ের ছাপ দেখতে থাকে। চোখ বুজে সে ভাবতে থাকে, একটা অন্ধকার নিশুতি রাত। চারদিকে শেয়াল আর প্যাঁচার ডাক। এই উঠানের চারপাশেই কোথাও কোথাও শ্মশান থেকে আনা জ্বলন্ত কাঠগুলোতে তখনও ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে। একটা ছয় ফুটের লোক ঢুকে এল। লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে না। না, মিলছে না! ইন্দ্রাণী একটা ফ্রেম পিছনে গিয়ে মনে মনে লোকটার হাইটটা কমাতে থাকে। কমিয়ে পাঁচ-পাঁচ করে দেয়। হ্যাঁ, এবার মিলছে। লোকটা হেঁটে ঢুকল। কুকুরটা মুখ তুলে দেখল, কিন্তু কিছু করল না। নাকি কুকুরটা তখন এখানে ছিলই না? ঠিক আছে। লোকটা হেঁটে এগিয়ে যায়। ভিতরে গিয়ে শ্মশান তান্ত্রিকবাবাকে খুন করে লোকটা ফিরে আসছে। কুকুরটা বিপদের গন্ধ পেয়ে ডাকতে ডাকতে তেড়ে এল লোকটার দিকে। লোকটা কুকুরটাকে তাড়াতে চেষ্টা করল। কুকুরটা আরও ক্ষিপ্র হয়ে লোকটার ডান পায়ে কামড় মারল। লোকটা কুকুরটাকে ছাড়াতে ভারী কিছু দিকে আঘাত করল। কুকুরটা এবার যন্ত্রণায় কামড় ছেড়ে পালাল, কিন্তু মারটা সহ্য করতে পারল না। কিছু দূর গিয়ে মারা গেল।

"কই রে কী হল?" শিবানী ইন্দ্রাণীর কাঁধটা ধরে ঝাঁকাল। ইন্দ্রাণী সংবিৎ ফিরে পেয়ে মাটির উপর চোখ রেখে পিছনে ফিরে তাকাল। ছাইয়ের উপর একটা চতুষ্পদ প্রাণীর টলমল করে চার পায়ে ফিরে যাওয়ার চিহ্ন দেখতে পেল।

ইন্দ্রাণী এবার উঠে গা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, "লোকটার হাইটটা পাঁচ-পাঁচ বা পাঁচ-নয়ের মধ্যে। ছয় ফুট নয়। আর এখানে এসে লোকটার ডান পায়ে কোনও আঘাত লাগে। অবশ্যই সেটা ফিরে যাওয়ার সময়। যখন সে এসেছিল তখন তার দুটো পা-ই ঠিক ছিল। আমি সাসপেক্ট করছি হয়তো, কুকুরে কামড়েছিল।"

শিবানী এবার ঝাঁঝিয়ে ওঠে, "মোটেই না। জুতোর সাইজ দশ হলে তার

boierpathshala.blogspot.com

হাইট কোনওভাবেই পাঁচ-পাচের কাছাকাছি হতে পারে না। কমপক্ষে পাঁচ-দশ থেকে ছয়ের কাছাকাছি কিছু হবে।"

ইন্দ্রাণী এবার হেসে বলল, "আর যদি সে জেনে-বুঝে বড় সাইজ জুতো পরে আসে?"

শিবানী কোমরে দুই হাত রেখে ভ্রূ কুঁচকে বলল, "আর তুই ঠিক সেটা কীভাবে বলছিস?"

"আমাদের পিছনের পায়ের ছাপগুলো ভালো করে দেখ।" সবাই একসঙ্গে পিছন ফিরে নিজেদের পায়ের ছাপগুলো দেখতে থাকল।

প্রখর রুদ্রর চোখটা জ্বলতে থাকল, শুধু মুখ দিয়ে বের হল, "ব্রেভো ইন্দ্রা। ব্রিলিয়ান্ট।"

শিবানী আরও ব্যাজার মুখ করে বলল, "ধুস, কিছুই বুঝছি না। কেউ কি বলবে?"

প্রখর রুদ্র বলতে শুরু করল, "আমরা যখন স্বাভাবিকভাবে হাঁটি, তখন আমাদের পায়ের গোড়ালি প্রথম মাটি ছোঁয়, তারপর আঙুলের উপর ভর দিয়ে গোড়ালি তুলে অন্য পা এগিয়ে দিই। ফলে স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের জুতো বা পায়ের ছাপের সব থেকে গভীর ছাপ পড়ে পায়ের সামনের অংশের, তারপর গোড়ালির আর মাঝের অংশের ছাপ সব থেকে হালকা বা অগভীর হয়। কিন্তু এই ছাপগুলোর গোড়ালি থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত ছাপের সব অংশের গভীরতা প্রায় সমান— আর ছাপগুলো কিছুটা ঘষটে-যাওয়া। ততটা ইনট্যাক্ট নয়। অর্থাৎ সে বার বার সামনের পায়ের পুরো পাতা একসঙ্গে তুলে ফেলছিল, ফলে পিছনের পা কিছুটা হলেও ঘষটে যাচ্ছিল। আর এরকম তখনই করার দরকার হয় যখন আমরা প্রয়োজনের থেকে সাইজে বড় জুতো পরি। সেই অবস্থায় যদি স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে চেষ্টা করি, গোড়ালি জুতোর পিছন থেকে বের হয়ে যাবে!"

ইন্দ্রাণী এর সঙ্গে যোগ করল, "তাছাড়া, উচ্চতার ব্যাপারটা দু-টো পায়ের ছাপের মধ্যের দূরত্ব দেখেও আন্দাজ করা যায়। ছয় ফুটের উচ্চতার আততায়ী হলে দুই পায়ের ছাপের মধ্যের দূরত্ব আরও বেশি হত।"

boierpathshala.blogspot.com

শিবানী এবার ঠোঁট কামড়ে বলল, "সেটা না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু ছয় মাসের ব্যবহার-করা জুতোটা কীভাবে এল? যদি পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যই বড় জুতো কিনে খুন করতে আসে, তাহলে নতুন জুতো হওয়াটাই স্বাভাবিক নয় কি?"

কানাই এতক্ষণ চুপ করে সব দেখছিল আর শুনছিল। হঠাৎ করেই বলে উঠল, "হয়তো কোনও বন্ধুর থেকে ধার করেছিল।"

প্রখর রুদ্র হেসে উত্তর দিল, "তোমার কোনও বন্ধুকে কি তার নিজের সাইজের থেকে বড় জামা-জুতো ধার নিতে দেখেছ? আর যদিও বা চায়, তুমি কি অবাক হয়ে কারণ জানতে চাইবে না? খুন করার মতো এরকম একটা ব্যাপার কি একটা জুতো ধার নেওয়াকে কেন্দ্র করে পাঁচকান করতে চাইবে?"

কানাই এবার কান চুলকে বলল, "তা অবশ্য ঠিক। তাহলে?"

ইন্দ্রাণী কিছুক্ষণ চিন্তিত মুখে তাকিয়ে থেকে বলল, "সেটাই ভাবছি।"

দিব্যেন্দুবাবু এবার বললেন, "আর ফেরার সময় পায়ে আঘাত লাগার ব্যাপারটা?"

"উ? ও হ্যাঁ। আসার সময়ের পায়ের ছাপগুলো দেখুন, দুই পায়ের ছাপই আছে। যাওয়ার সময় মাঝপথ থেকে বাঁ পায়ের ছাপটা আছে, বরং আরও গভীর হয়ে গেছে। ডান পায়ের জুতোর শুধু সামনের কিছুটা অংশের ছাপ আছে। তার মানে সে ডান পা-টা পুরো ফেলতে পারছিল না।"

চারিদিকটা আরও একবার দেখে ওরা পাঁচজন বেরিয়ে আসে। বাইরে তান্ত্রিকবাবার দুই চেলাকে মাটিতে বসিয়ে এক জুনিয়র অফিসার জেরা করে চলেছে। আর দু-জনেই হাউ হাউ করে কাঁদছে আর বলছে, "আমরা কিছু করিনি, স্যার।" দিব্যেন্দুবাবুকে দেখে পায়ে সটান লফিয়ে পড়ে দু'জন আরও জোরে কাঁদতে থাকল। দিব্যেন্দুবাবু পা ছাড়িয়ে জুনিয়র অফিসারটির দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, "প্রবাল, কী বলছে এরা?"

"স্যার বলছে, বাবা নাকি অন্তর্যামী ছিলেন। ক-দিন ধরেই বলছিলেন তাঁর আর বেশি দিন নেই। বাবা নিজে নিজেই গলায় দড়ি দিয়েছেন। চেলাগুলো

boierpathshala.blogspot.com

রাতের পূজা শেষ করে তিনটের দিকে বাড়ি চলে যায়। তারপর ওরা আর কিছু জানে না।"

ভিড়ের মধ্যে থেকে কালো পোষাকে থাকা একজন তান্ত্রিক চিৎকার করে ওঠে, "আনতার-ইয়ামী না ছাই। ভাঁওতাবাজ একটা। লুক ঠকিয়ে পয়সা বানানোর ধান্দা।"

দিব্যেন্দুবাবু চোখ কুঁচকে লোকটাকে কাছে ডাকলেন, "আপনি ঠিক কী জানেন শ্মশান তান্ত্রিকবাবার সম্বন্ধে?"

লোকটা এবার আক্রোশে ফেটে পড়ল, "এই লুকটা মুটেই তান্–রিক ছেলো না। তান্–রিক সয়মাজের কলঙ্কো! লুক ঠেকানোর বাবসা ফেঁইদে ছেলো। লুকও যে পাগলের মতন উটার কাছেই বার বার কেনে ছুটে আসতো কে জানেক! হামদের তান্–রিকদের থাকা-খাওয়ানের ঠিক ঠেকানা নাই, আর উর কিনা পাকা বাড়ি! জানেনই জা–গাটাও উর কিন–য়া! ইত্তো টাকা আসে কই থ্যাইক্যা!"

দিব্যেন্দুবাবু মুখে একটু চিন্তার রেখা দেখা দিল। এবার চেলাগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, "তোরা কিছু জানিস?"

বেঁটেখাটো চেলাটি বলল, "না স্যার, জানি না। তবে গুরুজির কাছে যারাই আসত তাদের গুরুজি মন্ত্রপূত জরা-হরা চূর্ণ দিত। সবাই ওটা চেয়েও নিয়ে যেত। জগা অনেকবার বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, বাবা কী দিয়ে ওই চূর্ণ বানায়, কিন্তু কিছু বলেননি। বাবাজির ভক্তরাই টাকাকড়ি, গয়না দিয়ে দিত। আমরা ব্যাঙ্কের লকারে জমা করে আসতাম।"

দিব্যেন্দুবাবু এবার চমকে উঠলেন, "কী? বাবাজির ব্যাঙ্কে লকার! বলিস কী? কোন ব্যাঙ্ক? প্রবাল, এদের নিয়ে এক্ষুনি যাও।"

প্রবাল দু-জন চেলাকে গাড়িতে তোলে। এর মধ্যে অন্য একজন কনস্টেবল শ্মশান থেকে দুটো ডোমকে ধরে এনেছে। দিব্যেন্দুবাবু বললেন, "যা ছবি তোলার, তোলা হয়ে গেছে। বডিটা নামিয়ে ফেল। আর ওখানে একটা কুকুর মরে পড়ে আছে। ওটাকেও এদের দিয়ে মাটি-চাপা নিয়ে নিস।" দিব্যেন্দু এবার

boierpathshala.blogspot.com

শিবানীদের দিকে ফিরে বললেন, "আপনাদের কোথাও ছাড়তে হবে?"

প্রখর রুদ্র নমস্কার করে বলল, "আজ্ঞে না, আমরা হেঁটেই চলে যাব।"

* * * * * * *

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনজনে লজের পাশে প্রায় চলে এসেছে। হঠাৎ করেই ইন্দ্রাণী বলল, "আমার মাথাটা একটু ধরেছে, বুঝলি। একটা সেরিডন কিনে আনছি। তোরা এগো। আমি আসছি।" ইন্দ্রাণী কারও কথার কোনও অপেক্ষা না করেই মুখের উপর চাদরটা জড়িয়ে হনহনিয়ে হেঁটে সামনের ওষুধের দোকানটায় ঢুকে গেল। শিবানী আর প্রখর রুদ্র কিছুক্ষণ অবাক চোখে তাকিয়ে নিজেদের লজের দিকে হাঁটা শুরু করল।

দুপুরের খাওয়ার পর সবাই ছুটির আমেজে একটু গড়িয়ে নিল। বিকালে উঠেই ইন্দ্রাণী হাসি-হাসি মুখ করে শিবানীকে বলল, "কী রে, তোর তো জিলিপি ডেটিং আছে। যাবি না?"

শিবানী ঘুম-জড়ানো গলায় বলল, "কী যে বলিস। সকালে যা হয়েছে, তারপর তোর মনে হয় লোকটা আর আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে?"

"আসতেও তো পারে। গিয়ে দেখতে ক্ষতি কী?"

"তুই কি পাগল হলি? তা ছাড়া সবে সাড়ে চারটে বাজে। সন্ধে নামুক আগে। আর ছেলেরা যদি একটু ওয়েট না করে মেয়েদের জন্য, তাহলে মেয়েদের দর কমে যায়। বুঝলি?"

ইন্দ্রাণী একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "আমার বাবা তোদের এসব নেকাপনা ভালো লাগে না। শুধু শুধু একটা মানুষকে ওয়েট করানোর কী মানে। জেনে-বুঝে?"

শিবানী চোখ বড় বড় করে বলল, "বাপ রে, অতই দরদ যখন, তুই যা-না। আমরা যমজ। এমনিতেই চিনতে পারবে না। তুই গিয়ে ফিল্ডিং দিতে থাক, তারপর আমি আসছি।"

ইন্দ্রাণী বেশ রাগের সঙ্গেই বলল, "হ্যাঁ তা-ই যাচ্ছি। তুই যা পারিস কর।"

boierpathshala.blogspot.com

দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে ইন্দ্রাণী বেরিয়ে গেল। বাইরে নীচে এসে একবুক শ্বাস নিয়ে একটু হাসল। এই সুযোগটাই সে চাইছিল। লোকটাকে একটু ভালো করে চিনে নিতে হবে। শিবানী লোকজন চিনতে খুব ভুল করে, চট করে যে-কাউকেই বিশ্বাস করে নেয়।

* * * * * * * *

ইন্দ্রাণী মোড়ের মাথায় আসতেই দেখল প্রতীক একটা সিগারেট খাচ্ছে আর এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। ইন্দ্রাণীকে দেখেই সিগারেটটা ফেলে দ্রুতপায়ে এগিয়ে এল। ইন্দ্রাণী মনে মনে প্রস্তুতি নিতে শুরু করল, এখন কিছুক্ষণ তাকে শিবানীর চরিত্রে অভিনয় করতে হবে। লোকটা যেন বুঝতে না পারে। প্রতীক কাছে এসেই অত্যন্ত নরম সুরে বলল, "আপনি যে আসবেন, আমি ভাবিনি। আপনার কাকা আর বোন এল না?"

"আজ্ঞে, উনি আমার কাকা নন। জেঠু। আর আপনি তো আমাকেই আসতে বলেছিলেন। ওদের দেখেই তো সকালে আপনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। তাই ওরা আর এল না," ইন্দ্রাণী একটু কপট অভিমানের ভঙ্গি করল।

প্রতীক দু-কান ধরে বলল, "মার্জনা করবেন। আসলে সকালে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলাম। ওঁদের বরং ফোন করুন। একসঙ্গে বের হওয়া যাবে।"

ইন্দ্রাণী সামনের দিকে হাঁটা শুরু করে, "ও! তার মানে আমার সঙ্গ আপনার ঠিক পছন্দ নয়?"

"এরকম কথা কোথায় বললাম? আপনি আমাকে লজ্জায় ফেলছেন, ম্যাডাম।"

"যদি ম্যাডামই বলতে হয়, তাহলে বরং থানায় চলুন। পুলিশদের কি নিজস্ব জীবন থাকতে পারে না? আমার একটা নাম আছে। সেটাতে সম্বোধন করলে বেশি খুশি হব। তা আপনার দোকানটা কোথায়?"

"ঠিক আছে শিবানী, তা-ই হবে। এই তো এসে গেছি।" প্রতীক সামনে একটা ছোটখাটো মিষ্টির দোকানের দিকে এগিয়ে যায়। ভিতরে কতকগুলো

boierpathshala.blogspot.com

কম দামি টেবিল-চেয়ার পাতা। একটা টিউবলাইট ধিকধিক করে জ্বলছে। দোকানের সামনেটাতেই গরম গরম কচুরি ভাজছে। ইন্দ্রাণী আর প্রতীক ভিতরে গিয়ে একটা টেবিলের একে অন্যের মুখোমুখি বসল। বসতে গিয়ে ইন্দ্রাণীর গলার কাছটা থেকে চাদরটা পড়ে যেতেই প্রতীকের চোখ কুঁচকে গেল। ইন্দ্রাণী একটু অস্বস্তি বোধ করলেও বুঝতে না দিয়ে চাদরটা টেনে নিল। ইন্দ্রাণীই শুরু করল, "কই, অর্ডার দিন।"

প্রতীককে একটু অন্যমনস্ক দেখাল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, দিচ্ছি।"

দোকানের ছেলেটাকে হেঁকে দু-প্লেট কচুরি আর এক প্লেট জিলিপি দিতে বলল। ইন্দ্রাণী যতটা সম্ভব খোলামেলা কথা বলা শুরু করল আর প্রতীক ঠিক ততটাই সচেতনভাবে অনেক ভেবেচিন্তে জবাব দিতে থাকল।

এর মধ্যে দোকানি ছেলেটা খাবার দিয়ে যেতেই ইন্দ্রাণী বলল, "শুনেছেন, আজকের ব্যাপারটা। শ্মশান তান্ত্রিকবাবা মারা গেছেন। পুলিশ বলছে নাকি খুন।"

"হতে পারে। কিন্তু খুন তো নয়, আত্মহত্যা।"

ইন্দ্রাণী টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে, "আপনি দেখেছেন?"

প্রতীক চেয়ারের উপর সোজা হয়ে বসে, "না। মানে লোক বলছিল। তা ছাড়া খুনের প্রমাণ কোথায়?"

"কেন? এত প্রমাণ তো আছে প্রতীকবাবু।"

"যেমন?"

"সকালে যখন আপনার সঙ্গে আমাদের দেখা হল, বড় দশ সাইজের জুতো পরে ফিরছিলেন। আপনার সাইজ তো এখন দেখে মনে হচ্ছে সাত?"

প্রতীক ইন্দ্রাণীর চোখের দিকে সোজা তাকাল। কিছুক্ষণ পর একটা বুকভরা শ্বাস নিল, "আপনি ভুলও দেখে থাকতে পারেন।"

"আপনার জুতোতে ওই উঠানের মতোই নরম সাদা-কালো ছাই লেগে ছিল, মিস্টার প্রতীক। তার উপর ডান পা-টা তো জখম, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছেন। দুপুরে গলির ওপাশের দোকান থেকে 'আভায়ার‍্যাভ' কিনেছেন।

boierpathshala.blogspot.com

অ্যান্টি র‍্যাবিস সিরাম।"

এবার প্রতীক আরও শান্তভাবে উত্তর দিল, "তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না, শিবানী। আমি ওষুধ কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউটার। যে-কোনও জায়গা থেকে যে-কোনও ওষুধ কিনতেই পারি।"

ইন্দ্রাণী মনে মনে একটু অশান্ত হয়ে ওঠে, "আপনি বোধহয় ভুলে যাচ্ছেন, আপনার পায়ে কুকুরটার দাঁতের দাগ এখনও আছে। আর আপনার বোধহয় জানা নেই, মানুষসহ যেকোনো শ্বাপদজাতীয় প্রাণীর দাঁতের স্ট্রাকচার প্রায় ফিঙ্গারপ্রিন্টের মতোই ইউনিক– একজনের থেকে অন্যজনের আলাদা। কুকুরটা আজ সকালেই মাটিচাপা পড়েছে। এখনও তুলে নিয়ে ডেন্টাল ফরেনসিকে পাঠালে দাঁতের মোল্ড তৈরি করা বেশি সময়ের কাজ না বোধহয়। আর আপনার পায়ের ক্ষতের সঙ্গে সেগুলো ম্যাচ করবে বলেই আমার বিশ্বাস।"

প্রতীক আরও শান্তভাবে বলল, "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর। আর তর্কের খাতিরেই হি সহি, এই কুকুরটাই বাজারে পথেঘাটে যে-কোনও জায়গাতেই কামড়াতে পারে।"

"কিন্তু জুতোজোড়া..."

ইন্দ্রাণীকে মাঝপথে থামিয়ে দেয় প্রতীক। তারপর নিজেই বলতে থাকে, "ঠান্ডা হয়ে বসুন। একটা গল্প শুনুন— একটা ভাই ছিল। তার একটা বোন ছিল। ধুমধাম করে বোনের বিয়ে দিল। কয়েক বছর পর এরকমই এক ডিসেম্বরে বোনটির যক্ষ্মা হয়। তার শ্বশুরবাড়ির লোক মেয়েটিকে নিয়ে তারাপীঠে শ্মশান তান্ত্রিকবাবার কাছে এল। বাবা নিদান দিলেন, এই ঠান্ডায় মাঝরাত্রে বরফশীতল জলে স্নান করে মা তারার পূজা করতে হবে। বোনটি আরও অসুস্থ হতে থাকল। ভাইটিকে মেয়েটির শ্বশুরবাড়ির লোক জেদ করে হসপিটালে নিয়ে যেতে দিল না। অসহায় ওষুধের ড্রিস্টিবিউটার ভাইটি লুকিয়ে লুকিয়ে বোনটির হাতে যক্ষ্মার ওষুধ দিয়ে আসত। যক্ষ্মা তো সেরে যাচ্ছিল, কিন্তু তিন দিনের নিউমোনিয়ার জ্বরে পৃথিবী ছাড়ল সে।"

প্রতীক এবার ইন্দ্রাণীর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল, "আপনার চোখে এটা

boierpathshala.blogspot.com

খুন নয়? কই কোনও পুলিশ তো কেস নেয়নি। সব জায়গা থেকে ভাইটি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। একটা ভণ্ড মানুষের জীবন নিয়ে খেলবে আর সেটা ভগবান বসে বসে দেখতে পারে! সবাই পারে না। আর যেখানে ভগবান পৌঁছোতে পারে না, মানুষকেই পৌঁছোতে হয়।"

ইন্দ্রাণীর মনে হল, সন্ধের হালকা আলোতে প্রতীকের চোখগুলো একটা আক্রোশে যেন জ্বলছে, কিন্তু মুখের শান্তভাবটা একই রকম, "আর এটা আপনাকে বোঝাতে হচ্ছে? এই পাষণ্ডটার জন্যই তো আপনার জীবন যেতে বসেছিল।"

ইন্দ্রাণী এক সঙ্গে ডবল ধাক্কা খেল, লোকটা বারুইপুরের ঘটনা জানে! আবার সে যে শিবানী নয় সেটাও বুঝে ফেলেছে! ইন্দ্রাণী কিছুটা ভয়ে ভয়ে জবাব দিল, "কিন্তু তা বলে খুন?"

প্রতীক আরও শান্তভাবে বলল, "খুন তো আপনি বলছেন। পুলিশ কোথাও পৌঁছোতে পারবে না, ইন্দ্রাণী। ওরা ওটা আত্মহত্যাতেই কেস বন্ধ করবে।"

"আর আমি যদি প্রমাণ করে দিই?"

প্রতীক টেবিলের উপর কাচের একটা বোতল রাখল। ওটার উপর একটা লেবেলে লেখা— 'শ্মশান তান্ত্রিকবাবার জরা-হরা চূর্ণ'। চিবিয়ে চিবিয়ে প্রতীক এবার বলল, "This was not a personal revenge! চাইলে এটা ল্যাবে পরীক্ষা করিয়ে নিয়ো। বাবার প্রসাদে ঠিক কী কী মারাত্মক ড্রাগস আছে। তারপরেও যদি মনে হয় এরকম একটা লোকের আরও কিছুদিন বেঁচে থাকার অধিকার ছিল তাহলে তোমার যেটা ভালো মনে হয়, সেটাই কোরো।"

ইন্দ্রাণী কিছু না বলে চুপচাপ উঠে চলে যাচ্ছিল। প্রতীক পিছন থেকে ডেকে বলল, "ইন্দ্রাণী, এই ডার্মাটিলজিস্টের কার্ডটা রাখো। তোমার গলার চারপাশের বেগুনি দাগগুলোকে সাধারণ র‍্যাশ বলে ভুল কোরো না। শ্মশান তান্ত্রিকবাবার দেওয়া মন্ত্রপূত যে চূর্ণ বারুইপুরের লোকটি তোমার গায়ে দিয়েছিল, এটা তারই সাইড এফেক্ট। ওই চূর্ণতে মৃত মানুষের চিতাভস্মও ছিল। আজ ওটাতেই তুমি ধরা পড়ে গিয়েছ।"

boierpathshala.blogspot.com

ইন্দ্রাণীর এবার গাটা রি রি করে ওঠে। বেরিয়ে যাওয়ার আগে একবার পিছন ঘুরে জিজ্ঞাসা করে, "দশ সাইজের পুরোনো জুতো আততায়ী কোথা থেকে পেল, সেটাই শুধু সমাধান করতে পারিনি। আপনি জানেন কি?"

"আপনার জেঠু কনসালটেন্ট ডিটেকটিভ যেমন, তেমন এ শহরে কনসালটেন্ট ক্রিমিনালও আছে। পেপারে চোখ রাখলে ডার্ক হর্সের অ্যাডটা দেখতে পেতেন। তার কাছ থেকেই আইডিয়াটা নগদ ত্রিশ হাজার টাকায় আততায়ী কিনেছিল। প্রত্যেকদিন দশ সাইজের জুতো পরে গত ছয় মাস বাড়ির ছাদে হেঁটে বেড়িয়েছে। যাতে আস্তে আস্তে জুতোর সোল ক্ষয়ে আর পাঁচটা পুরোনো জুতোর মতোই লাগে।"

ইন্দ্রাণী কিছু না বলে দোকান থেকে বেরিয়ে এসে মোবাইলের ভিডিয়ো রেকর্ডিংটা ডিলিট করে দেয়। লোকটা খুব বুদ্ধিমান। সব বলে দিয়েও একবারও নিজে মুখে কিছুই স্বীকার করেনি। চারিদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। গত সপ্তাহের নীহার চৌধুরির ভয়টা হঠাৎ করেই তাকে জাঁকিয়ে বসতে থাকে। তারপরই প্রতীকের বোনের কথা মনে পড়ে। অসহায় একটা মেয়ে ধীরে ধীরে একটা পাষণ্ড তান্ত্রিকের জন্য মারা যাচ্ছে। আর লোকেদের অন্ধবিশ্বাস সেটা চুপচাপ উপভোগ করছে। ঠান্ডা থেকে বাঁচতেই রাস্তার পাশে কিছু বাচ্চা ছেলে কিছু টায়ার, কাঠ একত্র করেছে। ইন্দ্রাণী এগিয়ে গিয়ে দেখে, ওরা আগুন ধরানোর জন্য একটা কাগজ বা কাপড়জাতীয় কিছু খুঁজছে। ইন্দ্রাণী ব্যাগ থেকে দুপুরে কুকুরের দাঁত থেকে ব্লাড স্যাম্পল নেওয়া রুমালটা ওদের দিকে বাড়িয়ে দেয়। ওরা 'থ্যাঙ্ক ইউ দিদি' বলে রুমালটায় আগুন ধরিয়ে টায়ারগুলো জ্বালাতে থাকে। রুমালের উপরের রক্তের দাগগুলো আগুনে গাঢ় বাদামি থেকে কালো হতে শুরু করে— একমাত্র ডি.এন.এ. স্যাম্পল। ইন্দ্রাণী আধো আলো-অন্ধকারে লজের দিকে হাঁটতে থাকে। ঠিক-ভুল সত্যি-মিথ্যে এখন তার সবই একই মনে হতে থাকে।

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

বিষবৃক্ষ

রবিবারের সকালের কাগজটা খুলে ভিতরের পাতায় প্রখর রুদ্রর চোখ আটকে গেল একটা বিজ্ঞাপনে— 'ডার্ক হর্স, কনসালটেন্ট ক্রিমিনাল। যে-কোনও অপরাধকে পারফেক্ট ক্রাইমে রূপ দিতে সিদ্ধহস্ত। চটজলদি সমাধান। আপনার পরিচয় থাকবে গোপন।' সত্যিই বেশ কিছুদিন ধরেই এই বিজ্ঞাপনটি দেখছে প্রত্যেক রবিবার। শিবানী সকালের চা হাতে নিয়ে দোতলার পড়ার ঘরে ঢুকতেই প্রখর রুদ্র কাগজটা এগিয়ে দিল, "এই বিজ্ঞাপনটা দেখেছিস?"

শিবানী কিছুক্ষণ চোখ কুঁচকে পেপারের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "শহরের বেশ কিছু কেসে এই লোকটির উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে। সাধারণ মানুষকেও এমন জটিল অঙ্কে অপরাধ করতে শেখাচ্ছে, যে পুলিশও যথারীতি হিমশিম খাচ্ছে। কিন্তু লোকটা যে কে, সেটা এখনও আমরা জানতে পারিনি।"

"সঙ্গে কোনও ফোন নম্বর নেই। শুধু একটা ই-মেল। তোদের সাইবার ক্রাইম ডিপার্টমেন্ট কী বলছে?"

"না আসলে, এখনও সেভাবে ব্যাপারটা আমরা দেখিনি।"

"আগাছা ছোট থাকতেই উপড়ে ফেলা ভালো।"

এমন সময় নীচে থেকে মালতী চেঁচিয়ে ডেকে উঠল, "বড়দাদাবাবু, আপনার সঙ্গে দেখা করতি একটি লোক এইচেন। উপরে পাঠিয়ে দিসছি।"

এরপর সিঁড়িতে একটি অসমর্থ পায়ের আওয়াজ শোনা গেল, সঙ্গে লাঠির আওয়াজ।

শিবানী কিছুক্ষণ কান খাড়া করে বলতে শুরু করল, "চেহারা একটু হালকার দিকে। বয়স আন্দাজ ষাটের কোটায়। লম্বায় পাঁচ ফুট সাত। একটি

পায়ে একটু সমস্যা আছে।" কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি বয়স্ক লোক বাঁ পা ঘষে ঘষে ঘরে ঢুকলেন। লম্বায় পাঁচ ফুট সাতের কাছাকাছি। মাথার সামনের দিকের চুল কম। এতগুলো সিঁড়ি চড়ে লোকটি একটু হাঁপাচ্ছেন। শীর্ণ ও অসুস্থই লাগে প্রথম দর্শনে।

প্রখর রুদ্র বলল, "আপনার জন্য কি চা বলব নাকি ঠান্ডা শরবত?"

ভদ্রলোক চেয়ারে শরীর এলিয়ে খুব শান্তভাবেই বলতে শুরু করলেন, "সদাশিববাবুর থেকে আপনার কথা শুনেই আসা। তাই আপনারও বেশি সময় নষ্ট করতে চাই না। কাজের কথায় আসি। আমার নাম বিকাশ মহাপাত্র। আমার বসতবাড়িটি বাগানবাড়ি বলাই চলে। সামনে বেশ কিছুটা বাগান, পিছনে একটা পুকুর। কলেজ স্ট্রিটে একটি বইয়ের দোকান, গড়িয়াহাটে একটি শাড়ির নিজস্ব দোকান। এ ছাড়া তিনটি শপিং মলে ভাড়ায় তিনটি দোকান দেওয়া আছে। বইয়ের দোকান আমার ছোটছেলে দেখাশোনা করে, শাড়ির দোকানের আলাদা ম্যানেজার আছে। সব মিলিয়ে মাস গেলে মোটে না হলেও নাই নাই করে আড়াই-তিন লাখ টাকার মুনাফা। আর বড়ছেলের শখ সেসব টাকা মেয়েমানুষ আর মদে ওড়ানো। বাড়ির লোক বলতে, আমি, আমার স্ত্রী, দুই ছেলে, ম্যানেজার মণীশ আর জ্ঞাতি দুই ভাগনা-ভাগনি। আমার বয়স ৬৫, স্ত্রী ৩৫, বড়ছেলের বয়স ৩৪ আর ছোটছেলে ২৮। ভাগনা-ভাগনিদের বয়স ২৪-এর কোটায়। এই হল আমার সম্পত্তির সমস্ত দলিল," বলে ভদ্রলোক একটি দলিল ব্যাগ থেকে বের করে শিবানীকে দিলেন।

প্রখর রুদ্র টেবিলের উপর দলিলটা মেলে ধরে দেখতে দেখতে বলল, "কিন্তু আপনার সমস্যাটা এখনও তো বুঝলাম না।"

"দেখতে থাকুন, তারপর বলছি..."

শিবানী বলল, "আচ্ছা, আপনার প্রথম পক্ষের স্ত্রী কি গত হয়েছিলেন?"

ভদ্রলোক হঠাৎই চমকে উঠে চেয়ারে সোজা হয়ে উঠলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কী করে?"

শিবানী বলল, "এই যে বললেন স্ত্রী-র বয়স ৩৫ আর আপনার বড়ছেলের বয়স ৩৪ আর ছোটছেলের ২৮। এরপর আর কী বাকি থাকে?"

boierpathshala.blogspot.com

ভদ্রলোক এবার একটু স্বাভাবিক হয়ে বললেন, "ও আচ্ছা। হ্যাঁ, মানে অনুরাধার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছে আট বছর আগে। আমার প্রথমা স্ত্রী চারুলতা বছর কুড়ি আগে গত হয়েছেন।"

"শুধু আপনিই তাঁকে এখনও ভুলতে পারেননি।"

বিকাশবাবু কিছুক্ষণ শিবানীর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। শিবানী স্মিত হেসে বলল, "ওই যে আপনার লাঠিটি। এখন ওরকম কারুকার্য করা লাঠি পাওয়া দুষ্কর। এখন সবই লাইটওয়েট আয়রন পাইপের লাঠি। লতাপাতা কারুকার্যের মধ্যে লেখা 'চারুর উপহার'। নীচের দিকটা অসমানভাবে ক্ষয়ে গিয়েছে। তা-ও ছাড়েননি।"

বিকাশবাবু মাথা নামিয়ে লাঠিটির দিকে একবার দেখলেন, "বড় শখ করে চারু বানিয়ে দিয়েছিল। আমার বাঁ পা-টায় একটু সমস্যা ছিল। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটাও বাড়ছিল, তাই এই উপহার। আমি চারুলতাদেরই ওই শাড়ির দোকানে ম্যানেজারের কাজ করতাম। তিনকুলে আত্মীয় বলতে এক দূর সম্পর্কের ঠাকুমা। ওই দোকানেই চারুলতার সঙ্গে পূর্বরাগ চলতে থাকে আমাদের। আমার শ্বশুরমশাই ছিলেন অপুত্রক। তাঁর বিশাল সম্পত্তি দেখার জন্য একজন নির্ভরযোগ্য লোকের দরকার ছিল। তাঁর আমাকে পছন্দ হয়ে যায়। তাই চারুর সঙ্গে আমার বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি, মানে আমার এখনকার যে বসতবাড়ি, সেখানে থাকতে শুরু করি। সবাই বেশ খুশিই ছিল। পাঁচ বছরের মধ্যে আমাদের দুটি পুত্রসন্তান জন্মাল— আদিত্য এবং প্রতাপ। স্নেহের বশে আমার শ্বশুরমশাই মৃত্যুর আগে সব সম্পত্তি তাঁর দুই দৌহিত্রকে দিয়ে যান। আমাকে আর আমার স্ত্রী-কে আইনগতভাবে তাদের অভিভাবক হিসেবেই নিযুক্ত করে যান। প্রথমা স্ত্রী-র মৃত্যুর পর তাঁর ভাগটা পাচ্ছে আমার ছোটছেলে প্রতাপ। শাড়ির দোকানের যা মুনাফা আসে, সেটাই আমার মাসোহারা। আমার মৃত্যুর পর সেটা পাবে আইনগতভাবে আমার বড়ছেলে আদিত্য। এখন আমার দ্বিতীয় স্ত্রী-র কাছে এ-মত অবস্থায় আমার মৃত্যুর পর কিছুই থাকে না। তাই আপনার পরামর্শ..."

প্রখর রুদ্র উইল থেকে মুখ তুলে ভ্রূ কুঁচকে বলল, "দেখুন, আমি তো

boierpathshala.blogspot.com

আইনজীবী নই, আইনের মারপ্যাঁচ কিছুই জানি না। আপনি মনে হয় ভুল জায়গায় এসেছেন। আপনার..."

ভদ্রলোক ইশারায় জেঠুমণিকে থামিয়ে বলতে শুরু করলেন, "আমি কিছু আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলেছি। তারা কোর্টে এই উইলটির বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিতে পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু তাতে আমার শ্বশুরমশাইয়ের অসম্মান করা হয়। আমার প্রথমা স্ত্রী-র একটি বান্ধবী ছিল। চারু বলেছিল, যদি কোনওদিন সমস্যায় পড়ি, যেন তার কাছে আমি যাই। সে আইনি পথে হোক বা অন্যভাবে— আমাদের সাহায্য করবেই।"

শিবানী উইল থেকে চোখ সরিয়ে বলল, "হ্যাঁ তাহলে তাঁর কাছেই যাচ্ছেন না কেন?"

"গিয়েছিলাম। গিয়ে শুনলাম ওটা ওঁর বাপের বাড়ি ছিল। সেখান থেকে শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা নিলাম। সদাশিববাবু আপনার ঠিকানা আগেই দিয়েছিলেন। দেখলাম দুটো ঠিকানাই একই। তাই মানে আগে আপনার সঙ্গেই দেখা করছি, আপনি যদি এই 'কুন্তলা রুদ্র'কে বলে দেন তাহলে খুব সুবিধা হয়। মানে, ভুল বুঝবেন না কিন্তু যদি তিনি কোনওভাবে সাহায্য করতে পারেন..."

শিবানী অবাক হয়ে বলল, "কুন্তলা রুদ্র আমার মা। আমাদের জন্মের পরও কিছুদিন কলকাতা হাইকোর্টে অ্যাডভোকেট ছিল। কিন্তু তারপর তো অনেকদিন হল উনি প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়েছেন।"

বিকাশবাবু কাতর চোখে বললেন, "তা-ও যদি একবার কথা বলা যেত।"

শিবানী কুন্তলা রুদ্রকে ডেকে আনার পর কিছুক্ষণ যদিও তাঁরও ঘোর কাটতে সময় নেয়। কুন্তলা রুদ্রর হাইস্কুলের বান্ধবী ছিল চারুলতা। দু-জনে খুব কাছের বন্ধু ছিল। তারপর কুন্তলা রুদ্রর বাবা কাজের সূত্রে পরিবার নিয়ে চেন্নাই চলে যান। সেখানেই ল ডিগ্রি শেষ করে কুন্তলা আবার কলকাতার বাড়িতেই ফিরে আসেন মায়ের সঙ্গে। এর মধ্যে বিয়ে হয় শেখর রুদ্রর সঙ্গে। তারপর একসঙ্গে দুই মেয়ে— সামলাতে সামলাতে তাঁকে নিজের কেরিয়ার থেকে ছুটি নিতে হয়। কুন্তলা রুদ্র মন দিয়ে সবটা শোনার পর বললেন, "আপনার উইলের কথা কে কে জানে?"

boierpathshala.blogspot.com

"আমি আর আমার বর্তমান স্ত্রী। ছেলেরা জানে যে আমার মৃত্যুর পর তারা সম্পত্তির ভাগ পাবে কিন্তু অনুরাধা যে আইনিভাবে কিছুই পাবে না, এটা তারা কিছুই জানে না।"

"ওদের সঙ্গে কোনওভাবে কথা বলে দেখেছেন, ওদের কী মত?"

"আমি ছোটছেলের সঙ্গে কথা বলেছি। ওর কথা, দাদা যদি দেখতে রাজি থাকে তাহলে ওরও আপত্তি নেই। কিন্তু দাদা যদি দায় এড়ায়, তাহলে ও একা দায়িত্ব নিতে রাজি না। বড়ছেলেটি অনেক আগেই বখে গেছে অসৎসঙ্গে। সে অনুরাধাকে বিয়ে করতে চায়। মুখের ভাষা অত্যন্ত অশ্লীল। একই বাড়িতে থাকলেও প্রায় কেউই ওর সঙ্গে কথা বলে না।"

"আপনার দুই ছেলের কারওরই বিয়ে হয়নি?"

"বড়টি বললাম যে মদ আর মেয়েমানুষে মত্ত। দাদুর অনেক টাকা। এখন তো আবার টেন্ডার ওয়্যাপ এসেছে। ওসব নিয়েই আছে।"

শিবানী ফুট কাটল, "টিন্ডার।"

বিকাশবাবু বললেন, "ওই হল। বাড়ি বসে যত মেয়ে খোঁজার ফিকির! যত্তসব। আর ছোটর জন্য মেয়ে দেখা চলছে।"

কুন্তলা রুদ্র বললেন, "আর আপনার ভাগনা-ভাগনি?"

"আজ্ঞে, ওরা কারও সাতে-পাঁচে নেই। বাড়িতে থাকে—তিনকুলে কেউ নেই। ভাগনাটি একটি মলের সিকিয়োরিটির কাজ করে আর ভাগনি আশুতোষ কলেজে কেমিস্ট্রি অনার্স। আমার বাড়িতে থাকায় ওদের বাড়ি ভাড়াটা বেঁচে যায়। ওদের কোনও অসুবিধা হবে না, আমি জানি। ওরা স্বাবলম্বী। আমার চিন্তা অনুরাধাকে নিয়ে।"

শিবানী জিজ্ঞাসা করল, "আপনি আপনার দ্বিতীয় পক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন কোথায়?"

"আজ্ঞে, আমার একটু জুয়ার নেশা আছে। অন্য কিছু না। নিখাদ জুয়া। মাঝে মাঝে জিতি, মাঝে মাঝে হারি। তবে সবই লিমিটে থাকে। হাজার দশেক হারলেই আর খেলি না। কলকাতারই এক ক্লাবে আমাদের এক সান্ধ্য আসর বসত। সেই ক্লাবেরই ওয়েটার ছিল অনুরাধা। গরিব— বিধবা মা আর

boierpathshala.blogspot.com

ভাই একমাত্র সম্বল। আমার ভালো লেগে যায়। অনেকগুলো বছর একা থাকতে থাকতে খালি লাগতে শুরু করেছিল। কী জানেন, কারও স্মৃতি আঁকড়ে ধরে সারাজীবন নিঃশব্দে কাউকে ভালোবেসে যাওয়া যায়; কিন্তু জীবন কাটাতে একটা মানুষ দরকার— একটা জীবন্ত মানুষ। যার উপর জোর খাটানো যায়, কথা বলা যায়, ঝগড়া করা যায়। তাই বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে ওর বাড়ি যাই। ওর মায়ের প্রথমে একটু অমত থাকলেও ওর ভাইয়ের কথা ভেবেই বোধহয় বিয়ে করতে রাজি হয়ে যায়।"

"ওর ভাই এখন কোথায়?"

বিকাশবাবু ধীরে ধীরে বলে চললেন, "সে-ও এক মর্মান্তিক ব্যাপার। পড়তে গিয়েছিল দুর্গাপুরে কিন্তু কেন কে জানে আত্মহত্যা করে বসল। তিন বছর আগের কথা।"

সব শুনে কুন্তলাদেবী বললেন, "দেখুন, সত্যি বলতে আইনিভাবে একমাত্র আপনার শ্বশুরমশাইয়ের উইলটি নকল বলে দাবি করা ছাড়া কোনও উপায় তো দেখছি না। তারপর কেস জিতে গেলে নতুন উইল করতেই পারেন। আর না হলে উইলটি চুপচাপ নষ্ট করে ফেলতে পারেন। সেটা করাটা হয়তো নৈতিকভাবে ঠিক নয়, কিন্তু এ ছাড়া আর একমাত্র উপায় আপনার বাড়ির সবার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলা। আপনার দুই ছেলে যদি রাজি হয়ে যায়, তাহলে অনুরাধার নামে ওদের কিছু অংশ থেকে দানপত্র করে নিন। তাহলে আপনার সমস্যা মিটে যাবে।"

প্রখর রুদ্র বলে বসলেন, "আপনাকে হঠাৎ মৃত্যুভয় কেন চেপে বসছে?"

বিকাশবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "কিছুদিন যাবৎ আমার শরীর ভালো যাচ্ছে না। হঠাৎ হঠাৎই দুর্বল বোধ করি, চোখে ঝাপসা দেখি, গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা শুরু হয়েছে, মাঝে মাঝেই শরীরের তাপমাত্রা বাড়ছে আর রক্তচাপ কমে যাচ্ছে। আগের দিন তো হঠাৎ বমির সঙ্গে একটু রক্তও উঠল।"

"ডাক্তার দেখাননি?"

"ডাক্তার বলল গ্যাস্ট্রিক ফিভার। আর যক্ষ্মার পরীক্ষা করিয়েছিল। সেটাও নেগেটিভ।"

boierpathshala.blogspot.com

"কম বয়সে এর আগেও কি আপনার গ্যাসের সমস্যা ছিল? আর আপনার চুল পড়ে যাওয়া কবে থেকে শুরু হয়েছে?"

ভদ্রলোক এবার অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "এই শরীর খারাপের সময়টা থেকেই দুটোই শুরু হয়েছে। কিন্তু আপনি চুলের ব্যাপারটা..."

"স্বাভাবিক কারণে চুল পড়তে শুরু করলে কপালের আর মুখের সঙ্গে সঙ্গে মাথার চামড়াও ট্যান পড়তে শুরু করে। ফলে চামড়ার রং কপাল ও মাথার মোটামুটি একই রকমের হয়ে যায়। যখন আমরা ন্যাড়া হয়ে যাই বা হঠাৎ করেই দ্রুত চুল ঝরতে থাকে তখন কপালের চামড়া অনেক বেশি ডার্কার হয়, মাথার চামড়ার তুলনায়। আপনার ক্ষেত্রেও তাই। আচ্ছা, আপনার হাত-পায়ের চামড়া কি ধীরে ধীরে খসখসে হচ্ছে?"

বিকাশবাবু আরও চোখ বড় বড় করে বললেন, "হ্যাঁ, কেমন যেন একটা ফাটা-ফাটা।"

"বাড়িতে আর কারও এরকম হচ্ছে কি?"

"না তো। তেমন তো শুনিনি।"

প্রখর এবার সোজা হয়ে চেয়ারে বসল, "আপনি আজ ফিরে যাওয়ার সময় আর্সেনিক টেস্ট করান। আমার ধারণা যদি ঠিক হয়, এভাবে চলতে থাকলে আপনি আর পাঁচ-ছয় মাসের বেশি বাঁচবেন না, বিকাশবাবু। দুঃখিত, কিন্তু বাড়িতে আর কারও যদি এই সিমটম না থাকে আর আপনার রক্তে যদি আর্সেনিক পাওয়া যায়, তার মানে বাড়ির কেউই আপনাকে জেনে-বুঝে বিষ দিচ্ছে। স্লো পয়জনিং।"

বিকাশবাবুকে দেখে মনে হল একটু শক পেয়েছেন। কিছুক্ষণ চুপ করে বললেন, "ঠিক আছে, আমি তবে আসি। আপনারা আমার উইলের ব্যাপারটা একটু যদি তাড়াতাড়ি দেখতে পারেন, খুব ভালো হয়।"

বাইরের ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দরজার সমানে ঝুলন্ত ধাতব দণ্ডগুলো বিকাশবাবুর মাথায় লেগে মিহি শব্দে বাজতে থাকল। আর ভেতরের বসার ঘরে প্রখর রুদ্র, শিবানী আর কুন্তলা রুদ্র চুপচাপ থ মেরে বসে রইল। শিবানীই নিস্তব্ধতা ভাঙল, "এত কিছু থাকতে স্লো পয়জনিং

boierpathshala.blogspot.com

কেন? আর্সেনিক কেন?"

প্রখর রুদ্র সোজা হয়ে তাকিয়ে বলল, "অন্য বেশির ভাগ বিষেই তাৎক্ষণিক মৃত্যু বা মোটামুটি আধ ঘন্টা, এক ঘন্টার মধ্যেই মৃত্যু হয়। অস্বাভাবিক মৃত্যু হওয়ার দরুন আইনিভাবে পোস্টমর্টেম করতেই হয়। আর তাতে তো ধরা পড়বেই। কিন্তু কেউ যদি এমনিতেই বহুদিন ধরে অসুস্থ থাকতে থাকতে মারা যায়, তখন কি আর সেটা খুব অস্বাভাবিক লাগে? আর্সেনিক সেরকমই হেভি মেটাল মৌল। যার বেশি প্রয়োগে তাৎক্ষণিক মৃত্যু হয় আর লো ডোজে ধীরে ধীরে রক্তচাপ কমতে থাকে, শরীরে সব সেলেই আর্সেনিক জমতে থাকে— পেশি শিথিল হতে শুরু করে। হৃৎপেশিও। তারপর হঠাৎ করেই একদিন হৃৎপেশি অকেজো হয়ে পড়ে। সিমটম সব বাইরে থেকে দেখতে একেবারেই গ্যাস্ট্রিকের সমস্যার মতোই। এ ছাড়া চুল পড়ে যাওয়া আর চামড়া অমসৃণ হয়ে যাওয়া এক্সট্রা সিমটোম। আর্সেনিক টেস্ট ছাড়া অন্য কোনও রক্তের টেস্টে খুব সহজে ধরা পড়ে না। স্লো পয়জনিং আর্সেনিক টেস্টের জন্য সাধারণত চুল আর নখের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। রক্তের সঙ্গে ভারী আর্সেনিক আমাদের দেহের প্রান্তিকভাগগুলোতে গিয়ে জমা হয়।"

* * * * * * * *

"আজ্ঞে, আমি কি একটু কুন্তলাদেবীর সঙ্গে কথা বলতে পারি?"

"বলছি..."

"আমি বিকাশ মহাপাত্র বলছিলাম। প্রখরবাবুর অনুমান সঠিক। আমার রক্তে আর্সেনিক পাওয়া গেছে। জানি না, বাঁচব কি না, তবে যদি পারেন, অনুরাধার জন্য কিছু প্লিজ করুন। আমার এখন ভয় করছে, ওকেও না মেরে ফেলার কোনও ষড়যন্ত্র... প্রখরবাবু কি ওকে বাঁচাতে পারবেন? একবার কথা বলবেন? টাকার অভাব হবে না।"

"আরে, এভাবে বলছেন কেন! আমি সম্পত্তির ব্যাপারটা দেখব। কিন্তু এই মুহূর্তে আপনার বাড়িতে একজনের গিয়ে ব্যাপারটা দেখা দরকার।"

boierpathshala.blogspot.com

"কে আর দেখবে বলুন। ওসব ভাববেন না। আপনি অনুরাধার ব্যাপারটা ভাবুন। আমার মৃত্যু তো অবশ্যম্ভাবী।

"ঠিক আছে, আপনি থামুন। কাল আমার মেয়ে আপনাদের বাড়ি যাবে। সব খুঁটিয়ে দেখতে। কী বলে পরিচয় দেবেন, আপনার ইচ্ছে। বলবেন, ক-দিন ও ওখানেই থাকবে।"

"কিন্তু ওর যদি বিপদ-আপদ একটা কিছু হয়ে যায়! আমি আপনার কাছে মুখ দেখাব কেমন করে?"

"এসব আমি আপনার জন্য করছি না। করছি আমার বান্ধবী চারুর জন্য। আমি এখন রাখছি।" কুন্তলা রুদ্র ফোন রেখেই প্রখর রুদ্রর ঘরের দিকে পা বাড়ালেন, "দাদা, কিছু কথা ছিল।"

প্রখর রুদ্র ল্যাপটপ থেকে মুখ তুলে বলল, "বলো বউমা।"

"আপনার অনুমান সঠিক ছিল। বিকাশবাবুর রক্তে আর্সেনিক পাওয়া গেছে। ওঁর মৃত্যুর আগেই সম্পত্তির একটা সুরাহা হওয়া উচিত। আর ওঁকে কে বিষ দিল সেটাও খুঁজে বের করা দরকার। তার জন্য ওখানে গিয়ে একজনের নজর রাখা দরকার। আমরা গেলে ব্যাপারটা সবার কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই ভাবছিলাম, যদি আপনি শিবানীকে একটি বার বলেন। দুই বোন তো আপনার কথা ছাড়া শোনে না।"

"না বউমা। ও বাড়িতে সব সময় নজর রাখতে পারে এরকম একজনের যাওয়া দরকার। শিবানীর অফিস আছে। ছুটিই বা পাবে কী করে? তার থেকে ইন্দ্রাণীকে পাঠানোই বোধহয় ভালো।"

"সেই ভালো।"

"ঠিক আছে। আমি ওর সঙ্গে কথা বলে সব বুঝিয়ে দেব।"

* * * * * * *

পরদিন দুপুরে বিকাশবাবুর বাড়িতে ইন্দ্রাণীর আগমন। সবার সঙ্গে ইন্দ্রাণীর পরিচয় করিয়ে দিলেন, "ও চারুলতার ছোটবেলার বন্ধু কুন্তলা রুদ্রর মেয়ে, ইন্দ্রাণী। ও কলকাতায় ক-দিনের জন্য কাজে এসেছে। থাকে চেন্নাইতে।

boierpathshala.blogspot.com

ক-দিনের জন্য হোটেলে আর কেন থাকবে, তাই আমাদের সঙ্গেই থাকতে বললাম।" বিকাশবাবু তড়িঘড়ি আবার কাপড়ের দোকানে ফিরে গেলেন। বিকাশবাবুর ভাগনা-ভাগনি খুব বিশেষ আগ্রহ দেখাল না, 'আচ্ছা' বলে যে যার কাজে চলে গেল। অনুরাধাদেবী অবশ্য রান্নাঘরে ইন্দ্রাণীর জন্য খাবার বানাতে গেলেন। বড়ছেলেটি ইন্দ্রাণীর উপর থেকে নীচে ভালো করে বেশ কয়েকবার প্রলুব্ধ চোখে মেপে নিল, "নাইস... বেশ খাসা...।" ছোটছেলেটি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বড়দাকে বলল, "দাদা, কী হচ্ছে? উনি বাড়ির অতিথি। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

ইন্দ্রাণী প্রতাপের পিছু নিল। বুকের ভিতরটা তার এখনও শিরশির করছে— একই কামুক দৃষ্টি সে আগেও দেখেছে নীহার চৌধুরির চোখে।

পরের কিছুদিন ইন্দ্রাণী বাড়ির লোকজন ও তাদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছে। প্রতাপের কিছুটা হলেও ইন্দ্রাণীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। দুপুরের দিকটায় তার সঙ্গে কলেজ স্ট্রিট গিয়ে বই পড়ার অছিলায় বাড়ির লোকজনদের খবর নিয়েছে। আদিত্যকে যদিও ইন্দ্রাণী এড়িয়েই চলছে। তবে তার সম্পর্কে পাওয়া খবর অনুযায়ী, বাজারে আদিত্যর অনেক দেনা— প্রায় লাখ দশেক। অন্যদিকে প্রতাপ তার বইয়ের দোকানটা ছাড়াও একটা ঝাঁ-চকচকে বুক প্লাজা খুলতে চায়। তার জন্য লাখ পঁচিশ লাগবে, কিন্তু যতদিন বিকাশবাবু বেঁচে আছেন, তিনি একসঙ্গে অতগুলো টাকা একটা বইয়ের দোকানের পিছনে খরচ করতে রাজি নন। তাই প্রতাপ একটু বাবার উপরে রেগেই আছে। বেশ কয়েকবার কথা কাটাকাটিও হয়েছে। তবে কিছুদিন এ বাড়িতে থাকার পর ইন্দ্রাণীর মনে হয় বিকাশবাবুকে প্রথম দর্শনে যতটা নিরীহ মনে হয়, তিনি একেবারেই তা নন। বরং ভীষণ ডমিনেটিং মানসিকতার। ভাগনা-ভাগনিদের দয়াবশত মোটেই বাড়িতে জায়গা দেননি। ভাগনিটিকে ঘরের সব কাজে অনুরাধাদেবীকে সাহায্য করতে হয় আর ভাগনেটিকে বাজারহাট এসব করতে হয়। একটু পান থেকে চুন খসলে এ বাড়ির সবাইকেই কথা শুনতে হয়। ভাগনিটির সঙ্গে কথা বলে ইন্দ্রাণী বুঝেছে, তার দাদার কম মাইনেতে এই শহর কলকাতায় থাকতে গেলে তার কলেজের পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে

boierpathshala.blogspot.com

হবে, তাই না চাইতেও তারা এখানে পড়ে আছে। তবে তাদের সঙ্গে প্রতাপ বা আদিত্য কারওরই কোনও সংঘাত নেই। বিকাশবাবু মারা গেলে যে তাদের এ বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে, এরকম কোনও সম্ভাবনাও নেই। অনুরাধাদেবী কারওরই সাতে-পাঁচে নেই। প্রতাপের কথানুযায়ী, ভাইয়ের মৃত্যুর পর যেন উনি আরও চুপচাপ হয়ে পড়েছেন। বাড়ির বাইরে যেতে চান, কিন্তু বিকাশবাবু একপ্রকার তাকে বাড়িতে বন্দি করে রেখেছেন। কোথাও যেতে দেন না, গেলেও তিনি সঙ্গে যান। অনুরাধাদেবী একসময় ভালো নাচ করতেন। একটি নাচের স্কুলে নাচ শেখাতেন, কিন্তু বিয়ের এক বছরের মধ্যে সেটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মানে দেখতে গেলে বিকাশবাবু মারা গেলে সেই অর্থে লাভ শুধুমাত্র দুই ছেলের, বাকিরা যা একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচে আর সব থেকে অনিশ্চিত যদি কারও ভবিষ্যৎ হয়ে যায়— তাহলে সে অনুরাধাদেবী।

প্রথমদিকটায় ইন্দ্রাণী এ বাড়ির খাবার খাবে কি না ইতস্তত করছিল। তারপর বুঝল, এ বাড়ির সবাই ভালো, শুধু বিকাশবাবু ছাড়া। এমন কিছু খাবার আছে যেটা বিকাশবাবুই শুধু খাচ্ছেন কিন্তু আর কেউ খাচ্ছেন না। মাঝে বিকাশবাবুর সঙ্গে পুরো একটা দিন গিয়ে শাড়ির দোকানেও থেকেছে। কিন্তু কোথাও অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েনি। তবে এ বাড়িতে আসার দু-দিনের মধ্যেই কুন্তলাদেবী জেনেশুনে আর বিকাশবাবুর বিপদ বাড়াতে চাননি। তাই তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। যদিও বাড়ির লোকজনকে বিশদে কিছুই জানানো হয়নি, তারা জানে, গ্যাসের ব্যথা বাড়ায় হাসপাতালে ভরতি হয়েছেন। প্রথমদিকটায় অনুরাধাদেবী স্বামীকে কাছছাড়া করতে না চাইলেও, পরে ছেলেদের চাপাচাপিতে রাজি হয়েছেন। সকালের দিকটাতে উনি হাসপাতালে গিয়ে স্বামীকে দেখে আসেন আর বিকালে ছোটছেলে। বড়ছেলে যদিও তার মৌজেই আছে! এর মধ্যে ইন্দ্রাণী প্রতাপের সঙ্গে কথা বলে অনুরাধাদেবীকে বিকাশবাবুর মৃত্যুর পর দেখাশুনা করতে রাজি করিয়েছে। কিন্তু আদিত্যর সঙ্গে কীভাবে কথা বলা যায়, সেটাই সে কিছুদিন ধরে ভাবছে!

সেদিন দুপুরেও সে বসে বসে ভেবে যাচ্ছে, ঠিক কীভাবে আদিত্যর সঙ্গে

boierpathshala.blogspot.com

কথা বলা যায়। আচ্ছা, এসব আদিত্য করাচ্ছে না তো? বাবা মারা গেলে আদতে লাভটা তার সব থেকে বেশি। পাওনাদারের তাগাদা! সে আর্সেনিক পাচ্ছে কোথা থেকে? হ্যাঁ এ কথা ঠিক, বাড়িতে ব্যবহৃত অনেক জিনিসেই আর্সেনিক যৌগ ব্যবহার করা হয়, যেমন—ব্যাটারি, ওয়ালপেপার বা কীটনাশক। তার থেকে আর্সেনিক আলাদা করা তো অতটাও সহজ কাজ না। সেই তুলনায় বিকাশবাবুর ভাগনির সেই সুযোগটা অনেকটা বেশি। কেমিস্ট্রি অনার্স। ল্যাব থেকে খুব সামান্য মাত্রায় সরিয়ে নিয়ে আসা বা কোনও কিছু থেকে আর্সেনিক আলাদা করে নেওয়ার পদ্ধতি-দুটোর কোনওটাই তার পক্ষে খুব কঠিন কাজ না। কিন্তু তার মোটিভ কী? নাকি সে অন্য কাউকে সাহায্য করছে? নাকি অন্য কেউ? তার মোটিভই বা কী? তাহলে কি প্রতাপ? প্রতাপের দোকানে অনেক পুরোনো কেমিস্ট্রি আর টক্সিকোলজির বই আছে। সেসব ইন্দ্রাণী তাকে পড়তেও দেখেছে। তাহলে সে-ই কি? ইন্দ্রাণী আর ভাবতে পারে না। মাথাটা ভার হয়ে হালকা ঝিমুনি চলে আসে। হঠাৎ কলিং বেলের আওয়াজে তার ঘুম ভাঙে। বাড়িতে এখন লোক বলতে দু-জন—সে আর অনুরাধাদেবী। বকিরা তাদের যে যার কাজে বাইরে আছে। তাই ইন্দ্রাণীই উঠে দরজা খোলে। সামনে একটা পোস্টম্যান, "আজ্ঞে, একটা রেজিস্ট্রি চিঠি আছে। আদিত্য মহাপাত্রর নামে।"

"আমাকে দিন। অসুবিধা নেই। এখন বাড়িতে বেশি লোক নেই। ফিরলে যাঁর চিঠি তাঁকে দিয়ে দেব।"

"ঠিক আছে। আপনার নাম আর রিলেশনটা এখানে লিখে একটা সই করে দিন।" ইন্দ্রাণী আর কোনও কথা না বাড়িয়ে সই করে খামটা নিয়ে ঘরে ঢুকতেই, তার মনে হল খামের ভেতরে আসলে কিছু নেই। সে ভালো করে খামটা আলোর দিকে তুলে ধরে দেখল। একটা হালকা সবুজ রঙের লম্বা খাম। ভিতরে কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু মনে হচ্ছে, এপাশ থেকে ওপাশ করলে কিছু যেন সরে সরে যাচ্ছে। ইন্দ্রাণীর কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। খুব সন্তর্পণে খামটার স্টেপল করা দিকটা খুলে ফেলল। ভিতরে হাত ঢুকিয়ে টান দিতেই একটা পাতলা পলিথিনের প্যাকেট বেরিয়ে এল— সাদা কিছু গুঁড়ো ভরতি।

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

ইন্দ্রাণী আঁতকে উঠল— ড্রাগস! আদিত্যর তার মানে মদ, মেয়েমানুষ ছাড়া ড্রাগের নেশাও আছে। এটা কী ধরনের ড্রাগ জানতে হচ্ছে। ভেবেই ইন্দ্রাণী একটা জোরে টান দিতেই প্যাকেটটা ফেটে চারিদিকে মিহি সাদা গুঁড়োগুলো ছড়িয়ে পড়ে চোখে-নাকে ঢুকে গেল। এক দমকায় তার কাশি শুরু হল, মাথাটা কেমন যেন ধরে আসতে থাকল, গা-টা বমি-বমি করছে আর চোখে ঝাপসা দেখতে শুরু করেছে। পাশের চেয়ারটা ধরে দাঁড়াতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল— সঙ্গে সশব্দে চেয়ারটাও। ক্রমে তার চোখ আরও ঝাপসা আর অন্ধকার হয়ে আসছে। ঝাপসা চোখে সে শুধু দেখতে পাচ্ছে— কোনও একজন মহিলা সিঁড়ি দিয়ে ছুটে তার দিকে আসছে।

* * * * * * * *

মাথাটা এখনও ঝিমঝিম করছে, শরীরটাও দুর্বল লাগছে। হাসপাতালে ইন্দ্রাণী চোখ খুলে উঠে বসার চেষ্টা করল। একজন মধ্যবয়স্ক নার্স বলে উঠল, "আরে করো কী! তুমি উঠো না। কী বিপদ ডেকে এনেছিলে বলো দেখি। তোমার প্রায় ফুসফুস পর্যন্ত আর্সেনিক ট্রাই-অক্সাইড ডাস্ট পৌঁছে গিয়েছিল। তোমাকে Dimercaprol দেওয়া হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে ইউরিনের সঙ্গে সব আর্সেনিক বেরিয়ে যাবে। আর ঠিক সময়ে অ্যাকটিভেটেড চারকোল না দিলে আজ তোমার জীবনসংশয় হয়ে যেত। কী যে করো-না তোমরা! ল্যাবে একটু সাবধানে কাজ করবে তো!"

ইন্দ্রাণীর বুঝতে সময় লাগে— ল্যাব, আর্সেনিক! এবার বুঝতে পারে, সে যে সাদা পাউডারকে ড্রাগ বলে ভুল করেছিল, সেটা আসলে ছিল আর্সেনিক ট্রাই-অক্সাইড। তার মানে আদিত্য... কেবিনের দরজা ঠেলে অনুরাধা মহাপাত্র ঢোকেন কিছু ফল নিয়ে। নার্সটি চলে গেলে অনুরাধাদেবী ইন্দ্রাণীর কানে কাছে মুখ নিয়ে বললেন, "আর একটু হলেই পুলিশ কেস হয়ে যেত। এখানকার সিনিয়র ডাক্তার পরিচিত, তাই তুমি ল্যাবে কাজ করতে গিয়ে এই কাণ্ড ঘটিয়েছ বলে ঠান্ডা করেছি। কী যে করো তুমি! অন্যের চিঠি খোলা উচিত না, সেটা তোমার জানা উচিত।"

ইন্দ্রাণী ধীরে ধীরে বলে, "আমার এক্ষুনি একটু বিকাশবাবুর সঙ্গে কথা বলা দরকার। আপনাকে আর অন্ধকারে রাখতে চাই না। আসলে কেউ ওঁকে আর্সেনিক দিয়ে স্লো পয়জনিং করে মারতে চাইছিল। তারই তদন্ত করতে আমি এসেছিলাম। তাই ওঁকে জানানোটা দরকার।"

অনুরাধা আঁতকে উঠে মাথায় হাত দিয়ে পাশের চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন, "তুমি না আসলেই পারতে, ইন্দ্রাণী। ভাগ্যিস আজ আমি বাড়ি ছিলাম। না হলে, তোমার... উফ, আমি আর ভাবতে পারছি না। তোমার একটা কিছু হয়ে গেলে আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারতাম না।"

"নিজেকে ক্ষমা করতে পারতেন না? মানে?"

অনুরাধা মাথা নামিয়ে রেখেই বলে চললেন, "আদিত্য নয়। আমি। আমিই বিকাশবাবুকে আর্সেনিক দিচ্ছিলাম। সকালের ব্ল্যাক কফিতে হালকা একটা সুচের মাথায় যতটা ওঠে, ততটা করে মিশিয়ে দিতাম। আদিত্যর নামে নেওয়ার দুটো কারণ, যাতে আমি কোনওভাবে ধরা না পড়ি। দুপুরের দিকটায় বাড়ি কেউ থাকত না, তাই সব প্যাকেট আমি রিসিভ করতাম। দ্বিতীয়, লোকটার আমার উপর কুনজর ছিল। আজ তোমার যেমন হল, মনে মনে চাইতাম, ঠিক তেমনটা ওই পশুটার সঙ্গেও একদিন হোক। কিন্তু আজ যেটা হল, সেটা উফফফ..."

ইন্দ্রাণীর মাথার ভিতরটা কেমন যেন খালি-খালি লাগছে, "কিন্তু আপনি কেন? মানে উইলের কথা আপনি জানেন, বিকাশবাবু মারা গেলে সব থেকে ক্ষতি এই মুহূর্তে আপনার। তাহলে জেনেশুনে আপনি নিজের পায়ে কুড়ুল..."

অনুরাধা মাঝপথে ইন্দ্রাণীকে থামিয়ে কেবিনের উলটোদিকের জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বাইরের শিরীষ গাছের উপর একটা ছোট্ট পাখি এদিক থেকে ওদিকে লাফিয়ে খেলা করেছে। অনুরাধা সেদিকে দেখতে দেখতে আনমনে বললেন, "স্বাধীনতা বোঝো? নিজের মতো করে বাঁচা কাকে বলে জানো? আট বছর আগে দারিদ্র্যের চাপে ভাই আর মায়ের দায় কাঁধে নিয়ে বিয়ে করতে বাধ্য হলাম। ভাবলাম, আমার জন্য দুটো মানুষ তো বাঁচবে!

boierpathshala.blogspot.com

বিয়ের এক বছরের মধ্যেই আমার নাচের ক্লাস বন্ধ হল, বন্ধ হল আমার বাইরে বের হওয়া। একটা সোনার খাঁচায় বন্দি পাখি হয়ে পড়লাম। বিকাশবাবু আমায় খুব ভালোবাসতেন, জানো? কিন্তু বন্দি ভালোবাসা যে দম বন্ধ করে দেয়, ইন্দ্রাণী," অনুরাধা বিছানার পাশের চেয়ারটাতে এসে আবার বলতে শুরু করলেন, "মা আগেই মারা গিয়েছিল। ভাইয়ের আত্মহত্যার পর একেবারে একা হয়ে গিয়েছিলাম। সারাদিন বড় বাড়িটায় একা। একটা কথা বলার লোক নেই। যে যার কাজে ব্যস্ত আর আমি খাঁচায় বন্দি।" অনুরাধা ইন্দ্রাণীর মুখের উপর ঝুঁকে পড়লেন, "টাকাটাই কি সব? কম বয়সে আমারও তা-ই মনে হয়েছিল। কিন্তু আজকাল আর মনে হয় না। চাই না এক পয়সাও। বিকাশবাবু আমার নামের আলাদা অ্যাকাউন্টে প্রত্যেক মাসে পঞ্চাশ হাজার করে জমা করেন, যা চাই তা-ই কিনে দেন। কিন্তু এসব খেলনাতে আর যে মন ভোলে না, ইন্দ্রাণী। আমি একটু মুক্ত বাতাসে বুকভরে শ্বাস নিয়ে বাঁচতে চাই, আমি পৃথিবীটা দেখতে চাই— রাস্তায় নেমে মানুষকে জানতে চাই। অনেকবার চেষ্টা করেছি ওঁকে বলতে, পারিনি। আর কীভাবেই বা ছেড়ে যাই! বিপদের সময় তো উনিই ছিলেন। তাই এভাবে ছেড়ে যেতে একটা অপরাধবোধ কাজ করছিল। কিন্তু মুক্তিটা যে ভীষণ দরকার হয়ে পড়ছিল। না হলে আমি শেষ হয়ে যাচ্ছিলাম। তাই এ ছাড়া আমার আর কোনও উপায় ছিল না।" অনুরাধা দু-হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে।

ইন্দ্রাণী এবার আলতো করে অনুরাধার ডান হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নেয়, "আপনার কষ্টটা আমি অনুভব করতে হয়তো পারব না, কিন্তু সমস্যাটা বুঝছি। এবার আমি কিছু বলি। আমাদের জীবনে ভালো সম্পর্কগুলো নতুন করে বাঁচতে শেখায় আর খারাপ সম্পর্কগুলো কিছু অভিজ্ঞতা ছেড়ে যায় আমাদের জীবনের পথে। একটা সম্পর্ক যত ভালোভাবেই শুরু হোক, সেটা যদি বোঝার মতো ভারী হতে থাকে, তাহলে তা শেষ করে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সেই সম্পর্কের অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের সঙ্গে থাকুক, মানুষগুলো আলাদা হয়েও ভালো থাকুক; না হয় সম্পর্কগুলো আর না-ই বা থাকল। তা-ই না? তা বলে এরকম করে একটা মানুষকেই শেষ করে

boierpathshala.blogspot.com

দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ না। একটা সম্পর্ক শেষের খারাপ লাগা হয়তো দুটো মানুষের জীবনে উথাল পাথাল এনে দেবে, কিন্তু দিনের শেষে দুটো মানুষই জীবনকে নতুন করে দেখার সুযোগটা তো পাবে! আর এভাবে মানুষটাকে শেষ করে দিলে আপনি না হয় বন্দিজীবন থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন, কিন্তু অপরাধবোধ থেকে? প্রত্যেকটা দিন নিজের কাছে যখন ধরা পড়বেন, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখবেন আপনার হাতে অন্যের রক্তের দাগ; তখন কী করে বাঁচবেন! এই সম্পর্কটা থেকে হয়তো বের হতে আপনাদের দু-জনেরই অনেক সমস্যা হবে, তবে আপনার বক্তব্যই বলছে এই সম্পর্কটায় আর কিছু বাকি নেই। বেরিয়ে আসুন। চাইলে আপনাকে আমি হেল্প করতে পারি। আপনার ফোনটা?" অনুরাধা কোনও কথা না বলে ফোনটা এগিয়ে দেয়। ইন্দ্রাণী মায়ের নম্বরটা ডায়াল করে, "মা, অনেকদিন পর তোমার জন্য একটা কেস আছে। দেখো তুমি নেবে, নাকি তোমার কোনও লইয়ার বন্ধুকে ডাকবে। একটা ডিভোর্সের কেস। তাড়াতাড়ি এসো..."

অনুরাধা পরম মমতায় একটা আপেল কেটে ইন্দ্রাণীর মুখে ধরেন। ইন্দ্রাণী অল্প কামড়ে খেতে শুরু করে। অনুরাধা শাড়ির আঁচলে ভেজা চোখ লুকোয়। ইন্দ্রাণী আপেলের বাকি অংশটা মুখে নিয়ে প্রশ্ন করল, "কিন্তু আপনাকে আর্সেনিক ট্রাই-অক্সাইড কে পাঠাত?"

অনুরাধা চোখ মুছতে মুছতে বলল, "আসল নাম তো জানি না। পেপারে অ্যাড বেরিয়েছিল— 'ডার্ক হর্স, কনসালটেন্ট ক্রিমিনাল'। আমি মেল করেছিলাম। কিছুদিন পর সব প্ল্যান জানিয়ে মেল এল। বলল, পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিলে সে আগামী পাঁচ মাস পরিমাণমতো আর্সেনিক গুঁড়ো পাঠাবে। প্রত্যেক মাসের শেষ সপ্তাহে..."

ইন্দ্রাণীর গলায় আপেলটা আটকে গেল, "ফোন... ফোন..." ইন্দ্রাণী কাশতে শুরু করে। অনুরাধা মুখের সামনে জলের গ্লাস ধরেন আর ইন্দ্রাণী পাগলের মতো ঝাপসা চোখে শিবানীর নম্বর ডায়াল করতে শুরু করে।

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

অতি-চালাকের গলায় দড়ি

"তোমার তো কালেকশন ভালো। তা একটা স্কচ হবে না?"

প্রথম লোকটা উঠে গিয়ে দুটো কাচের গ্লাসে স্কচ নিয়ে আসে, সঙ্গে কিছু আইস কিউব। বসতে বসতে বলল, "এসব বলে লাভ নেই। পার্সেন্টেজ না বাড়ালে আমি আর এসবে নেই। অন্য অনেক ডিলার আছে। তুমিও জানো।"

অন্য লোকটা স্কচের গ্লাস দুটোতে বরফ দিতে দিতে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "বেশি লোভ ভালো না, জানো তো হে?"

"দেখো বাপু, সবাইকে টাকা খাইয়ে আমায় চলতে হয়। যদি শেয়ার না বাড়াও, আমার পক্ষেও সম্ভব নয়।"

"এটাই তাহলে ফাইনাল?"

প্রথম লোকটা আরও রেগে গিয়ে বলল, "একদম"। দ্বিতীয় লোকটা আর কিছু না বলে দামি স্কচের আনন্দ নিতে থাকে। হঠাৎ করেই প্রথম লোকটার হাত থেকে গ্লাসটা মেঝেতে পড়ে ভেঙে যায়, চোখগুলো ঠেলে বেরিয়ে আসতে থাকে। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গিয়ে মেঝেতে পড়ে যায়।

দ্বিতীয় লোকটা এবার মুচকি হেসে ওঠে, "আগেই বলেছিলাম, বেশি লোভ ভালো না।" সে আরও শান্তিতে বসে স্কচটা শেষ করে।

* * * * * * * *

শিবানী সেরাতে ইন্দ্রাণীর ফোন পেয়ে 'ডার্ক হর্স'-এর ই-মেল আইডি সাইবার ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দিয়েছে। কুন্তলা রুদ্র হসপিটালে গিয়ে ইন্দ্রাণীকে বাড়ি নিয়ে এসেছেন, অনুরাধার জন্য ডিভোর্স ফাইল করেছেন। যদিও বিকাশবাবু

সব শুনে এমনিতেই ডিভোর্স দিতে রাজি হয়েছেন।

পরের দিন সকালে শিবানী লালবাজারে ঢুকেই সাইবার ক্রাইম বিভাগে হানা দেয়—"গোমস, এনি নিউজ অ্যাবাউট ডার্ক হর্স?"

সাইবার ক্রাইম ডিপার্টমেন্টের স্টিফান গোমস একজন গ্রে হ্যাট হ্যাকার, কিছুদিন হল চুক্তিভিত্তিক লালবাজারে যোগ দিয়েছে। গোমস বলল, "ই-মেল আই-ডি-টা হ্যাক করে খুলেছি। এই ই-মেল আই-ডি-টা কোনও পাবলিক মেল প্রোভাইডার ডোমেন না। মানে জিমেল বা ইয়াহুর মতো কোনও সংস্থা নয়, যারা সবাইকে মেল আই-ডি দেয়। এটা একটা প্রাইভেট ডোমেনে তৈরি করা কাস্টমাইজ মেল আইডি। দুঃখের খবর হল, এই আই-ডি-টা হ্যাক করার সঙ্গে সঙ্গে যার আই-ডি, তার কাছে ডেফিনিটলি মেসেজ চলে গেছে। তাই সে আর এই আই-ডি ব্যবহার করবে বলে মনে হয় না। যদিও ব্যবহার করলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না।"

"মানে? বুঝলাম না। মেল আই-ডি যখন হ্যাক করে ফেলেছ, কোন মেশিন থেকে অ্যাকসেস হয়েছে, জানা তো যায়?"

"সেটাই বলছিলাম। ইনটেলিজেন্ট। এই মেল আই-ডি-তে মেল আসার সঙ্গে সঙ্গে আরও একশোটার মতো আই-পি অ্যাড্রেস বা ডামি ই-মেল আই-ডি-তে অটোমেটিক ফরওয়ার্ড হয়ে যায়। সেই একশোটা থেকে হয়তো আরও একশো। এভাবে যে ঠিক কতগুলো রাস্তা ঘুরে ডার্ক হর্সের কাছে মেলটি পৌঁছোয় তা খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভবই লাগছে। আমি চাইলে নেটওয়ার্ক ক্রলার প্রোগাম লিখতে পারি, যাতে এই পুরো রাস্তাটা ট্র্যাক করে আমাদের পুরো লিস্ট দিতে পারে, কোন কোন মেশিন হয়ে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে শেষ হচ্ছে। কিন্তু তাতেও একটা সমস্যা আছে। এই যে পুরো প্রসেসটা বললাম, সেটা হতে সময় লাগে দশ থেকে পনেরো সেকেন্ড। তারপরই ওইসব ডামি মেশিনগুলোর আর কোনও অস্তিত্ব থাকে না। প্রক্সি মেশিনগুলো ওই দশ সেকেন্ডের মধ্যে ট্র্যাক করতে না পারলে, তারপর আর কিছুই পাওয়া যাবে না। আর এইসব প্রক্সি মেশিন সারা পৃথিবীর বিভিন্ন বিভিন্ন জিয়োগ্রাফিক লোকেশন দেখায়। আর আমার মনে হয় না, আপনি যে মেল

boierpathshala.blogspot.com

আই-ডি-টি দিয়েছেন, সেটি ডার্ক হর্স নিজে কোনওদিন খুলেও দেখেছে! কারণ, সব ক-টা মেলই আনরেড অবস্থায় ছিল। এইসব পথ ঘুরে তার পারসোনাল মেল বক্সে যখন পৌঁছোত, সেখানেই দেখত। আর আমার অভিজ্ঞতা বলছে, তার এই পারসোনাল মেল বক্সটি তার নিজের ল্যাপটপ বা ফোনেই সেটআপ করা। যে এত সতর্কতা বজায় রাখে, সে কোনওদিনই পাবলিক ডোমেনে এইসব মেল রাখতে চাইবে না।"

"সব বুঝলাম। কিন্তু উপায় কী? শহরে একের পর এক অপরাধে এর উৎকৃষ্ট মগজটি যে পুষ্টি জোগাচ্ছে।"

"আমার দিক থেকে আমি এই মেল আই-ডি-টির উপর নজর রাখতে পারি। আর চেষ্টা করছি যদি এমন ক্রলার প্রোগাম লেখা যায়, যাতে ওই দশ সেকেন্ডে পুরো নেটওয়ার্ক ট্র্যাফিককেই রেকর্ড করা যায়। কিন্তু বার বার মেল আই-ডি-টি হ্যাক করলে কিন্তু ডার্ক হর্স সতর্ক হবেই। তখন হয়তো আর ধরা যাবে না।"

"তাহলে তুমি আগে একটা ফুলপ্রুফ প্ল্যান করো। তারপর মেল আই-ডি আবার হ্যাক করো, তার আগে না।"

শিবানী নিজের ঘরে ঢুকতে যেতেই দেখল বস প্রদোষ চ্যাটার্জি তাঁর কেবিনের বাইরে থেকে হাত নেড়ে ডাকছেন। শিবানী কেবিনে ঢুকতেই একটা লাল ফাইল ছুড়ে দিল, "একটা হাইলি মিস্টেরিয়াস কেস এসেছে। তিন দিন ধরে কোনও প্রোগ্রেস নেই, প্রায় ডেড এন্ড। দেখো যদি কিছু করতে পারো।"

"ব্রিফ?"

"আ... ব্রিফ বলতে, ভদ্রলোক থাকতেন লোয়ার সার্কুলার রোডের একটি ফ্ল্যাটে। নাম– অশোক সাহানি। বয়স–৩২। পেশা– বারটেন্ডার। ঘরের মধ্যে দরজা ভিতর থেকে লক্‌ড অবস্থায় পাওয়া যায়। সকালে কাজের মেয়েটি অনেক ডেকেও না পেয়ে, দারোয়ানকে দিয়ে দরজা ভেঙে দেখা যায়— ভদ্রলোক মরে পড়ে আছেন মেঝেতে। কুঁকড়ে পড়ে ছিলেন, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এসেছিল। অটোপ্সি রিপোর্ট বলছে, স্ট্রিকনিন, বলা যায় দ্য মোস্ট পিয়োর ফর্ম অফ স্ট্রিকনিন। স্ট্রিকনিনে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যেহেতু রাইগার

boierpathshala.blogspot.com

মর্টিস শুরু হয়ে যায়, তাই মৃত্যুর সময়টা নিয়ে একটু ধন্দ থেকেই যাচ্ছে। হাতের স্মার্ট ওয়াচটিতে রাত ১২টার পর আর কোনও হার্টরেট কাউন্ট হয়নি। আর ১১টা ৪৫ নাগাদ হার্টরেট খুব বেড়ে গিয়েছিল। সেই হিসেব অনুযায়ী দেখতে গেলে ওই ১১:৪৫ থেকে ১২টাই ধরো। তবে খুন নাকি আত্মহত্যা, সেটাই পরিষ্কার নয়। স্ট্রিকনিনের ট্রেস পাওয়া যায় খাবারে। টেবিলে আধখাওয়া ডিনার পড়ে ছিল। সন্দেহের বশে কাজের মেয়ে রূপাকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করলেও তেমন কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। যদি ধুতরার ফল-টল পাওয়া যেত তা-ও হয়তো রূপাকে আরও কড়া জেরা করা যেত। স্ট্রিকনিনের মতো বিষ সিন্থেসাইজ করা, পিয়োর ফর্মে পাওয়াও মুখের কথা না।"

"আমি তো শুনেছি অনেক স্ট্রিট ড্রাগ যেমন LSD– heroin– and cocaine-এর অনেক সময় কম মাত্রায় মেশানো হয় নেশা বাড়ানোর জন্য।"

"ঠিক জানো হে শিবানী। আমার চিন্তাটা ঠিক সেখানেই। গত মাস ছয়েক ধরেই বাংলাদেশ বর্ডার থেকে মাদকদ্রব্য ভারতে ঢুকছে। নারকোটিক বিভাগ পাহারা বসিয়েও কোনও লাভ হচ্ছে না। কিছু ছোটখাটো মাদকাসক্ত আর পাচারকারীকে ধরেছে ওরা। কিন্তু কোনও রাঘববোয়াল এখনও ধরা পড়েনি। সাহানির বাড়িতে কোনও ড্রাগ পাওয়া যায়নি ঠিকই, কিন্তু একটা খালি আলমারির থেকে অল্প হলেও LSD-র ট্রেস পাওয়া গেছে। সেইজন্যই আমি চাই, এটার একটা সমাধান অবশ্যই হোক। কে জানে, হয়তো ড্রাগ র‍্যাকেটের কোনও রাঘববোয়াল ধরা পড়বে!"

"ও.কে. স্যার। আমাকে ক-টা দিন স্টাডি করার সময় দিন।" শিবানী স্যালুট করে উঠে পড়ে।

"গুড লাক, শিবানী।"

* * * * * * *

সেদিন দুপুরেই শিবানী অশোকের ফ্ল্যাটে ঢুঁ মারল। খুনের দিন থেকেই ফ্ল্যাট সিল করা ছিল। গিয়ে আরও একবার ভালো করে দেখে কতকগুলো খটকা মনের মধ্যে উঁকি দিতে লাগল। ফ্ল্যাটের মেন গেটের সামনে একটা সিসিটিভি

boierpathshala.blogspot.com

2021/5/8
boierpathshala.blogspot.com

ক্যামেরা থাকলেও, ভিতরে কোথাও নেই। আর সেটাই সব থেকে বড় সমস্যা এই কেসের। ওয়াচম্যান যদিও রেজিস্টারে যেসব বাইরের লোক সেদিন অ্যাপার্টমেন্টের ভিতরে গিয়েছিল, তাদের সব তালিকা দেখাল। কোন ফ্ল্যাটে কখন কে এসেছিল, তার সব ডিটেলস আছে। সিসিটিভি-র ফুটেজ যদিও আগে থেকেই সিডি-তে করে ফাইলের মধ্যেই ছিল। অশোকের বাড়ির কাজের লোক রূপার সঙ্গে কথা বলে শিবানীর খটকাটা আরও বাড়ল বই কমল না। একবার ব্যাপারটা নিয়ে জেঠুমণির সঙ্গে আলোচনা করতেই হচ্ছে।

সন্ধেবেলা ফিরেই শিবানী সোজা জেঠুমণি প্রখর রুদ্রর ঘরে ঢুকে গেল, "একটা কেস আছে। বেশ কিছুটা অদ্ভুতই বলা চলে। শুনবে?"

"আগে শুনি অদ্ভুত কেন, তারপর? আর আমার ফিজ কই?"

শিবানী হাসি-হাসি মুখ করে পকেট থেকে একটা ডার্ক চকোলেটের প্যাকেট টেবিলে রাখল, "অদ্ভুত এই কারণেই, ঘরের ভিতরে স্ট্রিকনিন বিষে মৃত্যু হয়েছে অশোক সাহানির। দরজার লক ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। কিন্তু আজকে ফ্ল্যাটটা দেখার পর মনে হচ্ছে, হয়তো আরও কেউ ছিল। কিন্তু সেটা যে খুনের সময়ে নাকি খুনের অনেক আগে সন্ধের দিকে, সেটাই বুঝছি না।"

"ইন্টারেস্টিং। দরজার লকটাই কি শুধু ভিতর থেকে লক করা ছিল? নাকি ভিতরের দিকের ছিটকিনিও বন্ধ ছিল?"

"শুধু লকটাই বন্ধ ছিল। ভিতরের ছিটকিনি বন্ধ ছিল না।"

প্রখর রুদ্র এক টুকরো চকোলেট মুখে পুরে দিয়ে বললেন, "ওঁর ফ্ল্যাটে সেদিন কে কে এসেছিল, তার কিছু তালিকা পাওয়া গেল?"

"রেজিস্টারে ওইদিন অশোকের ফ্ল্যাটের কোনও এন্ট্রিই নেই। বাইরে থেকে কেউ এলে ওয়াচম্যান তাকে দিয়ে রেজিস্টার করিয়ে নেয়। আমার কী মনে হয় জানো, হয়তো ভিতরের কেউ..."

জেঠুমণি থামিয়ে দিয়ে বলল, "আগে আমাদের হাতে কী কী আছে বল। কনক্লুশনে পরে পৌঁছোনো যাবে।"

"বিষটা ছিল ডিনারের ভাত আর মাছে। পিয়োর ফর্ম অফ স্ট্রিকনিন..."

প্রখর রুদ্র মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল, "অশোকবাবুর আনুমানিক ওজন

কত হবে?"

শিবানী একটু হতচকিয়ে গিয়ে বলল, "কেন?" পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা দেখে বলল, "আশির কাছাকাছি।"

"একজন আশি কেজির মানুষকে মারতে হলে প্রায় ৪০০ মিলিগ্রাম স্ট্রিকনিন দেহে যাওয়া প্রয়োজন। আর একজনের ভাত-তরকারির ওজন মোটে না হলেও ২৫০-৩০০ গ্রাম। মানে তরকারিতে যথেষ্ট পরিমাণ স্ট্রিকনিন না মেশালে বডিতে ৪০০ মিলিগ্রাম বিষ যাওয়া সহজ ব্যাপার না। যদি না সে পুরো খাবারটাই খাচ্ছে। অথচ রিপোর্টে বলছে, খাবার প্রায় সবটাই ছিল। হিসেব মিলছে না রে। একমুঠো ভাতে যদি ৪০০ মিলিগ্রাম বিষ যেতে হয় তাহলে পুরো খাবারে অনেকটাই বিষ মিশাতে হবে।"

শিবানী একটু অধৈর্য হয়ে বলল, "তাতে কী? হয়তো বেশি স্ট্রিকনিন মেশানো ছিল।"

ইন্দ্রাণী সন্ধেবেলা চায়ের কাপ নিয়ে জেঠুর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, "নাক্স ভোম খেয়েছিস?"

শিবানী পিছন ফিরে বলে উঠল, "মানে?" প্রখর রুদ্র মুচকি হেসে মাথা নাড়ল।

ইন্দ্রাণী এবার সোফায় বসে খবরের কাগজটার দিকে দেখতে দেখতে আলগোছে উত্তর দিল, "নাক্স ভোম ওষুধ যে গাছ থেকে তৈরি হয় তার বিজ্ঞানসম্মত নাম হল Strychnos Nux-vomica। বেসিক্যালি স্ট্রিকনিন হল এই গাছের বীজ থেকে পাওয়া, যাকে সিন্থেসাইজ করে ডাইলুট ফর্মে নাক্স ভোম ওষুধ তৈরি হয়। অত ডাইলুট ফর্মেই এত তেতো স্বাদের হয়, আর তোর মনে হয়, পিয়োর ফর্মে একটা লোক ভাতের সঙ্গে মুখে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবে না? মুখে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও থু থু করে ফেলে দেবে। গেলা অনেক দূরের কথা। আর স্ট্রিকনিন যতক্ষণ না রক্তের সঙ্গে মিশছে, ততক্ষণ মৃত্যু হয় না। তাই ডিনারের সঙ্গে ছিল, এই সম্ভাবনাটা খুব কষ্টকল্পনা, এক যদি ভদ্রলোকের জিভ জন্মগতভাবে অকেজো না হয়।"

শিবানী একটু চিন্তায় পড়ে গেল, "তাহলে?"

boierpathshala.blogspot.com

2021/5

boierpathshala.blogspot.com

প্রখর রুদ্র একটু ভেবে বলল, "এমন কিছু, যার উগ্র গন্ধ স্ট্রিকনিনের হালকা কারিপাতার গন্ধকে ঢেকে দেয়। এমন কিছু, যার ঝাঁজালো স্বাদ আর গন্ধ কিছুক্ষণের জন্য হলেও জিভের স্বাদকোরকগুলিকে স্তিমিত করে দেয়। এমন কিছু, যা আমরা পরিমাণে কম খাই কিন্তু প্রায় পুরোটা একবারেই খাই। তাহলে আর বেশি স্ট্রিকনিন মেশানোর প্রয়োজনও পড়ে না।"

শিবানী এবার ব্যাগের থেকে একটা এয়ারটাইট প্যাকেটে একটা ভাঙা কাচের টুকরো বের করে টেবিলের উপরে রেখে বলল, "আজ আরও একবার অশোকের ফ্ল্যাটে ভালো করে দেখতে গিয়ে একটা বুকশেলফের নীচে থেকে এটা পেলাম। অথচ মজার ব্যাপার রূপা বলল, গত এক মাসের মধ্যে ও ঘরে কোনও কাচের জিনিস ভেঙেছে বলে সে মনে করতে পারে না। অশোক নিজে ঘর পরিষ্কার করত না। তাই যদি রূপার অবর্তমানে কাচের কিছু ভেঙেও থাকে, বাকি টুকরোগুলো কোথায় গেল! ডাস্টবিনেও আর যা-ই থাক, কাচ ছিল না।"

প্রখর রুদ্র ভালো করে কাচটা দেখে বলল, "এটা তো দেখে কোনও ড্রিঙ্কিং গ্লাস সেটের একটার ভাঙা টুকরোই মনে হচ্ছে। এরকম সেট চার, ছয় বা আটটার সেটে হয়।"

শিবানী মাথা নেড়ে বলল, "আরও একটা ব্যাপার। কাচের সেন্টার টেবিলটা দেখতে গিয়ে দেখলাম টেবিলের উপর দুটো গোল গোল দাগ। মানে ওই ভেজা গ্লাস রাখার পর শুকিয়ে গিয়ে যেমন দাগ হয় না? সেরকমই। এখন ব্যাপার হল, অশোক যদি ঘরে একাই থাকেন, তাহলে দুটো গ্লাস কেন ব্যবহার করেছিলেন? একটা গ্লাস যদি ভেঙে থাকে, তাহলে অন্যটা কোথায় খুঁজতে খুঁজতে দেখলাম, অশোকের বসার ঘরের মিনিবারের মতো জায়গায় একটা সিঙ্ক আছে। সেখানে জলের মধ্যে তিনটে গ্লাস ডোবানো আছে। রূপার বয়ান অনুযায়ী বারগ্লাসগুলি অশোকের খুব প্রিয় ছিল, সেগুলো তাই সে নিজেই ধুত। রূপার মানা ছিল। অশোকের খুনের আগে, রাতে যাওয়ার সময় সে সিঙ্কে দুটো গ্লাস দেখেছিল। সন্ধেবেলা আটটার দিকে পাশের ফ্ল্যাটের মিস্টার দাশগুপ্ত এসেছিলেন, তখন অশোকের সঙ্গে পানাহার করেছেন। তিনি স্বীকারও

করেছেন। তবে তৃতীয় গ্লাসটা কার জন্য, সেটা যদিও রূপা বলতে পারেনি।"

এবার ইন্দ্রাণী তড়াক করে সোফায় উঠে বসে বলল, "তুই কি গ্লাসগুলো জল থেকে তুলে নিয়ে চলে এসেছিস?"

শিবানী বলল, "না। লালবাজারে ফোন করে ফরেনসিক টিম ডেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট চেক করতে বললাম। জাস্ট একটা চান্স নেওয়া আর কী। অ্যান্ড ইট ওয়ার্কড।"

"যাক। তুইও যদি ভাবতিস, আর পাঁচটা লোকের মতো জলে ডুবিয়ে দিলেই ফিঙ্গারপ্রিন্ট আর থাকে না, তাহলে সর্বনাশের মাথায় বাড়ি!"

"এতটাও মূর্খ ভাবিস না। জানি, তুই জেঠুর গুড স্টুডেন্ট, আমি অতটা নই। তা-ও এটুকু জানি, SPR Method। মলিবডেনাম ডাই-সালফাইট রিএজেন্ট।"

ইন্দ্রাণী সোফায় হতাশ হয়ে শুয়ে পড়ল, "জিঙ্ক কার্বোনেট হলে তোদের কম টাকায় হত। যা-ই হোক, সরকার যখন টাকা দিচ্ছে, ওড়াতে আর অসুবিধা কোথায়!"

শিবানী রেগে গিয়ে বলল, "ভালো হয়েছে, আমার এসব ভালো লাগে না। সব সময় আমার অফিসকে ছোট দেখানো! তুই গিয়ে কাজ করে দেখাস! বড় বড় ভাষণ!"

প্রখর রুদ্র বলল, "তোরা থামবি? শিবানী, তুই বল। আর কী খটকা পেলি?"

শিবানী একটু ব্যাজার মুখে বলল, "আর কী! বসার ঘরে দেখলাম ফেংশুয়ের তিন ঠ্যাংওয়ালা একটা ব্যাং দরজার দিকে মুখ করে রাখা।"

ইন্দ্রাণী হি হি করে হেসে উঠে বলল, "তাতে কী?"

শিবানী এবার খুব প্রসন্নচিত্তে বলল, "এইজন্যই কাউকে ছোট করা উচিত না। ফেংশুইয়ের তিন পা-ওয়ালা ব্যাং দরজার দিকে না, উলটোদিকে মুখ করে থাকে। যারা চীনা বাস্তুশাস্ত্র মানে, তারা এ ভুলটা করবে না। রূপাও বলল, অশোক এসব খুব মানত। ঘর পরিষ্কারের সময় জিনিসের একটু দিক পরিবর্তন হলেই অশোক রাগারাগি করত। রূপাও বলল, ওই ব্যাংটা সব সময় দরজার

boierpathshala.blogspot.com

উলটোদিকেই মুখ করে থাকত। খুনের দিন সকালেও আনমনে রূপা একজন কনস্টেবলকে বলেছিল। কিন্তু সে বোধহয় ব্যাপারটা অতটা পাত্তা দেয়নি।"

প্রখর রুদ্র শান্তকণ্ঠে বলল, "এবার বোধহয় দুইয়ে দুইয়ে চার হচ্ছে। তুই বললি, ঘরের একটা ক্যাবিনেটে কিছু ড্রাগের ট্রেস পাওয়া গেছে। হয়তো খুনি ওই ড্রাগগুলোকে হাতাতেই এসেছিল। ঘরময় এলোপাথাড়ি খুঁজলে আত্মহত্যা দেখানোটা সম্ভব হত না। তাই অশোককে খুন করে, খুব শান্তভাবে সব জায়গা গুছিয়ে খুঁজেছে। ধৈর্য আছে বলতে হবে! শুধু সমস্যায় ফেলে দিলো একটা ব্যাং, ভাঙা গ্লাসের টুকরো।" একটু আনমনে বলে উঠল, "বললি, ঘর ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। তা চাবিটা কি ঘরের ভিতরে পেয়েছিস?"

"না না। তন্ন তন্ন করে খুঁজে সেদিনও মেন ডোরের চাবিটা পাওয়া যায়নি, আজও পাওয়া যায়নি। চাবির গোছাটা পুরোটাই আছে, রূপা দেখে বলেছে। শুধু ওই চাবিটাই নেই।"

ইন্দ্রাণী যথারীতি গা-ছাড়া ভাবেই উত্তর দিল, "একটা জিনিস পাক্কা— কেউ ফ্ল্যাটে এসেছিল। কে এসেছিল, সেটা জানার জন্য বাকি ফ্ল্যাটগুলোর সঙ্গে রেজিস্টার মিলিয়ে দেখ। এর মধ্যে একজন থাকবে, যে অশোকের ফ্ল্যাটে গিয়েছিল কিন্তু রেজিস্টারে অন্য কোনও ফ্ল্যাটের নাম লিখে থাকবে। তাকে আইডেন্টিফাই করাটা আগে প্রয়োজন। দ্বিতীয় কথা হল, এটা আত্মহত্যা তো লাগছে না। যে বাজার খুঁজে স্ট্রিকনিন আনছে, তার এটা জানাটা খুব প্রাসঙ্গিক যে এই বিষ দেহে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব মাস্‌লে একটা ভীষণরকম Contraction হয়, হাতের, পায়ের আঙুল স্টিফ হয়ে যায়; যতক্ষণ না মারা যাচ্ছে, এক অসম্ভব যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। প্রশ্ন হল হাতের কাছে আত্মহত্যা করার মতো সহজ সব উপায় থাকতে কষ্ট করে স্ট্রিকনিন জোগাড় করেই বা মরতে যাবে কেন! নিজেকে কষ্ট দেওয়ার কোনও বিশেষ কারণ?"

* * * * * * * *

শিবানী পরদিন দুপুরে বাড়িতে উত্তেজিতভাবে ফোন করে বলতে শুরু করল, "জেঠু তুমি ঠিক বলেছিলে। ডিনারে স্ট্রিকনিন ছিল ঠিকই, কিন্তু পোস্টমর্টেম

boierpathshala.blogspot.com

রিপোর্টে পরিষ্কার বলা আছে, পাকস্থলীতে কোনও আন-ডাইজেস্টিভ ভাত বা মাছ কিছুই ছিল না। শুধু অ্যালকোহলের ট্রেস পাওয়া গেছে। হাউ ফুল উই আর! কাল থেকে ডিনারের টক্সিকোলজি টেস্টের রেজাল্ট দেখেই আমরা ভেবে নিয়েছিলাম, রাতের খাবারের বিষেই অশোকের মৃত্যু হয়েছে। আগেই একবার অটোপ্সি রিপোর্টের সঙ্গে ক্রস ভেরিফাই করা উচিত ছিল! এখন মনে হচ্ছে, সন্দেহটা রূপার দিকে ঘোরানোর জন্যই ডিনারে বিষ মেশানো হয়েছিল। কিন্তু আসল বিষ অ্যালকোহলে ছিল মনে হচ্ছে। কারণ ভাঙা গ্লাসের টুকরোটাতেও স্ট্রিকনিনের ট্রেস পাওয়া গেছে।"

প্রখর রুদ্র এবার ঠান্ডা স্বরে বলে উঠল—"রহো ধৈর্যং! ফোকাস হারাস না উত্তেজনায়। দেখ, ওয়াইন আর বিয়ার হওয়ার চান্স কম। ওয়াইনের স্বাদ মিষ্টির দিকেই তাই স্ট্রিকনিন মেশানো তো যায়ই, কিন্তু ধরা পড়া ইজি। বিয়ারের তেমন ঝাঁজালো স্বাদ নয় যে জিভের স্বাদকোরকগুলিকে কিছুক্ষণের জন্য স্তিমিত করতে পারবে। ইট মাস্ট বি সাম টাইপ অফ হুইস্কি!"

শিবানী এবার আরও উত্তেজিত হয়ে বলল, "ওই টুকরোটাতে স্কচের ট্রেস পাওয়া গেছে। সো ইউ আর রাইট। আমি সিসিটিভি-র ফুটেজ আর রেজিস্টার মিলিয়ে সব ক-টা ফ্ল্যাটে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। সব ঠিক আছে, শুধু একটা পিৎজা ডেলিভারি বয় রেজিস্টারে লিখেছে— G-267 ফ্ল্যাটে যাচ্ছে, কিন্তু ওই ফ্ল্যাটের দাসবাবু বলছেন ওই দিন তারা কোনও পিৎজা অর্ডার করেননি। পাশের সব ক-টা পিৎজা আউটলেটে খোঁজখবর করেছি, সেদিন তাদের রেকর্ডেও G-267 ফ্ল্যাট থেকে কোনও অর্ডার আসেনি। কিন্তু টুপি পরে থাকায় লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে না। শুধু অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকা আর বেরোনোর সময়ই দেখা যাচ্ছে।"

"লোকটার সঙ্গে কি পিৎজা ডেলিভারি করার ওই বড় বড় চৌকো টাইপ ব্যাগ ছিল?"

"হ্যাঁ তো। কেন?"

"পারফেক্ট! একটা সম্ভাবনা তো দেখাই যাচ্ছে। অশোকের ঘর থেকে ড্রাগ সবার চোখ লুকিয়ে নিয়ে যেতে ওরকম একটা ঢাউস ব্যাগই দরকার। এবং

boierpathshala.blogspot.com

2021/5/8

boierpathshala.blogspot.com

কেউ কোনও সন্দেহও করবে না। মনে হচ্ছে এই লোকটাই তোদের সাসপেক্ট। লেগে পড়।"

শিবানী এবার হতাশ স্বরে বলে উঠল, "সেটাই সমস্যা। যে স্কুটারে এসেছিল, তার নম্বর ফেক। বাইরে আর কোনও সিসিটিভি নেই, কীভাবে ফলো করব বুঝছি না। যদিও ওই এলাকার আমাদের খোঁচড়দের অ্যালার্ট করে দিয়েছি, দেখা যাক। রাখছি এখন।"

শিবানী ফোন রাখতেই মোবাইলে একটা ফোন আসে, "ম্যাইডামজি, আমি রাজু খাবরি বোলতা। ওই সার্কুলার রোড কা মার্ডার কা এক টিপ থা!"

শিবানী উত্তেজিত হয়ে বলল, "কী?"

"জি, ও এক সোনেকা নয়া দুকান খুলা হ্যায়। লাস্ট উইক। উসকে বাহার এক সিসিটিভি হ্যায়। ম্যায় পাতা লগায়া ও রাত কো অন রহতা হ্যায়। অউর উস রাতকো ভি থা। ওর ও অশোক বারটেন্ডার ড্রাগস সাপ্লাই করতা থা। অপনে বারসে।"

"থ্যাঙ্ক ইউ রাজু।"

* * * * * * * *

রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে। শেখর রুদ্র শিবানীকে ফোন করলেন, "কী রে কখন থেকে ফোনটা বাজছে! প্রত্যেকবার দীপক ধরে বলছে ম্যাডাম বিজি। কখন ফিরবি?"

"আ... আ... তুমি তো জানোই সব। গত পাঁচ ঘণ্টা ধরে লোকটাকে জেরা করছি। লোকটা ভাঙছে, তবু মচকাচ্ছে না। আর তুমিও জানো, এই সময় ছেড়ে চলে যাওয়া মানে লোকটার স্নায়বিক চাপ কমে যাবে। মিথ্যে কথাগুলো সাজাতে সময় দিয়ে দেওয়া। আমি আজ রাতেই এই কেসটা ক্লোজ করে ফিরব। যত রাতই হোক। তুমি ভেবো না।"

"ও. কে., ঠিক আছে। আমি দীপককে বলে এসেছি। রাতে ফেরার সময় গাড়িতে তুই একটু রেস্ট করে নিস। ও ড্রাইভ করবে। এত রাতে তুই আর ড্রাইভ করিস না।"

"ওসব ছাড়ো। তোমরা শুয়ে পড়ো। আমার চা-টা শেষ। আর-এক রাউন্ড শুরু করব জেরা। এবার সব এভিডেন্স সামনে রাখব। দেখি কী মিথ্যে বলে এবার।" শিবানী ফোনটা রেখে ইন্টারোগেশন রুমের দিকে পা বাড়াল।

একটা লোক চেয়ারের উপর উশকোখুশকো চুলে মাথা নিচু করে বসে আছে। লোকটার হাত দুটো চেয়ারের পিছনে টাইট করে বাঁধা। ঝিমুনি এলেই কনস্টেবল কানু লোকটার চোখে হাই ভোল্টেজ বাল্বের আলো ফেলে তার চোখ ঝলসে দিচ্ছে। লোকটা ছটফটিয়ে উঠে আবার স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে।

শিবানী ঘরে ঢুকেই টেবিলের উলটোদিকে এসে বসে, তার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে, "আপনি এর আগে আমাদের সাহায্য করেছিলেন বলে, এখনও আপনার গায়ে হাত তুলিনি। এখনও সময় আছে। আপনি আপনার অপরাধ স্বীকার করে নিলে আমি চেষ্টা করব যাতে আপনার শাস্তি কমানো যায়।"

লোকটা খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে, "ডু ইউ থিঙ্ক আই অ্যাম আ ফুল? আর কী অপরাধ স্বীকার করব? আমি কিছুই করিনি।"

শিবানী ঠান্ডা গলায় বলে ওঠে, "আপনার প্ল্যান সবই ঠিক ছিল। শুধু আপনাকে ধরিয়ে দিল রাস্তার মোড়ের নতুন-হওয়া জুয়েলারি দোকানটা। তার সিসিটিভি-তে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, আপনি আপনার মিনিবাসের মতো লম্বা গাড়িটাতে সঙ্গে আনা স্কুটারটা তুললেন আর ড্রেস চেঞ্জ করলেন।"

লোকটার একটু চোখ কুঁচকে যায়, "আমি মোটেই ড্রেস চেঞ্জ করিনি। তা ছাড়া আমার মাথায় টুপি ছিল। আমার মুখ দেখা যেতেই পারে না!"

শিবানী এবার মুচকি হেসে উঠল, "তার মানে আপনি স্বীকার করলেন, ও-রাতে ওখানে আপনিই ছিলেন।" লোকটার দৃষ্টি চকিতে সতর্ক হয়ে উঠল। শিবানী টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ল, "আপনি একদম ঠিক। আপনার মুখ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু আপনার গাড়িটা যে চেনা। তাই আমিও হাল ছাড়িনি। কিন্তু আপনার ভাগ্য হাল ছাড়ল। এত ভালো একটা প্ল্যান বানালেন আর বের হওয়ার আগে গাড়ির পেট্রোলটা চেক করলেন না! ওই রাতে পেট্রোল পাম্পে না গেলে হয়তো কোথাও আপনার মুখ দেখা যেত না।"

লোকটা এবার হতাশ হয়ে একটু ছটফটিয়ে উঠল, "হাঃ! হ্যাঁ আমি

boierpathshala.blogspot.com

গিয়েছিলাম পেট্রোল পাম্পে। তাতে এটা প্রমাণ হয় না, আমি অশোককে খুন করেছি।" লোকটা হেসে উঠল।

"আপনার গাড়ির ড্যাশবোর্ডে অশোকের মেন ডোরের চাবি আর স্কচের গ্লাসে আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট বোধহয় সেটা কোর্টে প্রমাণ করে দেবে, আমাদের আলাদা করে কিছু করার দরকার নেই। আমার টিম গিয়ে আপনার গাড়ি চেক করেছে, চাবি পেয়েছে। আপনার বাড়ি তল্লাশ চলছে। আশা করছি, ড্রাগও পেয়ে যাব!"

লোকটার চোখ দুটো হতাশ হলেও চোয়াল আরও শক্ত হয়ে ওঠে, "হতেই পারে না। ফিঙ্গারপ্রিন্ট! গ্লাসটা চালাক লোকেরা মুছেই জলে রাখবে। আর জলে ধুয়েই হয়তো রাখবে।"

"হ্যাঁ, 'অতিচালাকের গলায় দড়ি'। চালাক? মানে আপনি তো? আপনি চেষ্টা ঠিকই করেছিলেন। কিন্তু সমস্যা হল গিয়ে ফিঙ্গারপ্রিন্ট তো আর অত সহজে খালি চোখে দেখা যায় না। তাই আপনি আপনার চার আঙুলের দাগ মুছে ফেলেছিলেন ঠিকই কিন্তু বুড়ো আঙুলের ছাপটা রয়ে গিয়েছিল। বুদ্ধি করে যদি জল থেকে তুলে গ্লাসটা পুরোটা মুছে রেখে আসতেন! ইস! কিন্তু কী করবেন বলুন, তখন তো আপনার অনেক তাড়া। তাড়াতাড়ি ড্রাগের ব্যাগটা খুঁজে বের করার তাড়া। আর তাতেই ভুল করে বসলেন। মেঝেতে অশোকের গ্লাসের ভাঙা টুকরোগুলো পরিষ্কার করে তুলে সঙ্গে নিয়ে নিলেন, যাতে স্ট্রিকনিন কীসে ছিল, ধরা কঠিন হয়ে পড়ে। তবে একটা টুকরো মিস করলেন— বুকশেলফের নিচে থেকে গিয়েছিল। তবে আপনিও জানতেন, পোস্টমর্টেমে বিষ ধরা পড়বেই, তাই পুলিশকে ধোঁকা দিতে, ভাত-মাছ বেড়ে তাতে স্ট্রিকনিন ছড়িয়ে এলেন। যাতে খুনের অ্যাঙ্গল এলেও রূপা ধরা পড়ে। কী তা-ই তো? বলুন বলুন।"

"আপনি যা বলছেন, শুনতে ভালো লাগছে। কিন্তু কোর্টে এতসব প্রমাণ করবেন কী করে? তার থেকে একটা গল্প শুনুন..."

শিবানী এবার রাগে উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলে একটা ঘুসি চালিয়ে লোকটার কলার ধরে টেবিলের উপর নিয়ে আছড়ে ফেলল—"নো মোর স্টোরি,

boierpathshala.blogspot.com

মিস্টার প্রতীক সরকার। তারাপীঠে আমার বোনকে গল্প শুনিয়ে বোকা বানাতে পারো, আমায় না! আজ সারাদিন আমার টিম তোমার সব ডিটেল জোগাড় করেছে। তোমার কোনওকালেই কোনও বোন ছিল না। একটা ভাই ছিল— সে-ও চোদ্দো বছর আগে নিখোঁজ। তোকে একটা চান্স দিচ্ছি। এরপর আর চান্স পাবি না! কোর্টে তোকে দোষী প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ওয়াচম্যানও তোর ছবি দেখে আইডেন্টিফাই করেছে। তাই নো মোর ফ্যামিলি ড্রামা, বাস্টার্ড!"

প্রতীক যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল, "বলছি, বলছি। হ্যাঁ আমি গিয়েছিলাম... ওর ফ্ল্যাটে!"

"এবার বল, দরজাটা ভিতর থেকে কী করে লক করলি?" শিবানী ধাক্কা মেরে প্রতীককে আবার চেয়ারের উপর ছুড়ে ফেলে দিল। চেয়ারটা সশব্দে কয়েক ফুট সরে গেল।

প্রতীক একটা ঢোঁক গিলে বলল "ইলেকট্রোম্যাগনেট। দরজার ভিতরের দিকে চাবি লাগিয়ে রেখে আমি বাইরে এসে, কি-হোলের মধ্যে দিয়ে সরু শক্ত একটা পেরেকের মতো লোহার পাত ঢুকিয়ে দিলাম, শুধু এটার মাথাটা পেরেকের মতো তীক্ষ্ণ না, ভোঁতা। তারপর বাইরে থেকে ওই তামার অন্তরিত তার-জড়ানো লোহার পাতটায় হাইভোল্ট ব্যাটারি যোগ করতেই ওটা একটা ইলেকট্রোম্যাগনেট হয়ে গেল আর ভিতরে দিকের চাবিটাকে টেনে ধরল। বাইরে থেকে পেরেকটা ক্লক-ওয়াইজ ঘোরাতেই, ভিতরের দিকের চাবিও অ্যান্টি ক্লক-ওয়াইজ ঘুরে দরজা লক হল। চাবির গোছা সুদ্ধ চাবিটা ভিতরে ঝুলতে থাকলে একটা সন্দেহ হতে পারে— কেন কেউ দরজা লক করার পরও গোছাশুদ্ধ চাবিগুলো দরজায় ঝুলিয়ে রাখবে; এই ভেবেই আগে থেকেই আমি গোছা থেকে মেন ডোরের চাবিটা আলাদা করে নিয়েছিলাম, যাতে দরজায় কোনও চাবি না থাকে! দরজা লক হওয়ার পর আমি ব্যাটারি বন্ধ করে দরজার নীচে একটা কাগজ পেতে ভিতরের দিকে ঠেলে দিলাম। চাবিটায় এবার ঠেলা দিতেই কি-হোলের মধ্যে থেকে খুলে কাগজটার উপর পড়ল। কাগজের বাইরের প্রান্তটা টেনে আমি চাবি ঘরের বাইরে নিয়ে এলাম।

boierpathshala.blogspot.com

দরজা ভিতর থেকে লকও হল, আর চাবিও দরজায় থাকল না। শুধু আমি ভেবেছিলাম, পুলিশ আলাদা করে ওই একটা চাবি লক্ষ করবে না, বা ভেবে নেবে, অশোকই ঘরের কোথাও রেখেছে! আর কেউই খোঁজ করবে না।"

শিবানী এবার শান্ত হয়ে চেয়ারে বসে বলল, "আর ড্রাগ কীভাবে আনতিস? নারকোটিকের চোখে ধুলো দিয়ে?"

প্রতীক হেসে উঠল—"কেন? আমার লম্বা গাড়ি। সামনেটায় ওষুধের বক্স থাকত। পুলিশ সেগুলো চেক করত। ভিতরের দিকের বক্সে সব ড্রাগই তো থাকত! কী ম্যাডাম, আপনারাই ভালো করে কাজ করবেন না, আর আমার দোষ দেখছেন শুধু!"

শিবানী নির্বিকার মুখে বলল, "পার্টনারদের নাম বল?"

প্রতীক হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "প্রখর রুদ্র।"

শিবানী চমকে উঠল—"কী?"

প্রতীকের মুখের সেই প্রসন্নতা ফিরে এসেছে। হেসে বলল, "আজ্ঞে, খুনের কেসটার জন্য আপনার যা যা দরকার ছিল বলে দিয়েছি। ড্রাগের মামলা তো অন্য মামলা। কী হবে ওসব টানাটানি করে! আমি আপনার ইচ্ছে পূরণ করেছি। এবার আপনার পালা। তারাপীঠের একটা কাপ কফি ডেট আর প্রখর রুদ্র। প্রখর রুদ্র ছাড়া অন্য কাউকে আমি কিচ্ছু বলতে রাজি নই।"

শিবানী রেগে গিয়ে প্রতীকের চোয়ালে সজোরে একটা ঘুসি চালিয়ে দিল, "তোর কোনও দাবিই আমি পূরণ করছি না, শয়তান।" শিবানী প্রতীকের গালে সমানে বেপরোয়া ঘুসি চালাতে থাকল। প্রতীকের নাক ফেটে রক্ত বের হতে শুরু করল!

পিছন থেকে কানু এসে থামাল, "থামেন ম্যাডাম। লোকটা মারা গেলে সমস্যার শেষ থাকবে না। এই কেসটা আপাতত ক্লোজ হোক তারপর না হয় চ্যাটার্জি সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করা যাবে-খন।" শিবানী এবার থামল।

প্রতীক একমুখ রক্ত আর থুতু ফেলে বলল, "শুনুন ম্যাডাম। ওর কথাটা শুনুন। আপনারই লাভ। আমায় মারলে কিছুই পাবেন না। আর আমার সঙ্গে

boierpathshala.blogspot.com

এক কাপ চা খেলে আর প্রখর রুদ্রকে এনে দিলে; সব বলব প্রমিস করছি তো। বেকার মারছেন। হা...হা...হা...”

শিবানী আর কিছু না বলে ইন্টারোগেশন রুম থেকে বেরিয়ে এসে রাগে ফুঁসতে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়। আগে এই কেসটার চার্জশিট তৈরি হোক তারপর দেখা যাক, লোকটাকে কী করা যায়। লোকটা মনে হচ্ছে লম্বা রেসের ঘোড়া। একটু বুদ্ধি করে টুঁটি চেপে ধরতে হবে।

* * * * * * *

রাতের বেলা প্রায় দুটোর দিকে দীপককে নিয়ে গাড়িতে চেপে বসে শিবানী। এতক্ষণের ক্লান্তিতে চোখ দুটো প্রায় জুড়ে আসছে। হঠাৎই স্টিফানের ফোন—“হ্যালো ম্যাডাম, আপনি বলেছিলেন, কিছু পেলেই ইমিডিয়েট কল করতে তাই রাতে ডিস্টার্ব করছি।”

শিবানীর ঘুম এক মুহূর্তে ছুটে গেল—“পেয়েছ? ডার্ক হর্সের ট্রেস?”

“আজ্ঞে, ওর ডেস্টিনেশন মেশিনের আই-পি ট্র্যাক করে পেয়ে গেছি। মানে যে মেশিনে ফাইনালি মেলগুলো গিয়ে জমা হত। টোটাল তিনটে এরকম হোস্ট সার্ভার মেশিন দেখাচ্ছে।”

“একটারও লোকেশন পেলে?”

“সেটাই ম্যাডাম, আমিও বুঝছি না। তিনটের মধ্যে দুটো মেশিনের লোকেশন এই মুহূর্তে লালবাজার আমাদের অফিস দেখাচ্ছে।”

শিবানীর মাথাটা টাল খেয়ে ওঠে। মেরুদণ্ড দিয়ে একটা বিদ্যুৎ খেলে যায়—“কী...ই...ইইইই?”

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

কালো ঘোড়া, লাল রক্ত

রাতের বেলা প্রায় দুটোর দিকে দীপককে নিয়ে গাড়িতে চেপে বসে শিবানী। এতক্ষণের ক্লান্তিতে চোখ দুটো প্রায় জুড়ে আসছে। হঠাৎই স্টিফানের ফোন—"হ্যালো ম্যাডাম, আপনি বলেছিলেন, কিছু পেলেই ইমিডিয়েট কল করতে তাই রাতে ডিস্টার্ব করছি।"

শিবানীর ঘুম এক মুহূর্তে ছুটে গেল—"পেয়েছ? ডার্ক হর্সের ট্রেস?"

"আজ্ঞে, ওর ডেস্টিনেশন মেশিনের আই-পি ট্র্যাক করে পেয়ে গেছি। মানে যে মেশিনে ফাইনালি মেলগুলো গিয়ে জমা হত। টোটাল তিনটে এরকম হোস্ট সার্ভার মেশিন দেখাচ্ছে।"

"একটাও লোকেশন পেলে?"

"সেটাই ম্যাডাম, আমিও বুঝছি না। তিনটের মধ্যে দুটো মেশিনের লোকেশন এই মুহূর্তে লালবাজার, আমাদের অফিস দেখাচ্ছে।"

শিবানীর মাথাটা টাল খেয়ে ওঠে। মেরুদণ্ড দিয়ে একটা বিদ্যুৎ খেলে যায়, "কী...ই...ইইইই? কাম কুইক স্টিফান। নাও।" ফোন রেখেই শিবানী দীপককে বলল,"গাড়ি ঘোরাও এখুনি।"

"কিন্তু ম্যাডাম, এই রাতে," দীপকের কথা শেষ হওয়ার আগেই শিবানী বলে উঠল,"জাস্ট ডু ইট।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই শিবানী আবার ফিরে গেল লালবাজার। আধ ঘণ্টার মধ্যে স্টিফানও বাইকে করে ঝড়ের গতিতে এসে পৌঁছাল। শিবানী কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই বলল, "ম্যাডাম, সোজা গিয়ে ডানদিকে। শেখরবাবুর কেবিনের দিকটায়।" ওরা ঊর্ধ্বশ্বাসে শেখরবাবুর কেবিনের দিকে দৌড়াল।

* * * * * * * *

দু-দিন পর দুপুরে শেখর রুদ্রর ঘরে এক গুরুত্বপূর্ণ মিটিং-এর আয়োজন হয়। ঘরের মধ্যে এখন শিবানী, প্রদোষ চ্যাটার্জি, স্টিফান ও দীপক। শেখরবাবু বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন—"না না না। আমি এসবের মধ্যে দাদাকে জড়াব না। দাদার বয়স হয়েছে। আমি কোনওভাবেই টলারেট করব না, পারমিশনও দেব না।"

প্রদোষ চ্যাটার্জি বললেন, "শুনুন স্যার, প্রখরবাবুর জন্য আমরাও ভাবছি। কিন্তু এই ড্রাগ র‍্যাকেটের সব ক-টা মুখোশ খুলতে হলে প্রতীকের কাছ থেকে সবার নাম জানা দরকার। আর তা ছাড়া ও থাকবে জেলের ভিতর। আমরা থাকব। আপনার দাদার কোনও ক্ষতি হবে না।"

"না না। দাদা একবার এসবে জড়িয়ে গেলে, হাইপারটেনশন। মালটাকে আচ্ছা করে ধোলাই দাও। একটা ছিঁচকে ড্রাগ ডিলার, তার এত ডিমান্ড! সাহস পায় কী করে?"

এবার শিবানী ধীরে ধীরে বলল, "তুমি হয়তো ভুলে যাচ্ছ, ও একটা ছিঁচকে ড্রাগ ডিলার না! আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা খুব সহজে ওর মতো একটা ক্রিমিনাল মাস্টারমাইন্ডকে একরকম ভুলবশত গ্রেপ্তার করে ফেলেছি। গত পরশু রাতে স্টিফান ডার্ক হর্সের মেল সার্ভার ট্র্যাক করে যদি তোমার ঘরে জমা করে রাখা প্রতীকের মোবাইল আর ল্যাপটপ পর্যন্ত না পৌঁছোতে পারত, তাহলে তো আমরা জানতেই পারতাম না যে প্রতীকই ডার্ক হর্স! প্রতীককে প্রথমে জিজ্ঞাসা করতে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল, পরে নিজেই স্বীকার করেছে। কিন্তু তার সঙ্গে এ কথাও বলে দিয়েছে, এরপর সে একমাত্র প্রখর রুদ্রর সঙ্গে কথা বলবে। তুমি কী মনে করছ, আমরা লোকাটাকে ভাঙার চেষ্টা করিনি? যথেষ্ট করেছি!" শেখর রুদ্রর সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ প্রদোষ চ্যাটার্জি আর শিবানীর তর্ক-বিতর্কের পর অবশেষে শেখর রুদ্র তাঁর দাদাকে প্রতীকের সঙ্গে দেখা করার পারমিশন দেন।

* * * * * * *

সেদিন সন্ধেবেলা শিবানী ফ্রেশ হয়ে জেঠুমণির ঘরে এসে বলল, "তোমাকে

boierpathshala.blogspot.com

আগেই বলেছিলাম যে প্রতীকই ডার্ক হর্স। কিন্তু যেটা বলিনি সেটা হল, ও ওর পার্টনারদের নাম একমাত্র তোমাকেই দেবে, আর কাউকে না।"

"কিন্তু আমি তো লোকটাকে মাত্র একবার দেখেছি। আমার সঙ্গে এমন কী সম্পর্ক যে আমাকেই বলবে?"

"সেটা আমিও বুঝছি না। তবে তুমি একবার কথা বললে হয়তো আমরা অনেক কিছু জানতে পারব! প্লিজ।"

ইন্দ্রাণী সোফাতে বসে এতক্ষণ চা খাচ্ছিল। এবার বেশ ঠান্ডা স্বরে বলে উঠল, "আমিও যাব জেঠুর সঙ্গে।"

শিবানী জিজ্ঞাসা করল, "আহা, তুই আবার কেন?"

"দরকার আছে। প্রশ্নগুলোর উত্তর চাই!"

শিবানী বলল, "লোকটা বড় অদ্ভুত। প্রত্যেকদিন ওর তিনটে করে গোটা আপেল চাই। না হলে আমাদের সহযোগিতা করতে রাজি না। তা-ও আমরা দিচ্ছি। লোকটা আপেল খেয়ে আপেলের বীজগুলো রেখে দেয়।"

* * * * * * *

পরদিন দুপুরে লালবাজারের ইন্টারোগেশন রুমে শহরের একমাত্র কনসালটেন্ট ডিটেকটিভ আর কনসালটেন্ট ক্রিমিনাল মুখোমুখি হল। দু-জন দু-জনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। ঘরের ভিতরে ইন্দ্রাণী ও কনস্টেবল কানু প্রখর রুদ্রর চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে মুহূর্ত গুনে চলেছে। বাইরে থেকে শিবানী, প্রদোষ চ্যাটার্জি আর দীপক নিষ্পলক দেখতে থাকল। প্রখর রুদ্রই নিস্তব্ধতা ভাঙল, "এত বুদ্ধিমান ব্রাইট একটা মাইন্ড। অথচ এরকম খারাপ পথে ব্যয় করলে কেন?"

প্রতীক চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল—"জাতকের গল্প পড়েছেন?" প্রখর রুদ্র ভ্রূ কোঁচকাল। প্রতীক বলে চলে, "একটা ঋষি অনেকদিন ধ্যান করার পর চোখ খোলামাত্রই একটা পাখি ভস্ম হয়ে গেলে। ঋষি ভাবলেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। নগরে ভিক্ষা নিতে গিয়ে জানতে পারলেন, একজন সাধারণ গৃহবধূ আর মাংস বিক্রি করা এক ব্যাধ তাঁর থেকে বেশি ক্ষমতা রাখে। ঋষি

boierpathshala.blogspot.com

ভাবলেন, প্রাণীহত্যার মতো গর্হিত কাজ করেও কী করে ব্যাধ ক্ষমতার অধিকারী হয়? জাতকরূপী ব্যাধ উত্তর দেন, আমাদের কাজটাই আমাদের ধর্ম, কী কাজ করছি সেটা বড় ব্যাপার না। গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ একই কথা বলেছেন, কাজ করে যাও, ফলের আশা করিয়ো না। তাই কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ— আপনি ঠিক করার কে? সত্যি-মিথ্যে, পাপ-পুণ্য ওসব নীতিকথার বইয়ে ভালো লাগে। বাস্তবে হয় তুমি শিকারি, না হলে শিকার। struggle for existence!"

প্রখর রুদ্র কিছুক্ষণের জন্য কী বলবে বুঝতে পারল না। অসম্ভব ধূর্ত একটা লোক। এর সঙ্গে আর কী বলার থাকতে পারে যখন ভাবছেন তখন ইন্দ্রাণী পিছন থেকে বলে উঠল, "তারাপীঠে সেদিন মিথ্যে বলার কোনও বিশেষ কারণ?"

প্রতীক চকচকে চোখে ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে বলল, "মিথ্যে? আমি তো মিথ্যে বলিনি। আমি সেদিনও বলেছিলাম, একটা গল্প বলছি। গল্পটায় আপনি বিশ্বাস করেছেন! হা হা হা, আমি তখনও বলেছিলাম, এখনও বলছি, ওটা গল্পই ছিল। একটা সুন্দর গল্প।"

"তান্ত্রিককে মারলেন কেন?"

"নাইন মেন অফ এম্পেরর! ওরা চাইল না তান্ত্রিক আর বেঁচে থাকুন। ওদের জন্য লায়াবেলিটি হয়ে উঠেছিল। ড্রাগের ড্রিস্ট্রিবিউটার ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে লোভ বাড়ছিল।" ইন্দ্রাণী একটু ভ্রূ কুচকে বলল, "আবার আর, একটা গল্প! নাইন মেন অফ এম্পেরর! একটা মিথ! সত্যিতে নেই। যাদের নাকি সম্রাট অশোক তাঁর সমস্ত উপলব্ধ জ্ঞানকে ন-টি ভাগে ভাগ করে পৃথিবীর গুপ্ত স্থানে পাঠিয়ে দেন। সেই জ্ঞানকে তারা হাজার বছর ধরে রক্ষা করছে। শুধু এই ন-জন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায়। যারা নাকি এই দেশের ও পৃথিবীর সবকিছুকে পর্দার পিছনে থেকে কন্ট্রোল করে! বাঃ। আপনি মশাই ভালোই গল্প বলতে পারেন।"

প্রতীক এবার প্রখর রুদ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, "আশা করি, আপনি আপনার ভাইঝির মতো একেবারেই ভাবেন না? আপনার বাবা, মৃণাল রুদ্র

boierpathshala.blogspot.com

মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্সের আন্ডার সেক্রেটারি ছিলেন। রহস্যজনকভাবে দিল্লির এক হোটেলে মারা গেলেন ২৯ অক্টোবর ১৯৮৪ আর ৩১ অক্টোবর ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা করা হল! কিছু আলোকপাত করতে চান নাকি NME ব্যাপারে? আপনার ভাইঝি অপেক্ষা করছে!"

প্রখর রুদ্রর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল, "তুমি আমার বাবাকে কী করে চেনো?"

"আপনার বাবাকে রক্ষা করতে অসমর্থ দেহরক্ষী অসীম সরকারের চাকরি গেল। আমার কাকা। কোথাও তাঁকে আর কেউ একটা দারোয়ানের চাকরিও দেয়নি। আমার বাবা-মা মারা যাওয়ার পর কাকার কাছেই বড় হচ্ছিলাম। আমাদের দুই ভাইকে অনাথ আশ্রমে দিয়ে চলে গেলেন, আর ফেরেননি। ভাইও কিছুদিন পর আশ্রম থেকে পালাল! কিন্তু কাকার সঙ্গে ধোঁকা হয়েছিল!"

ইন্দ্রাণী এবার রেগে বলে উঠল, "তা আপনার এই গল্পের সঙ্গে আমার জেঠুর কী সম্পর্ক?"

"সেদিন মৃণালবাবুর ঘরে যে লোকটি বিকেলে এসেছিল, রিসেপশনিস্ট বলেছিল, যুবক লম্বা ফরসা। অথচ যে লোকটি বেরিয়েছিল, তাকে দেখে ওয়েটার বলেছিল, 'একজন বৃদ্ধ, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, লাঠি নিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটেন। তখন সিসিটিভি ছিল না বলে লোকটি ধরা পড়েনি। তা প্রখর রুদ্র, আপনিও তো ছদ্মবেশধারণে পারদর্শী! তিন বছর সার্কাস কোম্পানির সঙ্গে বিদেশ ঘুরেছেন!"

"কী বলতে চাইছেন আপনি? জেঠু সে সময় রাজস্থানে ছিলেন। বাবাকে অনেকবারই কথায় কথায় বলেছেন যে ঠাকুরদার মৃত্যুর সময় উনি জোধপুর ছিলেন। উনি এসবের কিছুই জানতেন না। বাড়িতে ফিরে আসার পর এসব জেনেছেন!"

প্রতীক এবার হেসে উঠল, "আচ্ছা! তা-ই বুঝি? তা উনি কি সোনার কেল্লা দেখছিলেন! হা হা।"

প্রখর রুদ্র এবার নিজের ধৈর্য হারিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "শাট আপ ইউ

boierpathshala.blogspot.com

বাস্টার্ড! তোর পার্টনারের নামগুলো বল। অনেক হয়েছে। তুই কী ভাবিস? এইসব গল্পকথায় আবার সবাইকে ফাঁকি দিবি?"

প্রতীক মুচকি হেসে ওঠে, "না না। একেবারেই না। আমি তো আপনাকে বোঝাচ্ছিলাম। ভালো-খারাপ বলে কিছু হয় না। সব মানুষই তার একটা পরিপ্রেক্ষিত রচনা করে, আর তার জন্যই সে লড়ে। Perspective, মশাই। হিন্দুরা ভাবে তাদের রূপকথাগুলো সত্যি, বাকি সব ভুল। মুসলিমরা ভাবে তাদের রূপকথাগুলো সত্যি, বাকি সব ভুল। আপনি ভাবেন আপনার চলার পথ ঠিক। আমি ভাবি আমারটা ঠিক। যেভাবে দেখবেন, সেভাবে পাবেন। যা-ই হোক, কাজের কথায় আসি এবার! আমি আমার পার্টনারদের নাম দেব, যদি আপনি আমার খেলায় জিততে পারেন।"

"আর আমি যদি না খেলি?"

"একজন নিরপরাধ মানুষের জীবন যাবে। আপনি যদি তা-ই চান, তা-ই হোক। আর আমার কোনও পার্টনারের নামও আপনি পাচ্ছেন না। তাহলে কী ঠিক করলেন?"

প্রখর রুদ্র চোয়াল শক্ত করে বলল, "বলো।"

"বালিগঞ্জ টেরেস, ঢাকুরিয়া। একজন মধ্যবয়স্কা মহিলা থাকেন। হয়তো আর টেনেটুনে... মাস ছয়েক... তারপর মারা যাবেন। স্লো পয়জনিং। তাঁকে বাঁচিয়ে দেখান। আপনার সময় ১২ ঘণ্টা। গেম স্টার্টস নাও।"

প্রখর রুদ্র একবার প্রতীকের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল তারপর ঘড়ির দিকে। এখন বাজে সাড়ে বারোটা, মানে সময় আছে রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত, "বালিগঞ্জ টেরেস প্রায় দু-শো মিটার রাস্তা। দু-পাশে বেশ কিছু ফ্ল্যাট-দোকান। ১২ ঘণ্টায় অসম্ভব।"

"আমার গেমে কোনও নিয়মের পরিবর্তন হবে না, প্রখরবাবু। হয় খুঁজে বের করুন, না হলে নতমুখে ফিরে যান। যা ক্লু দেওয়ার দিয়ে দিয়েছি। আর হ্যাঁ, আজ তো পয়লা জানুয়ারি, ২০১৯। Happy New Year, মশাই। দেখা যাক, আপনার বছরের প্রথম দিন কেমন যায়! উনিশ শুভ হউক। হা হা হা।"

boierpathshala.blogspot.com

প্রখর রুদ্র নতমুখে দ্রুত বেরিয়ে গেল, পিছনে ইন্দ্রাণী। হাতের ঘড়িতে একবার চোখ রাখল— ঠিক সাড়ে বারোটা বাজে। ইন্টারোগেশন রুম থেকে বের হতেই শিবানী আর প্রদোষবাবু এগিয়ে এসে কিছু বলার আগেই প্রখর রুদ্র বলে উঠল, "যদি কিছু জানতে হয়, I want every details of dwellers at Ballygunge Terrace. তাদের নাম, কোথায় থাকত আগে, পেশা, নেশা, মেডিক্যাল হিস্ট্রি, কোনও ব্যক্তিগত বা পেশাগত শত্রুতা। সব! আমি জানি না আপনারা কীভাবে করবেন। কিন্তু যদি আমাকে বিকাল চারটে-সাড়ে চারটের মধ্যে দিতে পারেন, আমি চেষ্টা করব।"

প্রদোষবাবু একটু হাঁ করে বললেন, সবই ঠিক আছে। কিন্তু এই ভরদুপুরে একটা পাড়ায় ষাট-পঁয়ষট্টি-জন পুলিশ পাঠিয়ে বাড়ি বাড়ি জিজ্ঞাসাবাদ করলে যে লোক প্যানিক করবে। আর এতজন কি এই দুপুরে বাড়িতে থাকবে?"

শিবানী বলল, "সেটা আমার উপর ছেড়ে দিন স্যার। আমরা প্লেন ড্রেসে যাব। বলব আমাদের স্পেশাল প্রোগাম— নাগরিকদের আরও কাছ থেকে জানা ও তাঁদের সমস্যাগুলি জানা। আপনি শুধু অর্ডার দিন।"

প্রদোষ চ্যাটার্জি একটু দ্বিধা নিয়ে বললেন, "কী কাণ্ড বাধালে বলো দেখি। এ তো দেখি শাঁখের করাত। না পারি ফেলতে, না পারি গিলতে! দেখো কী হয়। বাট, কোনও সমস্যা যেন না হয়।"

শিবানী 'ইয়েস স্যার' বলে বেরিয়ে যেতেই পিছনে ইন্দ্রাণীও ছুটল—"চল। আমিও যাব। তোর সঙ্গে।"

প্রখর রুদ্রকে একটা কনফারেন্স রুমে বসানো হল। সবাই ফিল্ড থেকে সেখানেই আপডেট দেবে। একই সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্ত করা হবে। এক সেকেন্ডও নষ্ট করা যাবে না।

* * * * * * *

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বালিগঞ্জ টেরেস রোডে প্লেন ড্রেসে ষাট-সত্তরজন পুলিশ চারপাশের বাড়ি, দোকান, রেস্টুরেন্টগুলোতে খোঁজ চালাতে থাকে। কিন্তু সব

boierpathshala.blogspot.com

থেকে বড় সমস্যা হল এই ষাট-সত্তরজন যে ঠিক কাকে খুঁজছে, সেটা তারা নিজেরাই জানে না। তাদের বলা হয়েছে, মহিলাদের সম্পর্কে বেশি যত্নবান হয়ে যত বেশি সম্ভব তথ্য জোগাড় করতে। ওদিকে কনফারেন্স রুমে তিনজন কনস্টেবল হোয়াট্‌সঅ্যাপ থেকে ডিটেলস একটা কাগজে লিখে চলেছে। তারপর সেগুলো প্রখর রুদ্রর দিকে এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তিনি তার থেকে পোটেনশিয়াল ভিকটিম খুঁজে চলেছেন। দেয়ার ইজ নো রুম ফর মিসটেকস। কথায় আছে 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা আর পুলিশে ছুঁলে...'। সন্ধে সাতটার মধ্যে প্রায় সব বাসিন্দার ডিটেলস লালবাজারে কনফারেন্স রুমে জমা হয়েছে—তাদের ব্যক্তিগত জীবন, পেশাগত জীবন, ব্যাঙ্ক ডিটেলস, আধার কার্ড ডিটেলস, মেডিক্যাল হিস্ট্রি, বিমা তথ্য, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি। প্রায় সাড়ে পাঁচশো লোকের তথ্য জমা পড়েছে।

প্রথমেই সমস্ত পুরুষের তথ্য সরিয়ে দেওয়া হল। বাকি থাকল প্রায় তিনশো মহিলা। এবার কনস্টেবল কানু বলল, "স্যার, এবার কী করুম?"

প্রখর রুদ্র কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "মধ্যবয়স্ক মহিলা। এদের থেকে যাদের বয়স পঁচিশের নীচে আর পঞ্চান্নের বেশি, তাদের বাদ দাও।"

তিনজন কনস্টেবল আবার লেগে পড়ে তিনশো মহিলার বয়স অনুযায়ী কাট-ছাট করতে। ওদিকে যাঁরা সারাদিনের পর বাড়ি ফিরছেন, সেরকম মধ্যবয়স্ক মহিলাদেরও তথ্য সংগ্রহ করে চলেছে শিবানী আর ইন্দ্রাণীরা বালিগঞ্জে।

প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে কানু বলল, "স্যার, সব মিলিয়ে যে দুইশোর মতো হইছে। আর ফিল্ড থেকে ম্যাডাম আরও দশজনের তথ্য পাঠাইল। তাদের মধ্যেও তিনজন আইছে এইরম।"

প্রখর রুদ্র মাথাটা চেপে ধরে কিছুক্ষণ ঠান্ডা মাথায় ভেবে চলেছে প্রতীকের প্রত্যেকটা কথা— স্লো পয়জনিং! প্রখর রুদ্র ধীরে ধীরে বলল, "কানু, এর মধ্যে থেকে যেসব মহিলা সম্পূর্ণ সুস্থ, তাদের বাদ দাও।"

তিনজন কনস্টেবল আবার কিছু কথা না বলে লেগে পড়ে। পৌনে দশটা নাগাদ কানু আবার ফিরে আসে—"স্যার, সব মিলে একশো উনিশজন।"

boierpathshala.blogspot.com

প্রখর রুদ্র চেয়ার থেকে উঠে পায়চারি করতে থাকে। এতটা রাস্তা বেশ সহজ ছিল, এবার কী করে ভিকটিমের তালিকাটিকে ছোট করবে ভাবতে থাকে। এত কম সময়ে একশো পঁচিশজনের ব্লাড টেস্ট করে রিপোর্ট পাওয়া—দেখাও সম্ভব নয়। যদিও প্রদোষবাবু বুদ্ধিমান লোক। তিনি ন-টার দিকে লালবাজার থেকে দশজন প্যাথলজিস্টকে সমস্ত কিট দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। প্রখর রুদ্রর সিগনাল পেলেই সবাই শর্ট লিস্টেড ভিকটিমদের ব্লাড টেস্ট শুরু করবে। হাতে আর সময় ঠিক আড়াই ঘণ্টা। এর মধ্যে লালবাজারের কনফারেন্স রুমে প্রদোষ চ্যাটার্জির দুঁদে পুলিশ অফিসাররা এসে জমা হচ্ছেন। শেখরবাবু আরও কিছু পুলিশ নিয়ে বালিগঞ্জ গেছেন। প্রখর রুদ্র হঠাৎ একশো উনিশজনের লিস্ট নিয়ে পাগলের মতো কিছু খুঁজতে শুরু করলেন—"কানু, কুইক। এর থেকে বড় রোগে আক্রান্তদের বাদ দাও। যেমন— ক্যান্সার, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, টিবি এসব বাদ। দীর্ঘদিনের মাইগ্রেন, ডায়াবেটিস, শুগার বাদ। বরং যাদের শেষ ছয় মাসে মাথাব্যথা, দুর্বল বোধ করছে, বমি-বমি, কিছু খাবারে অনীহা, ত্বকে কোনওরকম ইনফেকশন এদের খুঁজে বের করো।" তিনজন কনস্টেবল আবার লেগে পড়ে। প্রদোষ চ্যাটার্জি আরও দু-জন লোককে লাগিয়ে দেন। পৌনে এগারোটা নাগাদ কানু এবার গোটা পঞ্চান্নজনের লিস্ট নিয়ে দাঁড়াল। প্রখর রুদ্র প্রদোষ চ্যাটার্জির দিকে তাকিয়ে বলল, "এবার আপনার হেল্প লাগবে। এদের মধ্যে যাদের মাঝে মাঝেই ডায়েরিয়ার সিমটম আছে, সঙ্গে ত্বকে কালচে, ছোপ-ছোপ তাদের আর্সেনিক টেস্ট। যাদের ডায়েরিয়ার সঙ্গে মাঝে মাঝেই হাই অ্যাবডমিনাল পেইন আর হালকা হলদেটে ত্বক, তাদের ব্লাডে আয়রন টেস্ট করুন। যারা চোখে কম দেখা, মাথা ঘোরা, পেশিগত শিথিলতায় ভুগতে শুরু করেছে তাদের মারকিউরি টেস্ট করান।

প্রদোষ চ্যাটার্জি ফোন করে দ্রুত কাজ শুরু করার নির্দেশ দিলেন। ফোন রেখে চিন্তিত মুখে বললেন, "প্রখরবাবু, দেড় ঘণ্টায় পঞ্চান্নজনের টেস্ট করে রিপোর্ট দেখে খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব। প্যাথলজি টিম অন্তত তা-ই বলছে। তবু ওরা চেষ্টা করছে।"

প্রখর রুদ্র একটু চিন্তিত মুখে পঞ্চান্নজনের লিস্ট উলটেপালটে দেখতে

boierpathshala.blogspot.com

থাকে। সে কি কিছু মিস করছে। সংখ্যাটা কি কোনওভাবে আরও কম করা যেতে পারে? কিন্তু কীভাবে? প্রখর রুদ্র বার বার লিস্টটা আর তাদের সিমটম দেখতে থাকে। কনফারেন্স রুমের এ মাথা-ও মাথা অস্থির পায়চারি করতে থাকে। একটু ঠান্ডা হাওয়া দরকার। প্রখর রুদ্র বাইরে এসে খোলা একটা বারান্দাতে দাঁড়ায়। ঘড়ির কাঁটা প্রায় বারোটা ছুঁইছুঁই। আরও একটু ভাবার চেষ্টা করে হঠাৎই চমকে উঠল, তার সব থেকে বড় ব্রহ্মাস্ত্রটাই ভুল জায়গায় ছাড়া হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করল ইন্দ্রাণীকে, "হ্যালো। সবই তো শুনেছিস। ওখানে অবস্থা কী?"

"চেষ্টা চলছে। সবে জনা কুড়ির হয়েছে। এখনও কিছু অস্বাভাবিক পাওয়া যায়নি। কিন্তু এখানকার লোকজন বেশ প্যানিক হয়ে যাচ্ছে। দুপুর থেকে এভাবে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ আর এখন বাড়ি বাড়ি ঢুকে ব্লাড টেস্ট।"

"বুঝতে পারছি। বাট উই হ্যাভ নো চয়েস!"

"সেটা ঠিকই। তুমি যে পঞ্চান্নজনের লিস্ট পাঠিয়েছিলে, তাদের কিছুজনের সঙ্গে আগেই কথা হয়েছিল। তোমার লিস্ট পাওয়ার পর বাকি যাদের সঙ্গে আমি কথা বলিনি আগে, তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাদের বাড়ির লোকজনের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করছি। যদি কিছু বড়সড়ো মোটিভ পাওয়া যায়, তাহলে হয়তো আমাদের ভিকটিমকে পাওয়া গেলেও যেতে পারে।"

"আচ্ছা। লেট'স বি অনেস্ট। তোর কী মনে হয়, আমরা ঠিক পথে আছি? তুই কি ভেবেছিস অন্যভাবে?"

ইন্দ্রাণী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উত্তর দিল, "আমি তো সেভাবে কিছু ভাবিনি। তুমি যা নির্দেশ পাঠিয়েছ, ফলো করেছি। আমার নিজেরও ইললজিক্যাল তো লাগেনি! আমাদের সময়ও বেশি নেই। আমরা কি হেরে যাব জেঠু?"

প্রখর রুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল, "আমার হেরে যাওয়াতে কোনও সমস্যা নেই রে। সমস্যা হল, আমরা হেরে গেলে লোকটা আর কোনও প্রমাণই আমাদের দেবে না। আমার চিন্তা সেটাই। আচ্ছা, আমরা কি কিছু মিস করছি?"

"কিছু?"

boierpathshala.blogspot.com

"হ্যাঁ। মনে আছে, প্রতীক কী বলেছিল? বলেছিল, আমাদের সব ক্লু দিয়ে দিয়েছে। আমার মন বলছে, আমরা কিছু মিস করছি। আমি কিছুতেই ধরতে পারছি না। তুই ঠান্ডা মাথায় ভাব। হতে পারে, তুই খুঁজে পেলি। ভাব ইন্দ্রা, ভাব। টাইম কম।"

ইন্দ্রাণী ফোনটা রেখে বন্ধ সান্টা'জ ফ্যান্টাসি রেস্টুরেন্টের সামনে রাস্তার উপরেই বসে পড়ে। মাথা চেপে ধরে ভাবতে থাকে। প্রতীকের প্রত্যেকটা শব্দ মনে মনে আওড়াতে থাকে। সামনের রেস্টুরেন্টটা দেখে কলেজের দিনের কথা মনে পড়ে। এখানে বন্ধুরা মিলে মাঝে মাঝে খেতে আসত। সান্টা'জ ফ্যান্টাসি, ১০ বালিগঞ্জ টেরেস। ইন্দ্রাণী হঠাৎ সোজা হয়ে বসল, '১০ বালিগঞ্জ টেরেস'; 'উনিশ শুভ হউক'। ইন্দ্রাণী দৌড়ে গিয়ে শিবানীর হাত থেকে নামের লিস্টগুলো নিয়ে বাড়ির ঠিকানাগুলো দেখতে থাকল আর বিড়বিড় করতে থাকল— '১৯ বালিগঞ্জ টেরেস, ১৯ বালিগঞ্জ টেরেস।' কয়েকটা কাগজ এলোপাথাড়ি খোঁজার পর একটা কাগজ নিয়ে ইন্দ্রাণী উর্ধশ্বাসে দৌড়োল ১৯ বালিগঞ্জ টেরেস বাড়িটার দিকে। রাস্তায় একজন প্যাথলজিস্ট পার্থকে একরকম হ্যাঁচকা টানে তুলে নিয়ে দৌড়ালো। পার্থও কিছু না বুঝে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ছুটতে থাকল।

এত রাতে অবশ্য বাড়ির কর্তা প্রৌঢ়, রাধেশ্যামবাবু প্রথমে দরজা খুলতে রাজি হননি। কিন্তু সঙ্গে পুলিশ আর বাড়ির কারওর প্রাণসংশয় জেনে দরজা খুলে দেন। ইন্দ্রাণী ঢুকেই জিজ্ঞাসা করল, "মারিয়া লরেন্স দাশগুপ্ত কোথায়?" রাধেশ্যামবাবু চোখ বড় বড় করে বললেন, "আজ্ঞে আমার বউমা। সে তো সবে খেয়ে উঠেছে।" ইন্দ্রাণী দ্রুত চোখে একবার সিমটমগুলো দেখে নিয়ে পার্থকে বলল, "যাও জলদি। হিমাক্রোমোটোসিস টেস্ট। কুইক।" পার্থ ঘরের ভিতরে ঢুকে যায়। ইন্দ্রাণী দ্রুত রাধেশ্যামবাবুকে প্রশ্ন করতে শুরু করে, "দেখুন, সময় কম। তাড়াতাড়ি যেটুকু জানেন, সবটা বলবেন। আপনাদের বাড়িতে কয়জন মানুষ? কে কী করেন?" রাধেশ্যামবাবু মাথা চুলকে বললেন, "আমি রিটায়ার্ড নিউজ এডিটর। আমার স্ত্রী এই ঢাকুরিয়ায় একটি বেসরকারি স্কুলে বায়োজলি পড়ান। পার্টটাইম একটি জিমে ডায়েটেশিয়ান। আমার ছেলে নবারুণ

boierpathshala.blogspot.com

আই-টি-তে। ছয় মাসের জন্য ছেলে-বউমা কোম্পানির কাজে এ দেশে এসেছে, আবার ছয় মাস পর ফিরে যাবে। বলছে তো ছয়মাস এখানে, ছয় মাস ওখানে– এভাবেই আপাতত চালাবে।"

"নাম দেখে তো মনে হচ্ছে আপনার বউমা ভারতীয় নন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার ছেলে এম. টেক.-এর পর মুম্বইতে চাকরি জয়েন করে। দু-বছরের মধ্যে কাজের সূত্রে চলে যায় আমেরিকা। সেখানেই ওদের আলাপ। একই কোম্পানিতে কাজ করত। প্রথমে আমাদের একটু অমত ছিল, পরে মারিয়ার সঙ্গে মেশার পর আমি মেনে নিই। যদিও ওর মা, দীপালি তারপরও মেনে নিতে পারেনি। গত জুনে তাই নবারুণ আর মারিয়া বিয়ে করে কলকাতা আসে। ধীরে ধীরে মারিয়া সবার সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছে। বাংলাটাও শিখছে।"

"মারিয়াকে বিয়ে করার আগে কি আপনার ছেলের গ্রিন কার্ড ছিল?"

"দেখুন, আপনারা নবারুণকে কীসের জন্য দোষী সাব্যস্ত করতে চাইছেন, আমি ঠিক বুঝছি না। আজকে নিউ ইয়ারের দিনেও দেখুন অফিসে। আর আপনারা শুধু শুধু..."

ইন্দ্রাণী একটু বিরক্ত হয়—"প্লিজ। যেটা জিজ্ঞাসা করলাম সেটা বলুন।"

"আজ্ঞে ছিল না।"

"আপনার স্ত্রী-র প্রথমের দিকের আপত্তির কোনও কারণ? বিদেশি আর অন্য ধর্ম ছাড়া?"

"আজ্ঞে, মারিয়ার বয়স ৩৫ আর নবারুণের ৩৩। সেটাই একটু মেনে নেওয়া আমাদের পক্ষে সমস্যা হয়ে যাচ্ছিল। আত্মীয়দেরও বলার ব্যাপার থাকে।"

"ও.কে.। মারিয়ার কোনও বড় ইনশিয়োরেন্স?"

"হ্যাঁ, একটা পারসোনাল আছে। আমেরিকাতে। শুনেছি তো ভারতীয় টাকায় প্রায় কোটির কাছাকাছি। আর ও এখন যে ভারতীয় কোম্পানিতে কাজ করছে, সেখান থেকে একটা হেল্‌থ ইনসিয়োরেন্স দিয়েছে, সেটাও প্রায় সত্তর লাখ।"

"নমিনি?"

boierpathshala.blogspot.com

"হেল্‌থ-এরটা আমার ছেলে। পারসোনালটা ওর ভাই অর্ধেক আর বাকি অর্ধেক নবারুণ।"

আরও কিছু কথা চলতে চলতে, এর মধ্যে পার্থ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে থমথমে মুখে—"ম্যাডাম, পজিটিভ। মারিয়ার হিমাক্রোমোটোসিস আছে। সঙ্গে ব্লাডে এক্সেসিভ আয়রন। তাড়াতাড়ি চিকিৎসা না করালে যেকোনওদিন লিভার ফেলিয়োর, হার্ট ফেলিয়োর, না হলে কোমায় চলে যেতে পারেন। ভীষণ দুর্বল লাগছে, দেখলাম।" ইন্দ্রাণী ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল বারোটা পঁচিশ। আর দেরি করা যাবে না। ইন্দ্রাণী বাইরে এসেই জেঠুমণিকে দ্রুত ভিকটিমের নাম আর ডিটেলস সব দিয়ে দেয়।

ইন্দ্রাণীকে কলে রেখেই প্রখর রুদ্র ছুটে ইন্টারোগেশন রুমে ঢুকল। পিছনে প্রদোষ চ্যাটার্জি। প্রখর রুদ্রকে দেখেই প্রতীক মুচকি হেসে বলল, "আপনার জন্যই তো অপেক্ষা করছিলাম।"

প্রখর রুদ্র টেবিলের সামনে ঝুঁকে পড়ে বলল, "মারিয়া লরেন্স। ১৯ বালিগঞ্জ টেরেস।"

প্রতীক হাত দুটো মাথার উপর তুলে প্রসন্নচিত্তে বলল, "বাঃ বেশ বেশ! তা কীভাবে?"

"গড়পড়তা ১৯০ জন আমেরিকানের মধ্যে ১ জন হিমাক্রোমোটোসিসে আক্রান্ত। এটি একটি জেনেটিক ডিসঅর্ডার। আমাদের দেহে রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা বজায় রাখার জন্য লোহিত রক্তকণিকায় উপস্থিত লোহা বা আয়রনের বিশেষ ভূমিকা আছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় বেশি আয়রন আমাদের দেহের ক্ষতি করে। হিমাক্রোমোটোসিস আক্রান্ত ব্যাক্তির রক্তের লোহিত রক্তকণিকা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি আয়রনকে শোষণ করে। সারা দেহে যখন এই অতিরিক্ত আয়রন ছড়িয়ে যেতে থাকে, দীর্ঘমেয়াদে তা দেহের বিভিন্ন অঙ্গহানির আশঙ্কা তৈরি করে, যেমন– লিভার, হার্ট ও অগ্ন্যাশয় ফেলিয়োর। যদি সঠিক সময়ে ধরা না পড়ে ও চিকিৎসা না হয়, এদের জীবনকাল পঞ্চান্নর বেশি হয় না। কিন্তু সমস্যা হল, যেহেতু এটি একটি জেনেটিক ডিসঅর্ডার তাই কোনও সাধারণ রক্ত পরীক্ষার ক্ষেত্রে ধরা পড়ে না। অর্ধেকের বেশি এই

boierpathshala.blogspot.com

ডিসঅর্ডারে ভোগা মানুষ হয়তো তাদের চল্লিশ বছর বয়সের পরে গিয়ে এই সমস্যার কথা জানতে পারে। এই ধরনের লোকেদের হাই-আয়রন ফুড খাওয়া বারণ, যেমন– পালংশাক বা ব্রোকলির মতো ডার্ক গ্রিন পাতাওয়ালা শাক সবজি, টার্কির মাংস। ভারতীয়দের মধ্যে এই ডিসঅর্ডারের সংখ্যা কম তবে একেবারে অস্বাভাবিক না। আর এখানে মারিয়া তো একজন নেটিভ আমেরিকান, আমার বিশ্বাস তার আগে থেকেই হিমাক্রোমোটোসিস ছিল। শুধু সে জানত না। সেই সুযোগেই তাঁকে কেউ হাই-আয়রন ফুড দিচ্ছে জেনে-বুঝে। আয়রন আমাদের দেহের জন্য ভালো, কিন্তু যার দরকার তার। একটা ছোট বাচ্চার আয়রণ ট্যাবলেটে প্রায় ১৮ মিলিগ্রাম আয়রন থাকে, যা বিপদমাত্রার অনেক কম। কিন্তু একটা স্বাভাবিক কিশোর বয়স্কও যদি এরকম একটি বোতলের সব ক-টি ট্যাবলেট একসঙ্গে খেয়ে নেয়, তাহলে নেক্সট কুড়ি মিনিটে তার বমি, ডায়েরিয়া আর লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন শুরু হবে আর যদি বিধি বাম হয় তো কোমা ও মৃত্যুও অসম্ভব না!"

প্রতীক দু-হাত তুলে হাততালি দিয়ে বলে, "উঠল। ব্রেভো! মিস্টার রুদ্র-ব্রেভো!"

প্রখর রুদ্র হাঁপাতে হাঁপাতে ঘড়ি দেখে বলল, "১২:২৯ মিনিট। এবার নামগুলো।"

প্রতীক এবার টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ল—"কীসের নাম? কথা ছিল, আপনি জিতলে আমি নাম দেব, না হলে নয়।"

"তোমার শর্তানুযায়ী ভিকটিমকে খুঁজে তো দিলাম।"

প্রতীক প্রসন্নচিত্তে হেসে বলে উঠল, "উ...হুঁ... কথা ছিল তাঁকে বাঁচানোর, মিস্টার রুদ্র। আপনি তো এখনও অপরাধীই ধরতে পারেননি!"

প্রখর রুদ্র এক মুহূর্তের জন্য থ হয়ে গেলেন। কী বিরাট মিসটাই না তিনি করেছেন! ফোনের ওপাশে ইন্দ্রাণীর ইচ্ছে করল মাথার চুল ছিঁড়তে। ইন্দ্রাণী ভাবতে শুরু করে, বিয়ে হওয়ার এক বছরের মধ্যে যদি মারিয়া মারা যান, নবারুণের উপরেই সব সন্দেহ এসে পড়বে। ও দেশের আইন এত সহজে নবারুণকে ছাড়বে না। তার উপরে লোকটা সমাজ পরিবার, এত বাধা টপকে

boierpathshala.blogspot.com

একজনকে বিবাহ করেছে, সেটা কি শুধুই টাকা আর গ্রিন কার্ডের লোভে? যদিও মোটিভের দিক থেকে ভাবলে সব থেকে লাভ বেশি নবারুণেরই, কিন্তু মারিয়ার মতো সম্পত্তিওয়ালা প্রচুর গ্রিন কার্ড হোল্ডার ভারতীয় মহিলা আজকাল আমেরিকায় অনেকেই থাকেন। তারপরও নবারুণ মারিয়াকেই বিয়ে করল! যদি মেরেই ফেলতে হয়, শুধু শুধু বাবা-মা, পরিবার, সমাজ-সবার সঙ্গে লড়ার এতটা সাহস কি রাখত? হিসেব মিলছে না। চকিতে ইন্দ্রাণীর মাথায় বিদ্যুৎ খেলে যায়। স্পিকারে রাখা ফোনে বলে ওঠে, "প্রতীক, অপরাধীও ধরা পড়েছে। মারিয়ার শাশুড়ি। একজন বায়োকেমিস্ট। রিসার্চের তিন বছর আমেরিকায় কাটিয়েছেন— মিনারেল আর ভিটামিন নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি একজন ডায়েটেশিয়ানও বটে। তিনি ভালোভাবেই এই ডিসঅর্ডারটি সম্পর্কে জানেন বলেই আমার বিশ্বাস। ছেলের বিয়েতে খুশি ছিলেন না। হয়তো এখনও বউমাকে মেনে নিতে পারেননি।"

প্রতীক উলটোদিক থেকে চিৎকার করে ওঠে, "বাঃ বাঃ বাঃ। অসাধারণ। প্রখরবাবু, আপনার উত্তরসূরি আপনার মুখ উজ্জ্বল করবে।" প্রখর রুদ্র আর ইন্দ্রাণী হাঁপ ছেড়ে বাঁচল আর সেই সঙ্গে একসঙ্গে প্রদোষ চ্যাটার্জি, শেখর রুদ্র আর শিবানীও একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। তখনই প্রতীক হেসে উঠল—"বাট আই অ্যাম সরি, মাই ডার্লিং ইন্দ্রাণী। দ্য টাইম ইজ ওভার। ১২:৩৩ মিনিট!"

প্রখর রুদ্র টেবিলের উপর সজোরে একটা ঘুসি মেরে বলল, "ড্যাম ইট!"

প্রতীক শয়তানের মতো হেসে উঠল, "হি... হি... হি। কেমন লাগছে, মিস্টার রুদ্র? এতগুলো মানুষ আপনার দিকে সারাদিন চেয়ে ছিল। আপনার জন্য তারা জান লড়িয়ে দিল আর তারপরও আপনি তাদের হতাশ করলেন।"

প্রতীক টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে গর্জে উঠল, "আমার কাকা অসীম সরকারেরও ঠিক এরকমই লেগেছিল, মিস্টার রুদ্র— যখন আপনার বাবাকে উনি রক্ষা করতে পারেননি। অন্তর্ঘাতের স্বরূপ কেমন হয়, আপনাকে আমি দেখাব মিস্টার রুদ্র। আপনাকে মারার হলে অনেকদিন আগেই মেরে ফেলতে পারতাম! কিন্তু আমি চাই, আপনি দাঁড়িয়ে থেকে দেখুন, কীভাবে আপনার

boierpathshala.blogspot.com

কাছের মানুষগুলো আপনার থেকে বিশ্বাস হারাচ্ছে! কীভাবে মানুষ আপনার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। আই উইল মেক ইউ পে ফর মাই পেইন।"

প্রখর রুদ্র হতাশভাবে তাকিয়ে বলে, "তোমার আমার সঙ্গে শত্রুতা থাকলে, আমাকে নিয়ে যা খুশি করো। কিন্তু তুমি জানো, হাজার হাজার যুবক তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঢেকে ফেলছে— ড্রাগের নেশায়।"

"তাদের ভবিষ্যৎ এমনিতেই অন্ধকারে, মিস্টার রুদ্র। দেশে চাকরি নেই। সরকারের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। ঘণ্টাখানেকের নেশা যদি তাদের একটু রিলিফ দিতে পারে, তাতে ক্ষতি কী। এখন কি মাঝে মাঝে আপনার মনে হয়, NME-কে আপনি ভেঙে না দিলে দেশের পরিস্থিতি হয়তো ভালো কিছু হত? যা-ই হোক, সারাদিন এত পরিশ্রম করলেন, একটা টিপ আমি দিচ্ছি। না না, আপনার জন্য না। ফর মাই ডিয়ার ডার্লিং ইন্দ্রাণীর জন্য।" ইন্দ্রাণী মাথা থেকে পা রাগে জ্বলতে থাকল, তা-ও সে চুপ করে থাকে। প্রতীক বলল, "আমার যতগুলো ওষুধ সাপ্লাইয়ের দোকান আছে, রেইড করুন, কিছু মাল পেয়ে যাবেন। দোকানগুলোর নাম আমার ব্যাঙ্কের লকারে পেয়ে যাবেন।"

প্রখর রুদ্র হতাশভাবে বলে উঠল, "আর তোমার পার্টনারদের নাম?"

"আপনি আজ ভালো খেলেছেন। তাই আপনাকে আর-একটা সুযোগ দেওয়া যেতেই পারে। রবিবার দুপুরে আসুন। ততদিনে একটা লোক খুন হবে। বাকি কাজটা আপনার।"

প্রখর রুদ্র ঝুঁকে পড়ে বলে, "কে?"

প্রতীক হেসে ওঠে, "সে যখন হবে তখন জানতে পারবেন। আপনার কে খুন হবে জেনে কী কাম? যান গিয়ে ক-টা দিন রেস্ট নিন।" চোখ বন্ধ করে শিস দিতে দিতে প্রতীক ডিনারে দেওয়া গোটা আপেলটায় কামড় বসায়। আর প্রখর রুদ্র নিশ্চুপ মাথা নত করে ইন্টারোগেশন রুম ছাড়ে।

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

'জলে না যাইয়ো'

"আজ আবার একই ব্যাপার হল। নতুন ওয়েটারগুলোর কোনও কাজে মন নেই।"

ফোনের ওপাশে একটা উদ্‌বিগ্ন মহিলাকণ্ঠ—"কোন ব্যাপারটা গো?"

"আগের মাসেও কোনও একদিন ক্লাবে বললাম না, আমার টেবিলে ভুল করে ঠান্ডা হ্যামবার্গার দিয়েছিল। আজকে আবার ওয়েটারটা ভুল করেছে। আজ তাড়ায় ছিলাম বলে খেয়ে নিয়েছি। আমার রাতে ফিরতে লেট হবে।"

"তবু ঠান্ডাটা না খেলেই পারতে। যা-ই হোক। পারলে তাড়াতাড়ি ফিরো।"

* * * * * * *

রবিবার সকালে যথারীতি প্রখর রুদ্র বিষণ্ণ মনে লালবাজারের ইন্টারোগেশন রুমে পা রাখল। সঙ্গে ইন্দ্রাণী, শিবানী আর প্রদোষ চ্যাটার্জি। প্রতীক তখন সবে ব্রেকফাস্ট শেষ করে একটা আপেলে কামড় বসিয়েছে—"আসুন আসুন। দ্য গ্রেট রুদ্র ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস।" প্রখর রুদ্র এ কয়েকদিনে বারকয়েক প্রতীকের থেকে জানতে চেয়েছেন, কে মারা যাবে। কিন্তু প্রতীক মুখ খোলেনি।

প্রদোষবাবু একটু বিরক্ত হলেন, "তুমি সব সময় আপেল খাও কেন হে?"

প্রতীক হেসে উত্তর দেয়, "An apple a day keeps the doctor away."

প্রদোষবাবু মুখ বেঁকিয়ে উঠলেন, "উমম, জেলে অনেক ভালো ডাক্তার আছে। অসুস্থ হলেও তোমায় ঠিক সোজা করে দেবে।"

প্রখর রুদ্র থমথমে মুখে জিজ্ঞাসা করল, "কী পেলে প্রতীক এতগুলো মানুষ খুন করে? শুধু ক-টা টাকার জন্য?"

প্রতীকের ঠোঁটের কোনায় একটা তাচ্ছিল্যের হাসি দেখা গেল, "টাকা?

আপনার মতো বুদ্ধিমান লোকের কাছে এটা আশা করিনি, প্রখরবাবু। আগের দিনই যে বললাম আপনাকে— 'নাইন মেন অফ এম্পেরর'। তারা দেশের সব থেকে ধুরন্ধর অপরাধীকে তাদের দলে চায়। আপনি কি মনে করেন এই দেশে আমি একাই কনসালটেন্ট ক্রিমিনাল? না মশাই না, সবাই তাদের ছাপ ছাড়ছে 'নাইন মেন অফ এম্পেরর'-এ প্রবেশাধিকার পাওয়ার জন্য। 'রেড পান্ডা', 'গোল্ডেন ফালকন', 'ড্রাগনস্ টেল' সবাই প্রতিযোগিতায় নেমে গেছে। আর এদের মধ্যে সব থেকে খতরনাক হল ডক..."

প্রদোষবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "চোপ, ভাঁওতাবাজ। গল্প রাখ। তাড়াতাড়ি তুই আসল কথা বল!"

প্রতীক হেসে উঠে বলল, "ওকে। লেট দ্য গেম বিগিন। টালিগঞ্জ থানায় গত বৃহস্পতিবার একটি কেস এসেছে। একজন ব্যক্তি জলে ডুবে মারা গেছেন। নাম দিলীপ বসাক। পেশা— ব্যবসায়ী। যান। দেখে এসে বলুন, কী বুঝলেন— খুন নাকি দুর্ঘটনা। আপনার সময় ১২ ঘণ্টা সেই আগের দিনের মতোই। মানে রাত ৯টা।"

প্রখর রুদ্র একটু বিরক্ত হল—"বৃহস্পতিবার মারা গেলেন আর তুমি আজ রবিবারে জানাচ্ছ? এত দেরি কেন?"

"গেমের নিয়ম, মশাই। পরের লেভেলে গেলে খেলা তো কঠিন হবে। আমি শুধু লোকটির শেষকৃত্যের জন্য ওয়েট করছিলাম। দিলীপ বসাকের দেহটা আপনি যাতে দেখার সুযোগ না পান," প্রতীক হা হা করে শয়তানের মতো হেসে ওঠে।

* * * * * * * *

সকাল সকালই লালবাজারের লোকজন দেখে টালিগঞ্জ থানার ও.সি. সুদর্শন সমাদ্দার থতমত খেয়ে উঠলেন, "স্যার, আপনারা এখানে?"

প্রদোষবাবু কোনওরকম ভণিতা না করেই বললেন, "আপনার এখানে ক-দিন আগে দিলীপ বসাক নামের কোনও ব্যবসায়ীর খুনের কেস এসেছে?"

সুদর্শনবাবু একটু থতমত খেয়ে হাত কচলে বললেন, "হত্যা? কই না তো

boierpathshala.blogspot.com

স্যার। দিলীপ বসাকের কেস তো অ্যাক্সিডেন্ট কেস!"

"কেস ফাইলগুলো নিয়ে আসুন। এঁদের একবার দেখতে দিন," প্রদোষবাবুর কথা শেষ হতেই এবার সুদর্শনবাবু পিছনে দাঁড়িয়ে-থাকা প্রখর রুদ্র, শিবানী আর ইন্দ্রাণীকে দেখে ভ্রূ কোঁচকালেন—"স্যার, তদন্তের কোনও ত্রুটি রাখিনি। শুধু শুধু বাইরের লোকের কথায় আমায় সন্দেহ করছেন স্যার?"

"আমি কাউকেই সন্দেহ করছি না, সুদর্শনবাবু। আমরা একটা অন্য কেসে তদন্ত করতে করতে এখানে পৌঁছেছি। আর ওঁরা ডি.আই.জি. শেখরবাবুর দাদা আর দুই মেয়ে। আপনার তদন্ত যদি সব ঠিক থাকে, তাহলে ভয় পাওয়ারও তো কোনও কারণ নেই।"

সুদর্শনবাবু এবার একটু সমীহের দৃষ্টিতে দেখে বললেন, "কই, না তো, আমি ভয় পাচ্ছি না তো!" তারপর চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওই হাবিলদার যাও, চা লেকে আও। চার কাপ।" চারটে বসার চেয়ারও নিজেই জোগাড় করলেন।

প্রখর রুদ্র ফাইলটা থেকে দিলীপ বসাকের বাড়ির ঠিকানা নিয়ে ইন্দ্রাণীকে সেখানে পাঠিয়ে দিল। চেয়ারে বসে সুদর্শনবাবুকে প্রশ্ন করল, "আপনার তদন্তের ডিটেলসটা যদি একটু দেন?"

সুদর্শনবাবু একটু গলাখাঁকারি দিয়ে শুরু করলেন, "দিলীপ বসাকের দুটি বিজনেস ছিল। এক, কনট্রাক্টরি আর দুই, জমির ব্যাবসা। মানে কাঁচা টাকা প্রচুর। তিনটে গাড়ি আর দুটি বাড়ি। স্ত্রী আর এক মেয়ে। মেয়ের বয়স উনিশ। রাজারহাটের একটা ক্লাবে বিজনেস রিলেটেড মিটিংয়ে মাঝে মাঝেই যেতেন। ফেরার পথে সেখানেই সন্ধেবেলা স্কোয়াশ খেলে সুইমিং করে ফিরতেন। তা ওই বৃহস্পতিবার, সুইমিং পুলে আর কী ডুবেই...।"

"তা সুইমিং পুলের গভীরতা কত ছিল?"

সুদর্শনবাবু একটু বিরক্তই হলেন, "দেখুন মশাই, দিলীপবাবুর উচ্চতা পাঁচ পাঁচ। পুলের একদিকের উচ্চতা প্রায় সাত ফুট, অন্যদিকটা পাঁচ-ফুট। ওঁর দেহ পুলের মাঝামাঝি পাওয়া যায়– যেখানে ধরুন ছয় ফুটমতো গভীরতা। কিন্তু সেখানে লাশটা ভেসে ভেসেও আসতে পারে। তাই দাঁড়ালেই বেঁচে যেতেন, সেটা ভেবে দেখেছি কি না, এসব অতিকল্পনা প্লিজ দূরে রাখুন। এসব

boierpathshala.blogspot.com

আমি খতিয়ে দেখেছি।"

প্রখর রুদ্র ফাইল থেকে রাজারহাটের ক্লাবের ঠিকানাটা নিয়ে শিবানীকে পাঠাল সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে। এবার পোস্টমর্টেম রিপোর্ট ভালো করে দেখে বলল, "রিপোর্টে লেখা 'Death by drowning in water-simulated by food poisoning'। এটার কী মানে?"

"আরে মশাই, লেখাই তো আছে। কোনওভাবে Food poisoning-এর জন্য জলের মধ্যেই শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত সমস্যা হয়েছে তাই মারা গেছেন।"

প্রখর রুদ্র এবার সোজা হয়ে বসল, "তা Food poisoning কীসের থেকে হল? খুঁজে দেখেননি?"

"আপনি তো আচ্ছা লোক, মশাই। কোথায় রাস্তাঘাটে কী খাবার কোথায় খেয়েছেন তা কি খুঁজে দেখা অত সম্ভব? আর রাস্তাঘাটের খাবারে Food poisoning তো হতেই পারে। কতবার আমার ছেলের রাস্তার ফাস্ট ফুড খেয়ে পেট খারাপ হয়েছে।"

"তা আপনার ছেলে কি তার জন্য মারা গেছে?"

সুদর্শনবাবু এবার আরও খেপে গেলেন, "আরে থামুন মশাই।" এবার প্রদোষ চ্যাটার্জির দিকে ফিরে বললেন, "স্যার, অযথা আমার কর্মদক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন আপনারা? সন্দেহ নিরসনের জন্য আমরা বেশ কিছু খাবারের স্যাম্পল সংগ্রহ করেছিলাম। মানে, যেখানে যেখানে উনি সেদিন খাবার খেয়েছিলেন বা কিনেছিলেন। কিন্তু সব ক্লিন ছিল। কোনওভাবে Food poisoning হতেই পারে। অ্যাক্সিডেন্টালি! সেইজন্যই তো অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ!"

প্রদোষবাবু কিছু না বলে প্রখর রুদ্রর দিকে তাকালেন। প্রখর রুদ্র বলল, "ডা. মিত্র, মানে যিনি পোস্টমর্টেম করেছেন, তাঁকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে?"

সুদর্শনবাবু মুখ বেঁকিয়ে বললেন, "অ! আমার কথা বিশ্বাস হল না? ঠিক আছে, এই নিন ঠিকানা। যান, উনিও একই কথা বলবেন, ওই কী একটা বাতিস্তুতা নাকি বাস্তুলতা, তার জন্যই Food poisoning হয়েছে। যান যান!"

ঠিকানা নিয়ে প্রখর রুদ্র আর প্রদোষবাবু বেরিয়ে গেলেন। প্রখর রুদ্র বলল,

boierpathshala.blogspot.com

"মশাই সময় বড় কম। সবার কল রেকর্ড ইমিডিয়েট এনে লালবাজারে স্ক্যান শুরু করতে বলুন– দিলীপবাবুর, ওঁর বিজনেসের সঙ্গে যুক্ত লোকজন, বাড়ির লোকজন। সবাই। যদি কিছু পাওয়া যায়। কোনওদিক ছেড়ে রাখা উচিত হবে না।" প্রদোষবাবু নিশ্চুপে মাথা নাড়িয়ে লালবাজারে ফোন লাগালেন।

* * * * * * *

"আজ্ঞে, কাকে চাই?"

"আমার নাম ইন্দ্রাণী। আমি পুলিশেরই লোক বলতে পারেন। আমি একটা তদন্তের স্বার্থে দিলীপবাবুর ব্যাপারে জানতে এসেছিলাম।"

সামনে দাঁড়ানো মহিলার মুখে অভিব্যক্তি বদলে গেল—"মানে? আমার স্বামী মারা গেল। সে ব্যাপারে আপনাদের কোনও মাথাব্যথা নেই! দিব্যি অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ বলে দিলেন। এখন আপনাদের দরকারে এসেছেন! আমি কোনও কথা বলতে রাজি নই। বেরিয়ে যান আমার বাড়ি থেকে।"

ইন্দ্রাণী এবার শান্তভাবে মহিলাটির হাতের উপর হাত রাখল—"আমি আপনার স্বামীর ব্যাপারে জানতে এসেছি। আমারও মনে হয়, কোথাও একটা গলদ আছে! আমি চাই, আপনারা সুবিচার পান। কিন্তু তার জন্য পুরোটা জানা দরকার।"

ভদ্রমহিলা এবার কিছুটা কাঁদো কাঁদো হয়ে গেলেন। ইন্দ্রাণীকে ভিতরে বসার ঘরে নিয়ে এলেন, "বলুন?"

"যেদিন আপনার স্বামী মারা যান, সেদিন অস্বাভাবিক কিছু...?"

"না, সেরকম কিছু তো মনে তো করতে পারছি না।"

"উনি সেদিন কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন, এগুলো যতটা ডিটেলে জানেন, বলবেন কি?"

"উনি প্রত্যেক মাসে দু-বার ওই হোটেলটিতে যান। ব্রেকফাস্ট করেন। ওঁর পার্টনারের সঙ্গে মিটিং করেন। ওঁর পার্টনার কলকাতার বাইরে থাকেন। এলে ওই হোটেলটিতেই ওঠেন। তাই একটা ছেড়ে একটা, মাসের দুটি বৃহস্পতিবার উনি ওখানে যান। অফিসের কাছে বলে ফেরার সময় স্কোয়াশ খেলে ফেরেন

boierpathshala.blogspot.com

ওখান থেকেই। সপ্তাহে মঙ্গলবার আর বৃহস্পতিবার দু-দিন করে সন্ধেবেলা যেতেন স্কোয়াশ খেলতে। সুইমিং করে তারপর ফিরতেন সাড়ে দশটার দিকে।"

"সেদিনের খাওয়াদাওয়া?"

"বাড়ি থেকে চা খেয়ে বেরিয়েছিলেন। হোটেলে বলেছিলেন, বার্গার খেয়েছিলেন। প্রত্যেকদিনের মতো লাঞ্চ করেন অফিসের সামনের বউদির দোকান থেকে। তারপর... আর...র আমার সঙ্গে কথা হয়নি..." ভদ্রমহিলা বলতে বলতে কেঁদে ফেলেন।

"উনি সাঁতার কেমন জানতেন?"

ভদ্রমহিলা চোখ মুছে বললেন, "মানছি, ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার মতো জানতেন না। কিন্তু জলে ডুবে যেতে পারেন এতটাও অজানা ছিল না!"

"কোনও শত্রুতা?"

"দেখুন, ওঁর ব্যাবসাতে শত্রুর তো অভাব নেই! তবে ইদানীং পার্টনারের সঙ্গে একটি জমি নিয়ে মনোমালিন্য হচ্ছিল। তবে সেসবের জন্য উনি খুন করাতে পারেন কি না, আমি শিয়োর না।"

এতক্ষণ ঘরের ওপাশে দাঁড়িয়ে একটি কমবয়সী মেয়ে সব শুনছিল। চোখ পড়তেই ভদ্রমহিলা বললেন, "আমাদের মেয়ে সারেঙ্গি।"

ইন্দ্রাণী সারেঙ্গির দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কিছু জানো? সেদিন বাবার সঙ্গে কথা হয়েছিল?"

সারেঙ্গি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলল, "হ্যাঁ। স্কোয়াশ খেলার আগে! বলেছিল, তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। আর বলছিল, চোখে মাঝে মাঝে ঝাপসা দেখছিল আর কেমন মাথা ঝিমঝিম করছিল।"

ভদ্রমহিলা বললেন, "হ্যাঁ, সে হয়তো ওঁর প্রেশারের জন্যই। মাঝে মাঝেই বেড়ে যায়। ওষুধ সঙ্গেই থাকে।"

"ও আচ্ছা," বলে ইন্দ্রাণী উঠতে উঠতে শুকনো হেসে নিজের ফোন নম্বরটা ভদ্রমহিলাকে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

* * * * * * * *

boierpathshala.blogspot.com

"আপনি এটাকে অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ কেন মনে করছেন?"

ডা. মিত্র ভ্রূ কুঁচকে একবার পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা দেখে বললেন, "আমার রিপোর্টে তো কোথাও অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ লেখা নেই! আমার রিপোর্টে পরিষ্কার বলা আছে, Food poisoning হয়েছিল। সেটায় কোনও সন্দেহ নেই। আমি নিজে বডি পরীক্ষা করেছি। এবার পুলিশ সেই রিপোর্ট থেকে অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ কনক্লুশনে পৌঁছোবে নাকি খুনের তদন্ত করবে, সেটা তো তাদের বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করে।" এবার প্রদোষবাবুর দিকে ফিরে বললেন, "আমার কাজে আমি কোনও ফাঁকি দিইনি। কেস ইনভেস্টিগেট করা আমার কাজ না। ওটা পুলিশের কাজ।"

প্রখর রুদ্র বলল, "তাহলে ওঁর মৃত্যু Food poisoning-এর জন্য হল? নাকি বিষ ছিল?"

ডা. মিত্র আরও একটু বিরক্ত হলেন, "মিস্টার, কী নাম আপনার? যাই-হোক। আমি একজন টক্সিকোলজি এক্সপার্ট। ভুলে যাবেন না। আমি Food poisoning আর বিষ দিয়ে হত্যার পার্থক্য করতে জানি। তবে হ্যাঁ, ওঁর মৃত্যু যে ডাইরেক্ট Food poisoning-এর জন্য হয়েছে, বলাটা ভুল। মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ জলে ডুবে যাওয়ায়। Food poisoning-টা নিমিত্তমাত্র। রিপোর্টেও সে কথা ভালোভাবেই লেখা আছে। পুলিশ শুধু ওই জলে ডোবাটাই দেখছে আর আপনি Food poisoning-টা।"

প্রদোষবাবু এবার চোখ, মুখ বড় বড় করে বলল, "আপনার কথা আমি বুঝছি না, ডা. মিত্র। একবার বলছেন, ডুবে মারা গেছেন, আবার বলছেন Food poisoning।"

"দেখুন, বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছি। ওঁর দেহে যে ব্যাকটেরিয়ার ট্রেস পাওয়া গেছে তার সায়েন্টিফিক নেম Clostridium botulinum। সাধারণত কোনও কন্টেনার বা প্যাকেজজাত তৈলাক্ত সবজি বা মাংসের উপর জন্মায়। নষ্ট হয়ে যাওয়া খাবারেই একরকম হয় বলতে পারেন। এর ফলে যেটা হয়, সেটা প্রাথমিকভাবে চোখে ঝাপসা দেখা, মুখের মাসলের আড়ষ্টতা। এরপর আমাদের শিরদাঁড়ার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত নার্ভকে আক্রমণ করে সারা দেহ থেকে পাল্‌স

boierpathshala.blogspot.com

ব্রেনে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। ফলে একের পর এক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্যারালাইসিস হতে থাকে। একটা সময় আমাদের শ্বসনতন্ত্রও প্যারালাইসিস হয়ে যায়। এই ব্যাকটেরিয়ার spore খালি চোখে দেখা যায় না। ইনকিউবেশনে ২ থেকে ৪ দিন সময় লাগে। যদি সঠিক সময়ে দৈবাৎ ধরা পড়ে তো ভালো। না হলে আগামী আট দিনের মধ্যে যেকোনো সময় ওই ব্যক্তি মারা যাবেন। এখন দিলীপবাবুর ক্ষেত্রে, উনি যখন পুলে ছিলেন তখনই মাসল প্যারালাইসিস হয়। হাত-পা নাড়তে না-পারার ফলে জলে ডুবে যান। তারপর যা হয়। নাক দিয়ে ফুসফুসে জল ঢুকে... কী আর বলবো বলুন। এটুকুই বলব ওইদিন পুলে ডুবে মারা না গেলেও আগামী কয়েকদিনে তিনি মারা যেতেনই শ্বসনতন্ত্র ফেল করে। মানে যদি ধরা না পড়ত।"

প্রখর রুদ্র এবার চিন্তিত মুখে বলল, "কতক্ষণ আগে ওঁর দেহে botulinum ঢুকেছিল, কিছু অনুমান?"

"দেখুন, একদম ঠিক সময় বলাটা একটু মুশকিল। তবে এটুকু বলতে পারি, সেদিনই ঢুকেছিল। হয়তো আট-দশ ঘণ্টা আগে। কারণ ওঁর পাকস্থলীতে আনডাইজেস্টেড যে ফুড পাওয়া গেছে, তাতেও Clostridium botulinum-এর যথেষ্ট ট্রেস আছে।"

"ডা. মিত্র, আমি যদি খুব ভুল না বলি তাহলে, কোনও খাবারে botulinum গ্রো করলেও যদি আমরা সেটাকে মিনিমাম ১২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে উষ্ণ করি, তাহলে তার টক্সিসিটি আর থাকে না? তখন তো সেই খাবার সেফ!"

"আপনি একদম ঠিক, মিস্টার।"

"তাহলে কি এরকম হতে পারে যে ওঁকে জেনে-বুঝে এরকম খাবার দিয়েছে, যাতে botulinum ছিল?"

ডা. মিত্র এবার ভীষণই বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, "সবকিছুতে আপনারা যে মানুষের খুনের গন্ধ কেন পান, আমি বুঝি না। ২০১৫ সালেই খোদ মার্কিন যুক্তরাজ্যেই গত চল্লিশ বছরের মধ্যে সব থেকে বড় botulinum আউটব্রেক হয়েছিল। অনেক লোকই মারা গিয়েছিল। আপনি কি তাকে চক্রান্ত বলবেন? এরকম হওয়াটা অস্বাভাবিক কিন্তু অসম্ভব নয়।"

boierpathshala.blogspot.com

"কিন্তু গত কয়েকদিনে আশপাশের কোনও জেলায় botulinum-এর কারণে মারা যাওয়ার একটিও খবর নেই।"

মিত্র মশাই আরও বিরক্ত হয়ে গেলেন, "গ্রাম-বাংলায় কে কীসে মরছে, তার সব খবর কি মশাই আপনি নিয়ে রেখেছেন? গিয়ে দেখুন, শ্মশানে গিয়ে হয়তো সে মড়া পোড়ানোও হয়ে গেছে। আর তা ছাড়া মশাই, আগেও বলেছি, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বানানো আমার কাজ। এবার সেটা ষড়যন্ত্র নাকি স্বাভাবিক, সেটা খুঁজে বের করা পুলিশের দায়। আমার নয়।"

* * * * * * *

শিবানী হোটেলে পৌঁছেই সেদিনের সিসিটিভি ফুটেজটা আগে ভালো করে দেখল। অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না। সকাল ন-টায় দিলীপবাবু পার্টনারের সঙ্গে মিটিং করেছেন। একটা বার্গার অর্ডার দিয়ে খেয়েছেন। দিলীপবাবুর অফিসের সিসিটিভি ফুটেজেও তিনি সারাদিন স্বাভাবিকভাবেই কাজ করেছেন, দু-বার সাইট দেখার জন্য বেরিয়েছিলেন। ম্যানেজার প্রণবেশের কথানুযায়ী, দিলীপবাবু আর প্রণবেশ অফিসের সামনের বউদির দোকান থেকে লাঞ্চ করেছেন। বিকালের দিকে পাশের মিষ্টির দোকান থেকে গরম গরম জিলিপি এনে খেয়েছেন। বিকালে ওই একই হোটেলে ফিরে এক কাপ চা, দুটো বিস্কুট আর একটা শিঙাড়া খেয়েছেন। তবে এবার তাকে সিসিটিভি ফুটেজে একটু দুর্বল লাগছিল। কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছিলেন। সব দেখে শিবানী হোটেলের সিকিয়োরিটিকে জিজ্ঞাসা করে, "লাশ পুলে কে দেখতে পেয়েছিল প্রথম?"

"আজ্ঞে, ম্যাডাম, আমিই দেখেছিলাম। আমি ওই সিসিটিভি ঘরে থাকি। হঠাৎ দেখি, পুলের মধ্যে স্যার ভাসছেন। হাত-পা চলছে না। আমি নিজেই গিয়ে দেখি এই অবস্থা। আমাদের এখানে একজন ফিজিশিয়ান সব সময়ই থাকেন। তিনি দেখে বললেন দিলীপবাবু আর নেই। তিনিই ম্যানেজারকে পুলিশে খবর দিতে বলেন।"

"তোমরা দিলীপবাবুকে সবাই ভালোভাবে চিনতে?"

boierpathshala.blogspot.com

"আজ্ঞে, উনি মাঝে-মাঝেই আসতেন। তবে সব থেকে ভালো চিনত রমাপদ। আমাদের স্কোয়াশ জোনের যে ক্লিনিং স্টাফ। স্যারের সবকিছু খেয়াল রাখত। মোটা বকশিশও দিত ওকে। ওর সঙ্গে অনেক কথা হত শুনেছি।"

শিবানী এবার রমাপদকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, "সেদিন কি দিলীপবাবু তোমায় কিছু বলেছিলেন?"

রমাপদ বলল, "বিকালে যখন এলেন, বললেন, শরীরটা অতটা ভালো লাগছে না। অন্যদিন মোটে না হলেও এক ঘণ্টা তো খেলেনই। সেদিন আধ ঘণ্টা পর কেমন যেন ক্লান্ত লাগছিল। আমিই বললাম সেদিনটা রেস্ট নিতে। তারপর পুলের দিকে চলে গেলেন। হ্যাঁ, যাওয়ার আগে সেদিন পাঁচশো টাকা দিয়ে বলেছিলেন, 'টাকাপয়সা থাকা অনেক ঝামেলার, বুঝলে রমাপদ!' আমি কেন জিজ্ঞাসা করায় বললেন, যে ওঁর ওই ব্যাবসার অংশীদারদের সঙ্গে কী সব ঝামেলা। অত তো খুলে বলেননি।"

শিবানী হোটেলের রেজিস্টার দেখে পার্টনারের ফোন নম্বর নিয়ে ফোন করল, "আমি কি দীনেশ কানোজিয়ার সঙ্গে কথা বলছি?"

"হ্যাঁ বালছি... বালেন..."

"লালবাজার থেকে ইনস্পেকটর শিবানী কথা বলছি। দিলীপবাবুর মৃত্যুর ব্যাপারে জানতে ফোন করলাম।"

"হামি ম্যাইডামজি নাতুন করে কী বালবে। সাব তো পুলিশকে বোলিয়ে দিছি। সেদিন সোকালে হামাদের হোটেলে কাথা হল। উনি ঠিক ছইলেন। তারপার তো আফিস গেলেন। হামি পাটনা ফিরে আইলাম।"

"আপনাদের মধ্যে কিছুদিন ধরে একটা কিছু নিয়ে সমস্যা হচ্ছিল। সেটা কী ব্যাপার?"

"সেটা তো হামাদের ব্যাবসার সিক্রেট ব্যাপার, ম্যাইডামজি। হামি অ্যাসুয়ার কোরছি, ইর সঙ্গে ডিলীপের মারা যাওয়ার কুছু কানেকশন নাই। তাছাড়া ও তো জলে ডুবে মাইরা গেছে।"

"দীনেশবাবু, তদন্তটা আমাদের উপর ছাড়ুন। আপনি কারণটা বলুন। না হলে শুধু শুধু আমাকে পাটনা পুলিশকে ফোন করতে হবে।"

boierpathshala.blogspot.com

এবার মনে হল দীনেশবাবুর গলা চড়ে গেল, "আপনে হামায় ভয় দিখাইছেন! আরে শুনেন, দীনেশ কানোজিয়া কার ডরায় না। ডিলীপকে খুন করতে হলে হামার লোক আছে, দুটো গোলি খারাচ কোরতে বেশি টাকা লাইগে না, ম্যাইডামজি। এসোব জলে ডোবা-ফোবাতে হামি নেই। আর সোনেন, রাজারহাটের কাছে পাঁচ বাচ্ছর আগে একসঙ্গে জামিন কিনিয়েছিলাম। তার কিমত ইখন পাঁচগুণ। আমি বেচতে চাই– হামার টাকার দোরকার। মাগার ডিলীপ রাজি ছিল না। হামি এত বোকা নই, ম্যাইডামজি। উকে খুন করাইলে হামার দিকেই পুলিশের নাজর আসবে! কোর্ট-কাছারি ইসব আমার মোতো লোইকের জন্য বড়ো পাড়েশানি আছে। বুঝেনই তো।"

"ঠিক আছে, দীনেশবাবু। কোনও দরকার হলে আপনাকে ফোন করব আবার। ফোন সুইচ অফ পেলে পাটনা পুলিশকে ফোন করতে বাধ্য হব।"

"ম্যাইডামজি, শাধু শাধু ইসবে হামায় জাড়াইছেন। ঠিক হ্যায়। তা-ই হোবে।"

শিবানী ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল প্রায় আড়াইটা। সময় যেন ঝড়ের গতিতে ছুটছে। জেঠু আর ইন্দ্রাণীকে কনফারেন্স কল করল, "তোমরা এখানেই চলে এসো। দুপরের লাঞ্চটা তো সেই করতেই হবে। আর তা ছাড়া সবাই মিলে একবার বসে সব দিকটা আলোচনা করে দেখাটা দরকার।" ফোন রাখতেই মনে হল, পিছনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল— রমাপদ।

রমাপদ কিছুটা অপ্রতিভ হয়ে বলল, "ওখানে ম্যানেজার সামনে ছিল বলে বলতে পারিনি, ম্যাডাম। বার বার পুলিশ আসছিল ওই স্যারের মৃত্যুর কারণ জানতে। বলছিল নাকি হোটেলের খাবার ভালো ছিল না, সেসব খেয়েই স্যার মারা গেছেন। স্যার খুব ভালো মানুষ ছিলেন," রমাপদ চারিদিকটা একবার ভালো করে দেখে নেয়, তারপর গলা নামিয়ে বলে, "আমি ম্যানেজারবাবুকে দেখেছি পুলিশকে টাকা দিতে। আমাদের খাবার খেয়ে যদি স্যার মারা গিয়ে থাকেন, তাহলে কিছু করুন। না হলে, কাল আবার অন্য কেউ মারা যাবে। আমি আসি।" রমাপদ পিছন ফিরে হনহন করে চলে গেল।

সাড়ে তিনটের দিকে সবাই একসঙ্গে খেতে খেতে আলোচনা শুরু হল। প্রদোষবাবুই শুরু করলেন, "দেখুন প্রখরবাবু। এখনও পর্যন্ত আমরা যা যা

boierpathshala.blogspot.com

পেলাম তাতে কিন্তু আমি ডা. মিত্রর সঙ্গে একমত। Food poisoning-এর কারণে অ্যাক্সিডেন্টালি ভদ্রলোক মারা গেছেন। মানছি, Food poisoning হওয়াটা হয়তো উচিত ছিল না। তার জন্য আমি না হয় ফুড কর্পোরেশনে একটা ফোন করে জানাতে পারি। কিন্তু Food poisoning আমাদের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না।"

প্রখর রুদ্র একটু চিন্তিতভাবে বলল, "সেটা আমি বুঝেছি। শুধু এটাই বুঝছি না, প্রতীক শুধু শুধু একটা অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথের কেস আমাদের দিয়ে পাঠাবে কেন?"

শিবানী চিন্তিত মুখে বলল, "সেটাই হয়তো ওর ষড়যন্ত্র। ও চায় আমরা একটা অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথকে মেনে নিতে না পেরে, গোলকধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে সময় নষ্ট করে ফেলি।"

প্রদোষবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "পয়েন্ট। দেখুন, আমাদের হাতে কিন্তু আর খুব বেশি সময় নেই। প্রতীকের প্রতি ফোকাস করাই ভালো। দিলীপবাবুর পার্টনার কিছু বললেন?"

"ঘোড়েল লোক। খুব বেশি জানা গেল না। যা বুঝলাম, চাইলে উনি খুন করাতেই পারতেন কিন্তু ও পথ তিনি মাড়াননি। আরও খোঁজখবর নিতে হবে।"

প্রখর রুদ্র চোখ বন্ধ করে বলল, "সেই সময়টা আমদের কাছে নেই রে, বানী। আরও একটা বার যদি খুনের থিয়োরিটাতেই চোখ বোলাই তাহলে দাঁড়ায় এই যে, কেউ যদি জেনেশুনে ব্যাকটেরিয়া দিয়ে থাকে, তাহলে কখন দিল? আর কীসে ছিল?"

প্রদোষবাবু বলে উঠলেন, "ডা. মিত্র যে বললেন, মিনিমাম চার-পাঁচ ঘন্টা লাগে উপসর্গ দেখা দিতে। তাহলে আমার মনে হয় ব্রেকফাস্ট থেকে লাঞ্চের মধ্যেই কোথাও। মানে যদি কেউ দিয়ে থাকে আর কী!"

ইন্দ্রাণী বলে উঠল, "রান্না করা তরকারিতে botulinum থাকবে না। গরম করা খাবারে কোনও এফেক্ট থাকে না। আর botulinum খোলা হাওয়ায়, মানে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে গ্রো করে না।"

শিবানী বলল, "সিসিটিভি-তে দেখেছি, ব্রেকফাস্টে উনি একটা বার্গার

boierpathshala.blogspot.com

খেয়েছিলেন। জেঠুর হোয়াট্‌সঅ্যাপ পেয়ে আমি জিজ্ঞাসা করে দেখেছি, হোটেলে বার্গার, স্যান্ডউইচ সব গরম করেই দেওয়া হয়।"

ইন্দ্রাণী মাথা নেড়ে বলল, "তাহলে এর মধ্যে কি রাস্তার কিছু খেয়েছিলেন? যদি না কেউ botulinum ইচ্ছে করে দিয়েই থাকে, তাহলেও বা সেটা এল কোথা থেকে!"

হঠাৎ করেই ইন্দ্রাণীর ফোন বেজে উঠল, "হ্যালো, আমি দিলীপ বসাকের স্ত্রী বলছি। একটা কথা। খুবই সাধারণ কথা কিন্তু আপনাদের কোনও কাজে লাগবে কি না..."

"বলুন।"

"আজ্ঞে, ওইদিন সকালে ও ফোন করেছিল। বলেছিল, সেদিনও নাকি ওকে হোটেলে ঠান্ডা বার্গার দিয়েছিল।"

"সেদিনও মানে?"

"এর আগেও দু-বার দিয়েছিল তো গত মাসে। কিন্তু ও ওয়েটারকে ডেকে আবার গরম করিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু ওইদিন ওর দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাই ঠান্ডাটাই খেয়ে তাড়াতাড়ি অফিস চলে যায়।"

"আপনি শিয়োর?"

"একদম। ও নিজেই ফোন করে বলেছিল।"

"থ্যাঙ্ক ইউ, মিসেস বসাক। আপনি অনেক বড় লিড দিয়েছেন," ইন্দ্রাণী ফোন রেখে বলল, "আমি শিয়োর এটা খুন।"

শিবানী অবাক হয়ে বলল, "মানে?"

ইন্দ্রাণী বলল, "একবার ঘটলে দুর্ঘটনা, দু-বার হলে সমাপতন আর তিনবার হলে শত্রুর ষড়যন্ত্র। দিলীপবাবুকে গত মাসে দু-বার ঠান্ডা বার্গার সার্ভ করা হয়েছিল। আর গত বৃহস্পতিবার আবার। শুধু আগের দু-দিন উনি খাননি আর বৃহস্পতিবারেরটা খেলেন।"

শিবানী এবার বিড়বিড় করে বলল, "আর সেটাই কাল হল। ম্যানেজার সুদর্শনবাবুদের মোটা ঘুস দিয়েছেন। দুই আর দুই কি হচ্ছে?" ইন্দ্রাণীর হাত ধরে টেনে তুলতে তুলতে বলল, "তাড়াতাড়ি চল তো, সিসিটিভি দেখব।

boierpathshala.blogspot.com
2021/5/8
BY MOTAYISH

আগের দু-দিনও কি একই ওয়েটার সার্ভ করেছে! তাহলে আমাদের সন্দেহটার একটা হিল্লে হবে।" ইন্দ্রাণী নিশ্চুপ সম্মতি দিল। চারজন মিলে দ্রুত সিসিটিভি রুমে ঢুকে আগের দু-দিনের ফুটেজ দেখেও চোখ কপালে উঠে গেল— একই ওয়েটার! ম্যানেজারকে ডেকে পাঠানো হল।

ম্যানেজার আসতেই শিবানী ভণিতা না করেই জিজ্ঞাসা করল, "পুলিশকে ঘুস দিয়েছিলেন কেন?"

ম্যানেজার চৌধুরি অসাধারণ চটুলতায় বলে উঠল, "ছিঃ ছিঃ ম্যাডাম, কী বলছেন! আমি আর ঘুস..." কিন্তু কথা শেষ করার আগেই প্রদোষবাবুর একটি বিরাশি সিক্কার চড় তার গালে সপাটে আছড়ে পড়ল, "নষ্ট করার মতো সময় আমাদের নেই। এই ওয়েটারটাকে আপনি কত টাকা দিয়েছিলেন? কেন দিয়েছিলেন? সরাসরি বলবেন, নাকি লালবাজার যাবেন?"

চৌধুরি যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল, "বলছি বলছি। সব বলছি। আসলে হোটেলের রেপুটেশনের ব্যাপার। আমাদের খাবারের বদনাম হলে হোটেল বন্ধ হতে বসত। তাই আর কী ব্যাপারটা ধামাচাপা..."

প্রদোষবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "আর ওই ছোকরা ওয়েটার?"

"আজ্ঞে, ও তো কিছুদিনের জন্য ইন্টার্ন এসেছিল। আমার সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্ক নেই। সত্যি বলছি, স্যার..."

আবার প্রদোষবাবুর একটা বিরাশি সিক্কার চড়। চৌধুরি হাত জোড় করে বলতে শুরু করল, "বিশ্বাস করুন স্যার। আমি সব বলছি আপনাকে। প্লিজ বিশ্বাস করুন।"

সেই সময়ই লালবাজার থেকে কনস্টেবল কানুর ফোন, "স্যার, দিলীপবাবুর কল রেকর্ডে একটা নম্বর... বড় অদ্ভুত। বুঝতে পারছি না ঠিক!"

* * * * * * * *

রাত আটটা বাজে। লালবাজারের ইন্টারোগেশন রুমে প্রদোষবাবু কমবয়সি দুটি ছেলেকে টানতে টানতে নিয়ে প্রতীকের সামনে দাঁড় করালেন, "এই নে তোর অপরাধী। এখনও এক ঘণ্টা বাকি।"

boierpathshala.blogspot.com

প্রতীক কিছুক্ষণ অবাকভাবে ছেলেগুলির দিকে তাকিয়ে থাকল, বয়স বড়জোর একুশ হবে। তারপর প্রখর রুদ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, "হতে পারে। আমি কারও মুখ চিনি না। তা কী করে সল্‌ভ হল, একটু শুনি!"

প্রখর রুদ্র একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল, "হোটেলের ম্যানেজারটির কথানুযায়ী হোটেল ম্যানেজমেন্ট কলেজে গিয়ে দেখি, যে ওয়েটারটি সেদিন বার্গার সার্ভ করেছিল, সে সেখানে নেই। ভুয়ো আইডেন্টিটি। ভুয়ো সুপারিশ লেটার নিয়ে হোটেলে যোগ দিয়েছিল। হোটেলের ম্যানেজারের লোভের জন্যই এই ক্রাইমটা হল! কোনওরকম ব্যাকগ্রাউন্ড ভেরিফাই না করেই রেখে দিলেন আর কমিশন বাবদ একটা ওয়েটারের যা মাইনে হয় তার হাফ নিজের পকেটে ঢোকালেন। ভেরিফাইড সোর্স থেকে নিলে এটা করতে পারতেন না, তাই জেনেশুনেই চৌধুরি আইন ভাঙলেন। যা-ই হোক..."

"তা এই ছেলেটিই বুঝি সে?"

প্রখর রুদ্র ধীরে ধীরে বলল, "ডানদিকেরটি ওয়েটার, বাঁদিকেরটি মাস্টারমাইন্ড। বন্ধুকে সাহায্য করার এত ইচ্ছে যে অপরাধ করতেও হেল্প করে বসেছে। তবে কনস্টেবল কানু না থাকলে বোধহয় এই কেসটার সমাধান হত না। কানু একটা আউটগোয়িং নম্বর দিলীপবাবুর ফোন রেকর্ডে বারকয়েক পেয়েছিলেন। আর সেই নম্বরটি দিলীপবাবুর মেয়ে সারেঙ্গির কল রেকর্ডেও বেশ কয়েকবার পাওয়া গেছে। দিলীপবাবুর মৃত্যুর পরদিন থেকে সুইচ অফ। সারেঙ্গিকে চেপে ধরে জেরা করতেই বলল ওই নম্বরটা তার বয়ফ্রেন্ডের। ঠিকানা সে-ই দিল। গিয়ে দেখি সেখানে এই দুটো বসে! তারপর প্রদোষবাবু ভালো করে আদর যত্ন করতেই সব স্বীকার করল।"

প্রদোষবাবু বলতে শুরু করলেন, "বাঁদিকের ছেলেটি সারেঙ্গিকে লুকিয়ে বিয়ে করেছে। দিলীপবাবু জানতে পেরে সারেঙ্গির থেকে ফোন নম্বর নিয়ে ফোন করে দেখা করেন ছেলেটির সঙ্গে। তিনি এই বিয়ে ভালো চোখে নেননি। তাই ডিভোর্স ফাইল করতে চাইছিলেন, লোক জানাজানি হওয়ার আগেই। সারেঙ্গিও দিন দিন তার বাবার দিকেই চলে যাচ্ছিল। তাই ইনি বন্ধুকে পাঠিয়ে দিলীপবাবুকে খুন করার প্ল্যান করলেন।" প্রদোষবাবু ছেলেটির গালে আবার

boierpathshala.blogspot.com

একটা সজোরে চড় বসালেন, "ডিভোর্স না চাইলে, আইনের সাহায্য নিতিস। তা বলে খুন! কী ভেবেছিলি, কেউ ধরতে পারবে না!"

প্রখর রুদ্র বললে উঠল, "ছেড়ে দিন প্রদোষবাবু, আর মারবেন না। কম বয়সে ছেলে-মেয়েগুলো প্রেমে পড়ে। প্রেমের থেকে নিষ্পাপ কিছু হয় না। তারপর এরাই যে কেন অপরাধের রাস্তায় হাঁটে কে জানে! দিলীপবাবুর মেয়ে তো এসবের কিছুই জানত না। সব শুনে এত ভেঙে পড়েছে, জানি না তার বাকি জীবনটা কীভাবে কাটবে।"

প্রতীকের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল, "তা প্রখরবাবু, একটা ২১ বছরের ছেলের হাতে কী করে Clostridium botulinum, সন্দেহ হল না একবারও?"

প্রখর রুদ্র হঠাৎ ধাক্কা খেল। ছেলে দুটির সামনে ছুটে গিয়ে দাঁড়াল, "তোদের botulinum কে দিয়েছিল বল।"

সারা সন্ধের উত্তম-মধ্যমের পর ছেলেগুলোর এমনিতেই কাঁদো কাঁদো অবস্থা, "স্যার, সত্যি বলছি। আমরা তো পেপারে অ্যাড দেখে মেল করেছিলাম। দশ হাজার টাকাও নিয়েছিল। তারপর পার্সেলে করে একটা তরলের বোতল এসেছিল। হালকা বাদামী রঙের। খুব পচা গন্ধ। আমাদের বলা ছিল, কয়েক ফোঁটা নিয়ে কোনও বাসি হ্যামের সঙ্গে মিশিয়ে সার্ভ করতে। আর গরম না করতে।"

"কী ছিল বোতলে, বল আগে?"

প্রতীক হেসে উঠল, "ওরা জানবে না, মিস্টার রুদ্র। আমি বলে দিচ্ছি। একটা আলুর সুপ ছিল। বানানোর পর হয়তো প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ দিন কোনও প্রিজার্ভেটিভ ছাড়াই বন্ধ করে রাখা ছিল রুম টেম্পারেচারে। botulinum-এর আদর্শ প্রজননকেন্দ্র! যেসব খাদ্যের pH ৪.৫-র নীচে হয়, মানে অ্যাসিটিক জাতীয় খাদ্য, তাতে botulinum জন্মায় না, যেমন টম্যাটো। একটা ওয়েলি আলুর সুপের pH ৪.৫ উপরে।"

প্রখর রুদ্র ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, "কে দিয়েছিল তোদের? বল। ডার্ক হর্স?"

ছেলেগুলো আবার ভয়ে কেঁদে ওঠে, "সত্যি বলছি স্যার, জানি না। পেপারে

boierpathshala.blogspot.com

লেখা ছিল 'ড. হাজরা'। আসল নাম জানি না।"

প্রখর রুদ্র প্রতীকের দিকে ফিরে বলল, "ড. হাজরা?"

প্রতীক চেয়ারের উপর চোখ বন্ধ করে আয়েস করে বসল, "আমি তো আগেই বলেছিলাম, মিস্টার রুদ্র। এই খেলায় আমি একা নই। সবাই গা-ঢাকা দিয়ে আছে। This is not the end of the game. This is just the beginning. সকালেই তো আপনাদের বলতে যাচ্ছিলাম, এই গেমের সব থেকে খতরনাক খেলোয়াড় 'ড. হাজরা'। কিন্তু প্রদোষবাবু ধমকে থামিয়ে দিলেন তখন।"

প্রদোষবাবু ইশারায় ছেলে দুটিকে বাইরে নিয়ে যেতে বললেন। কানু বাইরে নিয়ে যেতেই, প্রখর রুদ্র রাগে ফেটে পড়ল, "বাস্টার্ড! আমরা ড. হাজরাকে পরে দেখে নেব। আগে তুই এবার তোর পার্টনারের নামগুলো দে!"

প্রতীক তাচ্ছিল্যভরে হেসে উঠল, "হা হা হা। পরে আর সময় পাবেন না, রুদ্র মশাই। যা-ই হোক, এই খেলায় জিতে গেছেন যখন, নাম আপনি পাবেন। অনেক নাম বুঝলেন কিনা। মনে করে লিখতে হবে। একটা কাগজ-কলম দিয়ে যান। আর আপনারা কাল সকালে আসুন।"

প্রদোষবাবু রেগে গেলেন, "আর কোনও চালাকি নয়, প্রতীক। আর এক্ষুনি নামগুলো চাই।"

"এক্ষুনি দিলে আর প্রমাণ দিতে পারব না। তাতে আপনার চলবে তো? আমাকে ভেবে লিখতে দিন, কার জন্য কোথায় প্রমাণ লোকানো আছে। না হলে দশ-বারোটা নাম নিয়ে আপনি কী করবেন? কিছুই প্রমাণ করতে পারবেন না"

প্রখর রুদ্র প্রদোষবাবুকে শান্ত করল। প্রদোষবাবু কানুকে একটা কাগজ কলম দিতে বললেন আর ২৪ ঘণ্টা প্রতীকের উপর কড়া দৃষ্টি রাখতে বললেন। ইন্টারোগেশন রুম থেকে যখন প্রখর রুদ্র বেরিয়ে যাচ্ছে, পিছন থেকে প্রতীক আবার বলে উঠল—"মিস্টার রুদ্র, This is not the end of the game. This is just the beginning. ঝড় আসছে। ঘর সামলে নিন। পরে আর সুযোগ পাবেন না।"

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

প্রতীক-ই পরাজয়

লোকটা প্রতীকের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে। প্রতীক ঝাপসা চোখে দেখে, একজন ডাক্তার মুখে মাস্ক লাগিয়ে ঝুঁকে পড়ে তার নাড়ি দেখছে। প্রতীক কষ্ট করে মুচকি হেসে বলল, "আপনি এসেছেন?"

"তা-ই তো কথা ছিল, ডার্ক হর্স। দ্য শো মাস্ট গো অন! ঠিক তুমি যেভাবে চেয়েছিলে, সেভাবেই।"

*　　*　　*　　*　　*　　*　　*　　*

প্রতীকের সেলে প্রদোষবাবু, প্রখর রুদ্র, শিবানী আর ইন্দ্রাণী পরদিন সকাল সকাল এসে পড়ে। উঁচু বসার জায়গাটায় প্রতীক পদ্মাসনে বসে গভীর ধ্যানে মগ্ন। কয়েকদিনের না কাটা দাড়িতে এখন তাকে অনেকটা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর মতো লাগছে। প্রখর রুদ্র তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, "কীসের প্রস্তুতি নিচ্ছ হে?"

প্রতীক ধীরে ধীরে চোখ খোলে, "যুদ্ধ তো শেষ হতে চলল। তাই এবার অশ্বত্থামার বিদায় আর কৃষ্ণর মৃত্যুটাই তো বাকি!"

প্রদোষবাবু কড়া পুলিশ হলেও রসিক মানুষ, "তা কেষ্টাটা কে? আর অশ্বত্থামাই বা কে হে?"

প্রতীক ততটাই শান্তভাবে উত্তর দেয়, "কেন, এই ঘরে একজনই আছেন, যিনি নিজে যুদ্ধ করেন না। পরামর্শ দেন। তাঁর হয়ে যুদ্ধ করেন 'রুদ্র পাণ্ডব'। ও না, ভুল হল। ওরা চার আর আপনি পাঁচ। 'রুদ্র অ্যান্ড ফ্রেন্ডস পাণ্ডব'।"

প্রতীক এবার নিজেই হাসতে শুরু করে।

প্রদোষবাবু এই অসম্মানটা ঠিক হজম করতে পারেন না, "কী? তুমি আমার সামনে একজনকে হত্যার হুমকি দিচ্ছ? তুমি কি ভাবলে, তুমি অশ্বত্থামার মতো

অমর হয়ে যাবে! এখান থেকে বের হতে পারলে তো? দেখ-না, তোকে শালা কত বছরের ঘানি টানাই।"

প্রতীক হঠাৎই চুপ করে গিয়ে আবার নির্বিকার মুখে বলে, "মিস্টার চ্যাটার্জি, আমি ঘানি টানার জন্য জন্মাইনি। মহাভারতে চক্রব্যূহের সাতজন মহারথীর দরকার ছিল। এখানে আপাতত আমি একাই কাফি! সময় হলেই বুঝে যাবেন। যা-ই হোক, বাজে কথা ছাড়ুন। এই নিন, সরকারপক্ষ-বিরোধী পক্ষ সব মিলিয়ে বাঘা বাঘা ১৫ জনের নাম। এদের যদি ধরতে পারেন, তাহলে শ-দেড়েক চুনোপুঁটি এমনিতেই পাবেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, সেটা আপনারা আদৌ পারবেন না! কারণ এঁরা ওই বিধানসভা আর মিডিয়াতেই বিপক্ষ-বিপক্ষ খেলেন। আসলে সবাই এক গোয়ালের গোরু। এঁদের অনেকেই একে অন্যকে সহ্য করতে পারেন না, রাজনৈতিক স্তরে; কিন্তু দেখুন, তাঁরাই পার্টনারশিপে ড্রাগ র‍্যাকেট চালাচ্ছেন। এঁদেরকে টাইট দিতেই 'নাইন মেন অফ এম্পেরর'-এর দরকার ছিল। কিন্তু প্রখরবাবু তো..." প্রতীক একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে।

প্রখর রুদ্র এবার দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল, "বাজে কথা ছাড়ো। প্রমাণ কোথায়?"

প্রতীক নামের লিস্টগুলো বাড়িয়ে দেয়, "আমার কোন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে, কোন লকারে কী ডকুমেন্ট আছে, তার সব লিস্ট। যদি আইন দৃঢ় হয় তাহলে সেগুলোই যথেষ্ট হবে।"

প্রদোষবাবু একবার লিস্টটায় চোখ বুলিয়ে বললেন, "নাইস! যদি না পাই কিছু তাহলে আমার লাঠি আর তোর পিঠ তো থাকলই।"

"Death. Death is the only permanent, Mr. Chatterjee।"

প্রতীক নিজের জায়গা থেকে উঠে পড়ে পায়ে পায়ে ইন্দ্রাণীর কাছে এসে দাঁড়ায়, "I will miss you a lot."

ইন্দ্রাণী কী বলবে না বুঝতে পেরে প্রতীকের দিকেই তাকিয়ে থাকে। প্রতীকের চোখে একটা কেমন অসম্ভব অব্যক্ত যন্ত্রণা আছে। এর আগে কি কেউ দেখেনি! ইন্দ্রাণী অবাক হয়ে ভাবতে থাকে, লোকটা কি সত্যি এতটা শয়তান, নাকি শুধুমাত্র নিজের কাকাকে হারানোর যন্ত্রণাটা সহ্য করতে না পেরেই ভুল পথ বেছে নিল! শিবানী ইন্দ্রাণীর হাত ধরে পিছনে টেনে নেয়, "যথেষ্ট হয়েছে,

boierpathshala.blogspot.com

প্রতীক। আর কত বোকা বানাবে ওকে।"

প্রতীক মুচকি হেসে বলে ওঠে, "ইন্দ্রাণী লম্বা রেসের ঘোড়া! প্রখরবাবু চিনতে ভুল করেননি। তাই জন্যেই শিবানী ম্যাডাম, আপনি পুলিশে ভরতি হওয়ার সময় আপনার কাকা আপত্তি জানাননি, ইন্দ্রাণীর বেলায় জানিয়েছিলেন। আসলে বুদ্ধিমত্তা আর ক্ষমতা একসঙ্গে হলে হয়তো অনেকেরই সমস্যা হয়ে যেত। কী বলেন প্রখরবাবু?"

প্রখর রুদ্র কিছু বলার আগেই শিবানী কিছুটা রেগে ওঠে, "এতসব আপনি জানলেন কী করে? আর তা ছাড়া এসব আমাদের ফ্যামিলির নিজস্ব ডিসিশন।"

"নিশ্চয়ই। হা হা হা," ইন্দ্রাণীর দিকে ফিরে প্রতীক আবার বলতে থাকে, "আসলে কী জানো ইন্দ্রাণী, তুমি প্রখর রুদ্রর তুলনায় প্রখরতর। শুধু সমস্যা, তুমি প্রয়োজনের তুলনায় বেশি আবেগপ্রবণ। আমার একটা অসমাপ্ত কাজ আছে, যেটা তোমার মতো একজন আবেগপ্রবণ বুদ্ধিমান মানুষই করতে পারবে। তা ছাড়া তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই যে আজকাল আর বিশ্বাস করতে পারি না!"

শিবানী এগিয়ে এসে প্রতীকের চোয়াল লক্ষ্য করে সজোরে চড় কষায়, "স্কাউন্ড্রেল! তোর কোনও কাজই ইন্দ্রা করবে না। ইন্দ্রাণী, এর একটা কথাও বিশ্বাস করিস না।" ইন্দ্রাণী অবাক হয়ে সব দেখতে থাকে। আসলে সবকিছুই এত দ্রুত ঘটে চলেছে, সে বুঝতেই পারছে না তার ঠিক কী করা উচিত।

প্রতীক ইন্দ্রাণীর দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে ককিয়ে ওঠে, "ইন্দ্রাণী, একজন মানুষের একটা ইচ্ছে তুমি পূরণ করবে না? আমার একটা গল্প শোনো শুধু। তারপর তুমি যা বলবে, মেনে নেব।"

প্রখর রুদ্র চিৎকার করে ওঠে, "বাস্টার্ড। আর কোনও গল্প না। অনেক হয়েছে।"

প্রতীক কাঁদো কাঁদো হয়ে ওঠে, "প্লিজ ইন্দ্রাণী। এটাই লাস্ট। জাস্ট একটা গল্প। প্লিজ।"

ইন্দ্রাণী এবার বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, "স্টপ! সবাই প্লিজ থামো। আমি আর নিতে পারছি না।" ইন্দ্রাণী প্রতীকের দিকে এগিয়ে আসে, "বলুন।

boierpathshala.blogspot.com

তাড়াতাড়ি। তবে প্রথমেই বলে রাখি, আমি গল্পটা শুনে ভুলে যাব। কোনও কিছু আমার থেকে আশা না করাই ভালো।"

প্রতীককে এবার একটু আশ্বস্ত দেখাল, "অনেক পুরোনো দিনের গল্প। ধরো ১৮০০ সালের মাঝামাঝি। ইয়োরোপের কোনও একটি গ্রাম। গ্রামের কিছুটা বাইরে একটা ছোটখাটো জঙ্গল ছিল। ভয়ানক কিছু ছিল না। কিছু বুনো গাই, হরিণ আর কিছু পাহাড়ি খরগোশ। গ্রামের মধ্যে সব পরিবারের কিছু জমি ছিল, সেখানেই চাষবাস করত! শান্ত জীবন ভালোই চলছিল। কিন্তু হঠাৎই গ্রামে একটি ভয়ানক ঘটনা ঘটে যায়। গ্রামেই বাস করতো ইলোরা ফ্যামিলি— কর্তা, গিন্নি, দুই ছেলে-মেয়ে আর কর্তার বৃদ্ধা মা। গ্রামের আর সবার মতোই কর্তা রিচার্ড ইলোরা পাশের জঙ্গলে শিকার করতে গেল। এখানকার লোকেরা জঙ্গলে হরিণ, বনমোরগ, খরগোশ যেদিন যেমন পেত, নিয়ে আসত শিকার করে। সেসব দিয়েই একটা পরিবারের মোটামুটি দুই বেলার ভূরিভোজ হয়ে যেত। রিচার্ডের ভাগ্য সেদিন খারাপ ছিল। অনেক খুঁজেও বনমোরগ না পেয়ে, শেষে আটটা পাহাড়ি খরগোশ শিকার করে বাড়ি ফেরে। সন্ধেবেলা পরিবারের ছোট ছেলেটি সুন্দর ভায়োলিন বাজায়। সবাই খুব প্রশংসা করে। এরপর রাতে ইলোরা ফ্যামিলি একসঙ্গে সবাই খেতে বসে। মেয়েটি মায়ের হাতে রাঁধা খরগোশের মাংস খেতে খুবই ভালোবাসে। সবাই একসঙ্গে খেয়ে শুতে গেল। সকালে রিচার্ড যখন উঠল, তার কেমন যেন বুক ধড়ফড় করছিল, মুখ শুকিয়ে কাঠ, চোখে ঝাপসা দেখছে, চামড়াটাও লালচে হয়ে উঠেছে। স্ত্রী-কে ডাকতে গিয়েই আঁতকে ওঠে— তিনি আর বেঁচে নেই। কোনওক্রমে বাড়ির বাকিদের ডাকতে গিয়ে দেখল, সবাই ঘুমের মধ্যেই মরে কাঠ হয়ে আছে। জ্ঞান হারিয়ে সেও পড়ে যায়। নিকটস্থ থানা থেকে পুলিশ এসে বুঝতে পারে, কোনও বিষক্রিয়ার জন্য এরূপ হয়েছে। রিচার্ডকে হসপিটালে ভরতি করা হয়। কিন্তু আধুনিক তদন্ত ব্যবস্থা না-থাকায় বিষ কোথা থেকে এল, কে দিল খুঁজে আর বের করা যায়নি। সন্দেহের বশে রিচার্ডকে গ্রেপ্তার করার কথা পুলিশ ভেবেছিল। কিন্তু রিচার্ডের ঘুম আর কোনওদিনও ভাঙেনি— প্রথমে কোমা, তারপর একদিন নিঃশব্দে পৃথিবী ত্যাগ করে।"

boierpathshala.blogspot.com

ইন্দ্রাণী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "বুঝলাম। এতে আমি কী করব?"

প্রতীক বলল, "দুটো কাজ! এক, কীভাবে মারা গেলে খুঁজে বের করবে আর কলকাতাতে ওই ভায়োলিনটা খুঁজে বের করবে।"

ইন্দ্রাণী এবার বেশ বিরক্ত হয়ে গেল, "মাথাটা কি এক্কেবারে গেছে নাকি? ১৮০০ সালের ইয়োরোপের গ্রামে কে কী করে মারা গেছে, কলকাতায় বসে কী করে তদন্ত করব? কলকাতায় ভায়োলিন খুঁজব মানেটা কী! অদ্ভুত!"

প্রতীক হেসে ওঠে, "তদন্ত করার জন্য যা যা ডিটেলস দরকার, সবই তোমায় দিয়ে দিয়েছি। যদি এই দুটো খুঁজে বের করতে পারো, তাহলে ডার্লিং, তুমি হয়তো নিজেকে নতুন করে চিনবে!"

প্রখর রুদ্র এবার কড়া গলায় বলে উঠল, "অনেক হয়েছে, প্রতীক। তুমি ওকে ভুল পথে চালিয়ে উসকাতে চাইছ। কিন্তু এবার তুমি তোমার নিজের শাস্তির জন্য তৈরি হও।" প্রতীকের চোখটা দপ করেই রাগে আর ঘৃণাতে জ্বলে ওঠে, "শাস্তি! শাস্তি তো সেদিন থেকেই ভোগ করে চলেছি, যেদিন থেকে কাকাকে তিল তিল করে শেষ হয়ে যেতে দেখেছি। আপনি কি মনে করেন, এত সহজে আমি আপনাকে ছেড়ে দেব? I will make you pay! আপনার জন্য যেমন আমার প্রিয় মানুষগুলো সরে গেছে, আমিও সবাইকে আপনার থেকে সরিয়ে দেব। সবাই আপনাকে সন্দেহের চোখে দেখবে। আপনার সব সম্মান একটানে ছিঁড়ে নেওয়া হবে। তারপর আপনি বুঝবেন, কী কষ্ট আর অসম্মান নিয়েই না আমার কাকা নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। Mr. Rudra, the God must fall."

"আগে নিজের চিন্তা করো প্রতীক। তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগের লিস্ট অনেক বড়।"

"প্রখরবাবু, আপনি আমায় চিনতে এখনও ভুল করছেন। ডার্ক হর্সরা শেষ ল্যাপে সব হিসেব পালটে দেয়। আপনি তৈরি তো?" কেউ কিছু বোঝার আগেই পাশের গ্লাসে রাখা থকথকে কালো পানীয়টা চোখ বুজে ঢক ঢক করে খেয়ে নেয়।

প্রখর রুদ্র ছুটে গিয়ে হাত থেকে গ্লাসটা ছিনিয়ে নিয়ে আঁতকে ওঠে,

boierpathshala.blogspot.com

"প্রদোষবাবু, জলদি ডাক্তার ডাকুন। প্রতীক এতদিনের জমিয়ে-রাখা আপেলের দানাগুলো গুঁড়ো করে সব গিলে নিয়েছে।"

প্রদোষবাবু একটু অবাক হয়ে বললেন, "তাতে কী হয়েছে, মশাই?"

"আরে, আপেলের বীজের মধ্যে amygdalin থাকে, যা আমাদের পাচনরস, মানে লঘু HCL-এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন সায়ানাইড তৈরি করে। যেকোনও সায়ানাইডই প্রাণঘাতী। আর এ যে পরিমাণ খেয়েছে, তাতে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। না হলে, কোমা অবশ্যম্ভাবী!"

প্রদোষবাবু একবার প্রতীকের দিকে দেখলেন। প্রতীক আবার নিজের জায়গায় বসে ধ্যানস্থ হয়েছে। প্রদোষবাবু বুঝতে পারছেন না তাঁর ঠিক কী করা উচিত। একটা লোক কী করে এত সহজে নিজের মৃত্যুর এপিটাফ নিজেই লিখতে পারে! তিনি তাড়াতাড়ি ফোন করেন, "ডাক্তার প্রসাদ, তাড়াতাড়ি জেল হাসপাতালে আসুন। কুইক।" ফোন রেখেই তিনি কানুকে বললেন, "ওরে, তাড়াতাড়ি একে তোল রে। গাড়ি রেডি কর।"

কানু এসে প্রতীকের হাত ধরতেই প্রতীক হাত ছাড়িয়ে দিয়ে নিজেই উঠে দাঁড়ায়, "আমি এখনও ঠিক আছি। নিজেই যেতে পারব। চলুন দেখি।"

প্রখর রুদ্রর দিকে একবার তাকিয়ে বলল, "ঝড় আসছে, মিস্টার রুদ্র। ঘর সামলে নিন, আর সুযোগ পাবেন না।" কিছুই যেন হয়নি এরকম একটা ভঙ্গিতে প্রতীক খুব ধীরপায়ে যেতে থাকে। ইন্দ্রাণীর সামনে দাঁড়িয়ে একবার চারপাশে দু-হাত উপরে তুলে ঘুরতে ঘুরতে খুব আহ্লাদের সঙ্গে গান গাইতে থাকে— "তুম বিন জিয়া জায়ে ক্যায়সে, ক্যায়সে জিয়া জায়ে তুম বিন; যদি পারো, খুঁজে বের করো ভায়োলিন।"

প্রখর রুদ্র এবার রেগে উঠল, "প্রদোষবাবু, একে তাড়াতাড়ি নিয়ে চলুন। কথায় কথায় সময় নষ্ট করছে। যত দেরি হবে, তত বাঁচার সম্ভাবনা কমবে।"

প্রদোষবাবু এবার নিজেই হ্যাঁচকা টান দিয়ে নিয়ে চলল প্রতীককে। বাইরে এসে একটা গাড়িতে প্রদোষবাবু, প্রখর রুদ্র, প্রতীক আর কানু উঠল আর অন্যটায় শিবানী আর ইন্দ্রাণী।

গাড়িতে বসেই ইন্দ্রাণী বলে উঠল, "তোর কী মনে হয়? জেঠুমণি আমাকে

boierpathshala.blogspot.com

কেন পুলিশে ভরতি হতে দিতে চায়নি?"

শিবানী কিছুক্ষণের জন্য অবাক হয়ে যায়, "তুই কি লোকটার কথা সিরিয়াসলি নিয়ে, জেঠুকে কোনওভাবে সন্দেহ করছিস? তাহলে মনে করিয়ে দিই তোকে, মা-ও কিন্তু দুই মেয়েই পুলিশে যাক চায়নি। জেঠু সেটাকে সমর্থন করেছিলেন। তুই বাড়ির সবার প্রিয়। সেইজন্যই কিন্তু কেউ তোকে চাকরির ব্যাপারে জোর করে না। বাবা ব্যাপারটা মোটেই ভালো চোখে নেয় না। জেঠুই কিন্তু তোকে প্রোটেক্ট করে। আর তুই কিনা একটা বাইরের লোকের কথায়, ছিঃ ছিঃ..."

"কথা বাইরের লোক বলুক কি ভিতরের, কথাটা গুরুত্বপূর্ণ কি না, সেটাই বেশি জরুরি।"

শিবানী এবার ধমকে ওঠে, "শোন, এমনিতেই এতসব টেনশন চলছে। আমার এসব ভালো লাগছে না। তুই যা ভালো বুঝিস কর। একটা অর্থহীন প্রলাপের পিছে পিছে যা তাহলে। এখন ভায়োলিন খুঁজে বের কর। কেস ছেড়ে এখন এসব দোতারা-বেহালা বাজানোর সময় আমার নেই। তোর চাকরি-বাকরি নেই, তুই বোঝ।"

"তুই গাড়ি থামা।"

"কেন, কী হল?"

ইন্দ্রাণী রেগে উঠে বলল, "তুই গাড়ি থামা। সব কথার উত্তর দিতে আমি বাধ্য না।" শিবানী ততোধিক রেগে বলল, "ও.কে. ফাইন। যা পারিস কর। এদিকে টেনশন আর ওদিকে ওনার নাটক!"

শিবানী গাড়ি থামাতেই ইন্দ্রাণী একরকম গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে দৌড়ে উলটোদিকের রাস্তায় গিয়ে একটা অটো ধরল।

* * * * * * * *

সবাই যখন হাসপাতালে পৌঁছোলো প্রতীক কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছে, চোখ দুটো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার প্রসাদ তাড়াতাড়ি পাল্‌স দেখা শুরু করলেন। প্রদোষবাবু বলে উঠলেন, "ডাক্তার, একে বাঁচাতেই হবে।"

প্রখর রুদ্র বলে উঠল, "তাড়াতাড়ি একে Sodium Thiosulfate দিন।

boierpathshala.blogspot.com

রক্তে সায়ানাইড মিশতে শুরু করেছে। আর বেশি দেরি করলে বাঁচানো যাবে না।"

ডাক্তার প্রসাদ একজন নার্সকে ডেকে সব বুঝিয়ে তাড়াতাড়ি ওয়ার্ড বয়দের দিয়ে প্রতীককে ভিতরে পাঠিয়ে দিল। তারপর প্রখর রুদ্রর দিকে ফিরে বললেন, "আপনি কে আমি জানি না। কিন্তু অকারণ ডাক্তারি না ফলালেই আমি খুশি হই। জানি Sodium Thiosulfate সায়ানাইডের অ্যান্টিডোট, কিন্তু মারাত্মক বিষ। বিষে বিষে বিষক্ষয় হয়, সেটা ঠিক কথা। কিন্তু Sodium Thiosulfate-এর ডোজ উনিশ-বিশ হলে আর ওঁকে বাঁচানোর কোনও সুযোগই থাকবে না। পাগলের প্রলাপ বকে লাভ নেই। আমি এই রিস্ক নিতে রাজি নই। এখনও খুব দেরি হয়নি। বমি করিয়ে দেখা যাক কী হচ্ছে। সায়ানাইড যেহেতু আমাদের রক্তের লোহিতকণিকাগুলিকে আক্রমণ করে দেহে অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে দেয়, তাই সেরকম বুঝলে রক্তের ব্যবস্থা করব। হয়তো সময় লাগবে কিন্তু লোকটার বাঁচার সম্ভাবনা আপনি যা বলছেন, তার থেকে অন্তত বেশি।"

এবার ডা. প্রসাদ প্রদোষবাবুর দিকে ফিরে বললেন, "প্লিজ আপনার কনস্টেবলদের ডিউটির জন্য বসিয়ে দিন। আর কোনও বাইরের লোকের পরামর্শ চাইলে এখান থেকে আপনার কয়েদি নিয়ে চলে যেতে পারেন।"

প্রখর রুদ্র মাথা নিচু করে বাইরে আসতে থাকে, সঙ্গে প্রদোষবাবুও। অন্যমনস্ক প্রদোষবাবু একজন ডাক্তারের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে হাত থেকে ফোনটা পড়ে যায়। ডাক্তারটি নিচু হয়ে ফোনটি তুলে প্রদোষবাবুর হাতে দিয়ে বলেন, "একটু দেখে চলুন। এদিকে বসার জায়গা আছে। ওখানে যান।"

আসলে এত তাড়াতাড়ি চোখের সামনে সবকিছু হয়ে গেল যে প্রদোষবাবু এখনও ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

* * * * * * *

অটোতে উঠে ইন্দ্রাণী ভাবতে থাকে, কলকাতায় যদি ভায়োলিন খুঁজতেই হয় তাহলে সেটা 'বেহালা'র থেকে ভালো জায়গা আর কিছুই হতে পারে না। প্রতীক সত্যিই অসাধারণ বুদ্ধি রাখে। একটা জায়গার ম্যাপ এঁকে পুরো একটা

boierpathshala.blogspot.com

গল্প বানিয়ে দিল। কিন্তু কী এমন জিনিস, যার জন্য এত লুকোছাপা? আর কার থেকেই বা লুকোনো! জেঠুর থেকে? কীসের ভয় জেঠুর থেকে? কাছের বাস স্টপটা থেকে বাসে উঠে পড়ে ইন্দ্রাণী।

বেহালাতে নেমে ঘণ্টাখানেক ধরে ইন্দ্রাণী ইতস্তত এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকে আর প্রতীকের গল্পের প্রতিটা শব্দ ভালো করে মনে করার চেষ্টা করতে থাকে। বোঝার চেষ্টা করে এর মধ্যে কোনটা ক্লু আর কোনটা নিছকই গল্প। এত বছর আগে একটা পরিবার কোনওভাবে বিষক্রিয়ায় মারা গেছে, গল্পের সত্যতা তো কেউ যাচাই করতে ইয়োরোপে যাচ্ছে না। তাহলে পরিবারের নাম আলাদা করে বলার দরকার ছিল! আরো কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক করে মাথাটা তার গরম হয়ে গেল, বেমক্কা একটা চায়ের দোকানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে বসল, "এখানে ইলোরা ফ্যামিলি কোথায় থাকে?"

চায়ের দোকানদারটা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে দেখে উত্তর দিল, "আপনি কি ইলোরা সিনেমা হল খুঁজছেন?" ইন্দ্রাণীর নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেকেই চড় মারতে ইচ্ছে করছিল। আর কোনও কথা না বাড়িয়ে সোজা ছুটল ইলোরা সিনেমা হলের দিকে। যখন ইন্দ্রাণী ইলোরা সিনেমা হলের সামনে পৌঁছোলো, তখন রীতিমতো সে হাঁপাচ্ছে। এরপর?

কিছুটা এগিয়ে গিয়ে চারিদিকে ভালো করে প্রত্যেকটা বাড়িঘর দোকান দেখতে থাকল, এমন কিছু কি আছে, যা প্রতীকের গল্পের সঙ্গে মেলে! বেশ কিছুক্ষণ চারিদিকে ঘুরে একটা দোকানের নাম দেখে একটু সন্দেহ হল। গল্পে প্রতীক খরগোশের মাংসের কথাটা বলেছিল ঠিকই কিন্তু এরকম একটা খুব সাধারণ দেখতে দোকানে কী বা থাকতে পারে! আরও দশ-বারো মিনিট পায়চারি করে ভাবল দেখাই যাক। ইন্দ্রাণী পায়ে পায়ে দোকানটার মধ্যে ঢুকে পড়ে— দোকানটার নাম 'র‍্যাবিট কার্ট'।

ভিতরে ঢুকে এদিক-ওদিক দেখে সামনের লোকটাকেই জিজ্ঞাসা করে, "আপনি কি প্রতীক সরকারকে চেনেন?"

লোকটা কিছুক্ষণ ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "ক্যা? না দিদি, চিনি না। আপনি কী চান তা-ই বলুন?"

boierpathshala.blogspot.com

ইন্দ্রাণী ভাবতে থাকে, প্রতীক তাকে এখানে কেন পাঠাল? এটাই কি সেই জায়গা, যেখানে তার সত্যিই যাওয়া উচিত ছিল! নাকি সে ভুল জায়গায় পৌঁছে গেছে। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ইন্দ্রাণী বলল, "ডার্ক হর্স?"

এবার দোকানিটার মুখের অভিব্যক্তি পালটে গেল। ভিতরের দিকটায় নিয়ে গিয়ে ইন্দ্রাণীকে জিজ্ঞাসা করল, "পাসওয়ার্ড?"

ইন্দ্রাণী বুঝল, সে ঠিক জায়গাতেই পৌঁছেছে। কিন্তু এখন সে পাসওয়ার্ড কোথা থেকে পাবে? আর কীসের পাসওয়ার্ড? সে আবার করে প্রতীকের পুরো গল্পটা মনে করতে থাকে। প্রতীক যখন এতটা বুদ্ধি করে তাকে এখানে পাঠিয়েছে, তার মানে পাসওয়ার্ডও সে কথায় কথায় নিশ্চয়ই দিয়েছে। শুধু খুঁজে বের করতে হবে। ইন্দ্রাণী কিছুক্ষণ ভেবে বলে, "The God must fall."

দোকানিটা কিছুক্ষণ চেয়ে বলল, "আজ্ঞে না।"

"আচ্ছা। রিচার্ড?"

"না। ম্যাডাম মনে রাখবেন, আপনার কাছে তিনটে চান্স ছিল। দুটো নষ্ট করেছেন। তৃতীয়টা ভুল হলে কড়া নির্দেশ আছে প্যাকেটটা নষ্ট করে ফেলার। পাসওয়ার্ড নিয়ে আসুন। আপনি ডার্ক হর্সের নাম ঠিক বলেছেন বলে আমি এখনও অপেক্ষা করছি।"

"মশাই, আপনি তো আগে বলেননি যে মাত্র তিনটে সুযোগ!"

লোকটিকে বিরক্ত দেখায়, "এখানে কোনও কৌন বনেগা ক্রোড়পতি খেলা হচ্ছে না। আপনি কে, কোথা থেকে আসছেন আমি জানি না, জানার দরকারও বোধ করি না। ঠিকঠাক কোডওয়ার্ড আর পাসওয়ার্ড দিলে প্যাকেট আমরা তাঁকে দিই। না হলে না। আমরা অনেকের অনেক প্যাকেট রাখি। তার জন্য টাকা পাই। আমার কাজ ওই পর্যন্তই। কাজের সময়ে এসে যত সমস্যা!"

লোকটি নিজের কাজে আবার লেগে যায়। ইন্দ্রাণী দোকানের পাশের টুলটাতে বসে ভাবতে শুরু করে, কী হতে পারে পাসওয়ার্ড। যতবারই কিছু মনে আসে, ঠিক ততবারই মনে হয় একটামাত্র সুযোগ! অনেক ভেবেই কিছু না পেয়ে ফিরে আসতে থাকে। তাকে আরও একটু ভাবতে হবে। ভুল করার কোনও সুযোগ নেই। ফিরতে ফিরতে সে ভাবতে থাকে, প্রতীক দুটো জিনিস খুঁজতে

boierpathshala.blogspot.com

বলেছিল। কলকাতায় ভায়োলিন আর ওই পরিবার কী করে মারা গেল। প্রথমটার উত্তর তো আছে। দ্বিতীয়টার নেই। তাহলে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটাই কি পাসওয়ার্ড?

* * * * * * * *

ওদিকে হসপিটালে প্রতীককে বমি করানো হয়েছে। এখনও প্রায় অজ্ঞান বলা যায়। এরপর কী হবে, সে নিয়ে মেডিক্যাল বোর্ড বসিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। এসময় এক ডাক্তার প্রবেশ করে প্রতীকের কেবিনে। প্রতীক ঝাপসা চোখে দেখে একজন ডাক্তার মুখে মাস্ক লাগিয়ে ঝুঁকে পড়ে তার নাড়ি দেখছে। প্রতীক কষ্ট করে মুচকি হেসে বলল, "আপনি এসেছেন?"

"তা-ই তো কথা ছিল, ডার্ক হর্স। দ্য শো মাস্ট গো অন! ঠিক তুমি যেভাবে চেয়েছিলে, সেভাবেই।"

"হা...হা...হা। আমি আমার বেটার রিপ্লেসমেন্ট দিয়ে যাচ্ছি। সে-ই হয়তো প্রখর রুদ্রকে মাত দেবে। শুধু সময়ের অপেক্ষা। আচ্ছা, আমার ল্যাপটপ আর মোবাইলটা পুলিশ পেয়ে গিয়েছিল। আর একটা মোবাইল?"

লোকটি নিঃশব্দে হাসল, "চিন্তা করতে হবে না। সুইচ অফ করে লুকিয়ে দিয়েছি। সময় হলে ঠিক সামনে আসবে। ঠিক তুমি যেভাবে চাও।"

প্রতীক আবার শয়তানের মতো হেসে ওঠে। মুখটা এবার একটু যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যায়, "বিদায় বন্ধু। শো মাস্ট গো অন! বিদায়।"

লোকটা প্রতীকের হাতে একটা ইঞ্জেকশন দিল, "যদি কখনো আমি 'নাইন মেন অফ এম্পের-এ জায়গা পাই, তোমার গল্প 'হল অফ ফেম'-এ থাকবে। কথা দিলাম।"

"ধন্যবাদ, ড. হাজরা। আপনার কাজ শেষ হয়েছে। আপনি আসুন। আর আমার বাকি জিনিসগুলো?" ড. হাজরা হাতের ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জটা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে নিজের দস্তানাটা হাত থেকে খুলে পকেটে ভরে নেন। খাটের উলটোদিকে গিয়ে ড. হাজরা পকেট থেকে একটা এয়ারটাইট ব্যাগ থেকে চিমটে দিয়ে কিছু একটা ধরে প্রতীকের ডান হাতের আঙুলের ফাঁকে কিছু

boierpathshala.blogspot.com

দিয়ে দেয়, —"বিদায় কমরেড।"

পাশের কার্ডিয়োগ্রাম মেশিনটা বিপ...বিপ...বিপ করতে করতে উঁচু-নিচু দাগগুলো সরলরেখায় পরিবর্তিত হতে শুরু করল— শেষে মেশিনটা শুধু পিইপপপ করতে থাকে। লোকটি নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়।

* * * * * * *

ইন্দ্রাণী সন্ধেবেলা বাড়িতে ঢুকতেই দেখে বাড়ির সবাই কেমন থমথমে। ঘরে ঢুকতে শিবানীই দুঃসংবাদটা দিল, "জানিস, প্রতীককে বাঁচানো যায়নি। মারা গেছে। ডা. প্রসাদ কিছুটা হতবাক। রিকভার করতে করতে কীভাবে হঠাৎ এতটা খারাপ দিকে ঘুরে গেল, বুঝতে পারছেন না! বডি পোস্টমর্টেমে গেছে। কাল রিপোর্ট পাব।" ইন্দ্রাণীর হঠাৎ যেন কেমন বুকের ভিতরটা ফাঁকা-ফাঁকা বোধ করতে থাকে। একটা লোক, যে কিনা আজ সকালেও তার জন্য গান গাইছিল, সে এখন আর নেই!

সিজন চেঞ্জের সময় ইন্দ্রাণীর হালকা ঠান্ডা লেগে মাথাটা ধরেছিল। এবার সে আরও খারাপ বোধ করতে থাকে। একদিকে একটা অদ্ভুত ধাঁধা, যা প্রতীককে কোনওমতেই ভুলতে দিচ্ছে না। আর অন্যদিকে এমন একটা সংবাদ। ইন্দ্রাণী মাথা চেপে ধরে বিছানায় চুপচাপ শুয়ে পড়ে শিবানীকে বলল, "মা-কে বলিস, আমার শরীরটা ভালো নেই। আজ খাব না। লাইটটা অফ করে নীচে যা।" কুন্তলাদেবী জানেন তাঁর ছোটমেয়েটি বড় বেশি খামখেয়ালি। কোনও বছর যদি মনে হত তো মন দিয়ে পড়ে ক্লাসে প্রথম হত আর যে বছর তার মনে হত পড়বে না, সে বছর ওই টেনে-টুনে পাশ হত। কারও বাপের সাধ্যি ছিল না এ মেয়েকে সামলায়। তাঁর ভাশুর, প্রখর রুদ্র অনেক বছর পর বাড়ি ফিরে এলে তাঁর সব অসাধারণ গল্প শোনার লোভে একমাত্র তাঁর কথাই শুনত। তাই কুন্তলাদেবী ছোটমেয়ের এহেন ঝক্কি অনেকবারই সামলেছেন।

সবার খাওয়ার পর কুন্তলাদেবী নিজের হাতে ভাত আর চিংড়ির মালাইকারি নিয়ে মেয়ের ঘরে গেলেন, "সারাদিন অনেক বনের মোষ তাড়ালি। এবার একটু ঘরের খেয়ে আমায় উদ্ধার কর।"

boierpathshala.blogspot.com

ইন্দ্রাণী একটু রেগেই চেঁচিয়ে উঠল, "তা-ই তো, আমি ঘরের খেয়েই বনের মোষ তাড়াই! সকালে বানী কথা শোনাল, এবার তুমি শোনাও। আর পুলিশের চাকরিটা তখন কেন নিতে দিলে না?"

কুন্তলা রুদ্র একমুঠো ভাত মাখিয়ে ইন্দ্রাণীর গালে জোর করে ঢুকিয়ে দিল, "মেলা বকিস না। ভুলে যাস না। পুলিশের চাকরির পরীক্ষাটা নিজের ইচ্ছায় দিতে যাসনি। বানীর সঙ্গে কম্পিটিশন করবি বলে দিয়েছিলি। যে কাজে তোর নিজের কোনও আগ্রহ নেই, সে কাজ না-করাই ভালো। একটা সময় পর সাধারণ হয়ে যাবি। তার থেকে যেটা ভালো লাগে-সেটা কর। আমি সেটাই করতে বলি সব সময়।"

ইন্দ্রাণী চোখ মুছতে মুছতে বলল, "তা-ই করব। আমি তা-ই করব। এবার সব ছেড়ে চলে যাব। এতদিন তোমাদের ছেড়ে যেতে চাইছিলাম না বলেই চাকরির অফারগুলো ছাড়ছিলাম। অনেক হয়েছে! এখানে আমায় কেউ চায় না!"

"যেখানে পারিস, যাস মা। এখন আমায় খেয়ে উদ্ধার কর। তারপর এই ওষুধটা খেতে হবে। ঠান্ডা লাগাটা কমবে।"

"কী ওষুধ?"

"বেলেডোনা।"

ইন্দ্রাণী খেতে খেতে হঠাৎই থেমে গেল, "বে...লে...ডো...না। মানে Black nightshade! ইন্দ্রাণী খাট থেকে লাফিয়ে নেমে বইয়ের তাক থেকে টক্সিকোলজির বইটা টেনে নামাল— "বেলেডোনা... বেলেডোনা... বেলেডোনা... ও মা ইউ আর জাস্ট সাচ এ ডার্লিং।" কুন্তলা রুদ্র কিছুক্ষণ চুপচাপ মেয়ের কাণ্ড দেখে বুঝলেন, এখন তাঁর আর কোনও কথাই মাথায় ঢুকবে না মেয়ের। ইন্দ্রাণী বইটা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে জোরে জোরে পড়তে শুরু করল, "এই তো— 'Introduced as drug plat from England and France– it is found in Central and Southern Europe– Southwest Asia– Eurasia and Algeria. Belladonna is occasionally found in the wilder and uncultivated areas or as an ornamental plat of the eastern United States.' তারপর কোথায় গেল। হ্যাঁ পেয়েছি। এই

boierpathshala.blogspot.com

তো– 'Rabbits often eat belladonna and pass the effect on to anyone who might eat them.' সত্যিই প্রতীক ইজ আ সাচ এ জিনিয়াস।"

* * * * * * * *

ইন্দ্রাণী পরদিন বেহালার র‍্যাবিট কার্টে গিয়ে বিনা দ্বিধায় বলে উঠল, "বেলেডোনা।" লোকটা কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে ভিতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে একটা হলদে রঙের সিল করা খাম হাতে ধরিয়ে দেয়। ইন্দ্রাণী পাশের টুলে বসে খামটা খুলে ফেলতেই বের হল দিল্লির একটা সরকারি হাসপাতালের একটা পুরোনো প্রেসক্রিপশন আর কিছু রিপোর্ট। ১৯৮৪ সালের ২৫ অক্টোবরের 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'র ভিতরের পাতার একটা নিউজ কাট আউট। খবরটা পড়ে আর প্রেসক্রিপশনগুলো দেখে ইন্দ্রাণীর মাথাটা কেমন খালি-খালি লাগতে শুরু করে।

সেদিন সন্ধেবেলা ফিরেই জেঠুর ঘরে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে। প্রখর রুদ্র ঘরে একাই ল্যাপটপে কিছু দেখছিলেন। ইন্দ্রাণী রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে জিজ্ঞাসা করে, "তোমার কপালের ডান পাশের কাটা দাগটা তাহলে দিল্লির? রাজস্থান না?"

প্রখর রুদ্র একটু হতচকিয়ে গিয়ে বলেন, "মানে?"

"মানে কিছুই না। ঠাকুরদা যখন মারা যায়, সে সময় তুমি দিল্লিতেই ছিলে। অথচ এতগুলো বছর ধরে বলে এসেছ তুমি নাকি সে সময় রাজস্থানে ছিলে?"

প্রখর রুদ্র একবার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল, "এসবের কোনও মানে হয় না। তুই একটা ক্রিমিনালের কথায় ভরসা করে আমায় সন্দেহ করছিস?"

"ক্রিমিনাল? কে? প্রতীক? ওর অন্তত সেটাতেও সততা ছিল। যা করে, মুখের উপর করে। অযথা অজুহাত খোঁজে না। মিথ্যে বলে না," ইন্দ্রাণী পুরোনো নিউজের কাট আউটটা আর মেডিক্যাল রিপোর্টগুলো টেবিলের উপর ছুড়ে ফেলে। টেবিলের উপর দু-হাতে ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে, "২৫ অক্টোবরের পেপারে পরিষ্কার লেখা আছে, ২৪ অক্টোবর দিল্লিতে এক পথদুর্ঘটনায় দু-জন হত আর চারজন আহত। চারজনের মধ্যে একজনের নাম প্রখর রুদ্র। অজ্ঞান অবস্থায় পকেটে থাকা লাইব্রেরি কার্ড থেকে নাম জানা যায়। আর এই হচ্ছে

boierpathshala.blogspot.com

তাঁর মেডিক্যাল রিপোর্ট। দু-দিন হসপিটালে থাকতে হয়েছিল। কপালে ভ্রূর উপর তিনটে সেলাই। আইডেন্টিটি মার্ক হিসেবে বাঁ কাঁধের তিলের উল্লেখ আছে। ব্লাড গ্রুপটাও O−। এত মিল?"

প্রখর রুদ্র কোনওদিনই ভাবেননি তাঁর প্রিয় দুই ভাইঝির একজন এরকমভাবে তাঁকে কোনওদিন জেরা করতে পারে! প্রথমবারের জন্য প্রখর রুদ্রর কথা জড়িয়ে যায়, "না... না... মানে তুই ভুল বুঝছিস ইন্দ্রা। আসল ব্যাপারটা..."

ইন্দ্রাণী ধমকে ওঠে, "অনেক হয়েছে, জেঠু। তুমি নিজেই বলো, যেখানে মিথ্যে থাকে, সেখানে অপরাধপ্রবণতাও থাকে। দিল্লিতে সেদিন কী অপরাধ হয়েছিল আমি জানি না, জানতে চাইও না! কিন্তু যেখানে মিথ্যে থাকে, সেখানে আর যা-ই হোক, বিশ্বাস থাকে না। তুমি ঠিকই বলেছিলে ডানকুনির কেসটার সময়ে। এসবে না ঢুকলেই বোধহয় আমি ভালো করতাম। এখানে নিজের মানুষগুলোরই মুখোশ যখন খসে পড়ে, তখন কাকে বিশ্বাস করব আর কাকে করব না— ভেবে পাই না। যা-ই হোক, এতদিন ধরে যখন লুকিয়ে রেখেছ, আমিও এটা নিয়ে জল ঘোলা করতে চাই না। কয়েকটা চাকরির অফার ছিল। ভেবেছিলাম, না করে দেব। কিন্তু আমার আর এখানে ভালো লাগছে না। দিল্লির একটা আই-টি কোম্পানির সঙ্গে দুপুরে কথা বলে তাদের অফারটাই ফাইনাল করে দিয়েছি। আমি এসবের থেকে দূরে চলে যাচ্ছি। তুমি থাকো তোমার মিথ্যের সাম্রাজ্যে।"

ইন্দ্রাণী সবটা বলে হাঁপাতে লাগল। প্রখর রুদ্র গম্ভীর মুখে বলল, "চাকরিটা কি দিল্লিতে নিজের জন্য নিলি, নাকি নিজে গিয়ে খুঁজে দেখতে চাস কী হয়েছিল ত্রিশ-চৌত্রিশ বছর আগে! অতীত খুঁড়িস না। কারও কষ্ট কমবে না। শুধু শুধু বাড়বে।"

"প্রতীকও অনেক যন্ত্রণা নিয়ে মরেছে!" ইন্দ্রাণীর মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই প্রদোষবাবু দু-জন কনস্টেবল নিয়ে ঘরে ঢুকে এলেন, পিছনে শিবানী, "স্যার, আপনার কোনও ভুল হচ্ছে। মস্ত বড় ভুল।"

"কোনও ভুল হচ্ছে না, শিবানী..." প্রদোষ চ্যাটার্জি প্রখর রুদ্রর দিকে তাকিয়ে বললেন, "প্রখরবাবু, আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। প্রতীকের খুনের

boierpathshala.blogspot.com

চক্রান্তে আমরা আপনাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছি।"

প্রখর রুদ্র চোখ মুখ বড় বড় করে বলল, "হোয়াট?"

"হ্যাঁ প্রখরবাবু। প্রতীকের দেহে Sodium Thiosulfate পাওয়া গেছে। যে বিষটা কৌশলে আপনি ডাক্তার প্রসাদকে দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, সেটাই।"

শিবানী এবার অধৈর্য হয়ে ওঠে, "কী বলছেন স্যার! ওটা তো অন্য কেউও দিয়ে থাকতে পারে। শুধুমাত্র সন্দেহের বশে..."

"শুধু সন্দেহ না। ডাস্টবিনে ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ পাওয়া গেছে। প্রখর রুদ্রর ফিঙ্গারপ্রিন্ট ছিল তাতে। প্রতীকের ডান হাতের মুঠোয় কিছু ছিঁড়ে-নেওয়া চুল ছিল। সম্ভবত আততায়ীর ভেবে আমরা টেস্ট করেছিলাম। ডি.এন.এ. ম্যাচ করেছে।"

শিবানী আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল, "কিন্তু ছিঁড়ে বা কেটে-ফেলা চুলে যদি হেয়ার ফলিকল না থাকে তাহলে যে কারওই ডি.এন.এ. টেস্ট নিয়ে একটা সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। আশা করি স্যার, সেটা আপনি ভোলেননি?"

প্রদোষবাবু এবার আরও বিরক্ত হলেন, "দেখো আমায় এসব শিখিয়ো না। হেয়ার রুট ফলিকলও ছিল। তারপরও আমরা সিয়োর হওয়ার জন্য M-DNA টেস্ট করেছি, যার থেকে এটা জানা যায়, আততায়ী কারও সঙ্গে সেম মেটারনাল লাইন শেয়ার করছে কি না। শেখরবাবু আজ অফিসে তাঁর চুলের অংশ দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন। ভিতর থেকে লোকটা ভেঙে পড়েছেন। লোকটা সারাদিন একটা কথাও বলেননি, তা-ও নিজের কর্তব্যের সামনে নিজের দাদাকেও রেয়াত করেননি। আর তুমি কিনা তাঁর মেয়ে হয়ে আইন জেনেও এরকম করছ? অনেক হয়েছে প্রখরবাবু, চলুন। আপনার ভাই আপনার জন্য ওয়েট করছে।" দু-জন কনস্টেবলকে ইশারা করতেই তারা প্রখর রুদ্রর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

শিবানী ইন্দ্রাণীর পাশে গিয়ে বলে, "কী রে, তুই কিছু বল। তুই তো জানিস, জেঠু এসব করতেই পারে না।"

ইন্দ্রাণী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, "সবাইকে তাঁর পাপের শাস্তি পেতেই হয়, বানী। আইন আইনের পথে চলবে। আমি কেউ না।"

boierpathshala.blogspot.com

প্রখর রুদ্র আর কথা না বাড়িয়ে মাথা নিচু করে ঘর ছাড়ে। পুলিশের গাড়িতে বসতে বসতে তার কানে প্রতীকের শেষ কথাগুলো ভাসতে থাকে—'I will make you pay ! আপনার জন্য যেমন আমার প্রিয় মানুষগুলো সরে গেছে, আমিও সবাইকে আপনার থেকে সরিয়ে দেব। সবাই আপনাকে সন্দেহের চোখে দেখবে। আপনার সব সম্মান একটানে ছিঁড়ে নেওয়া হবে...'

*　　*　　*　　*　　*　　*　　*　　*

বাড়ি থেকে ইন্দ্রাণী বেশ তাড়াতাড়িই বেরিয়েছে। আজ সে দিল্লি চলে যাচ্ছে চাকরি নিয়ে। বাড়িতে কেউই খুশি নয়, তার উপর এরকম একটা অবস্থায়। কিন্তু ইন্দ্রাণী এসবের থেকে অনেক অনেক দূরে চলে যেতে চায়। চিংড়িঘাটা ব্রিজের কিছু পরে একটা সিগনালে উবেরটা দাঁড়িয়ে যায়। একটা অচেনা অদ্ভুত নম্বর থেকে ইন্দ্রাণীর ফোনে মেসেজ আসে, "ডিয়ার ইন্দ্রাণী, নিজেকে চেনার রাস্তা বড়ই কঠিন। তার জন্য কিছু মানুষকে পিছনে ছাড়তেই হয়! তোমার যাত্রা শুভ হোক।—ড. হাজরা" ইন্দ্রাণীর শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে যায়। রাস্তার ওপাশে তাকাতেই দেখল, একটা বছর পঞ্চাশের বয়স্ক মোটা লোক তার দিকে চেয়ে হাত নাড়িয়ে হাসছে। তাঁকে দেখামাত্রই ইন্দ্রাণীর মাথাটা হঠাৎ করে ঘুরে গেল। এই লোকটাই তারাপীঠে জেঠুর ঘরের রুম সার্ভিসে ছিল, এই লোকটাই টালিগঞ্জ থানায় ওদের চা দিতে এসেছিল। তার মানে এই লোকটার পক্ষে জেঠুর চুল আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট জোগাড় করাটা কঠিন না। আবার একটা মেসেজ, "তুমি ঠিক চিনেছ! ভালো থাকো। The God must fall. The rise of Devil begins."

ইন্দ্রাণী গাড়ি থেকে নেমে রাস্তা পার হওয়ার আগেই সিগনাল খুলে যায়। একটা বাস হুড়মুড়িয়ে সামনে এসে পড়ে। ইন্দ্রাণীর গতিরুদ্ধ হয়, বাসটা চলে যেতেই দেখল রাস্তার ওপাশে— 'ড. হাজরা ভ্যানিশ!' ইন্দ্রাণীর কানে ড. হাজরার শেষ কথাগুলো প্রতীকের স্বরে বেজে চলে—"The God must fall. The rise of Devil begins..."

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

উড়ন্ত মৃত্যু

"শহরের ডি.আই.জি. শেখর রুদ্রর বড়ভাই খুনের দায়ে ধৃত..." খবরের কাগজের প্রথম পাতাটা দেখে প্রখর রুদ্র মাথা নামিয়ে নিল। জেলের চার দেওয়ালগুলো বড় বেশি যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুটো টিকটিকি প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাবেলা এ দেওয়াল থেকে ও দেওয়াল ছোটাছুটি করে। একটা হালকা ক্লোরিনের গন্ধ বড় নাকে লাগে, সেটা বোধহয় ব্লিচিং পাউডারের জন্যই। প্রখর রুদ্র ভেবে চলে বাড়ির লোকগুলোর এত অপমানের থেকে বোধহয় তার মরে যাওয়াই অনেক ভালো ছিল। সত্যিই প্রতীক তাকে মাত দিয়েছে। তিনি শেষের ক-টা দিন প্রতীকের খেলায় মেতেছিলেন অথচ ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি, প্রতীকের আসল উদ্দেশ্য ছিল তাকে ব্যস্ত রেখে কিছুটা সময় বের করে নেওয়া। প্রতীক নিজের মৃত্যুটাকেও চক্রব্যূহের শেষ পর্যায় হিসেবে রচনা করেছিল। জেলের কুঠুরিটার বাইরে শেখর রুদ্র এসে দাঁড়ালেন, সঙ্গে কুন্তলা আর শিবানী রুদ্র। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শেখর রুদ্র বললেন, "দাদা, তুই এটা কী করলি? তুই একটা ক্রিমিনালকে কেন খুন করতে গেলি? আমি তো এখনও বুঝতে পারছি না!"

প্রখর রুদ্র ধীরপায়ে এগিয়ে এল। দু-দিনের ঘুমের অভাব চোখে-মুখে লক্ষ করা যায়। চোখগুলো কোটরে বসে গেছে, "তুইও তাহলে মনে করিস যে আমিই খুনগুলো করেছি?"

"ভাই হিসেবে বিশ্বাস করতে মন চায় না। কিন্তু শহরের ডি.আই.জি. হিসেবে প্রমাণের বিরুদ্ধে কিছু মনে করার অধিকার আমার নেই।"

শিবানী একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়, "তুমি আর ইন্দ্রাণী সবাই দেখছি জেঠুমণিকেই দোষী সাব্যস্ত করতে ব্যস্ত। একজনের তো জানি না কী হয়েছে, রেগেমেগে দিল্লি চলে গেলেন। আর তুমিও এখানে এসব বলছ! জেঠুর এখন একজন

ভালো লইয়ারের দরকার।"

শেখর রুদ্র আরও তেতে উঠলেন, "তা আমি কী করব! আমার মাথার উপর উপরমহলের চাপ, মিডিয়ার চাপ। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, কোন উকিলকে কোথা থেকে আনব?"

প্রখর রুদ্র মাথা নাড়িয়ে বলল, "এ কেস কেউই নিতে চাইবে না। এত সুন্দর করে প্রতীক সবকিছু সাজিয়ে রেখে গেছে, যেকোনও উকিলই প্রথম দিনেই কেস হেরে বসে থাকবে। কেউ নেবে না রে... কেউ নেবে না।"

শিবানী এবার মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমিও নেবে না?"

কুন্তলা রুদ্র আঁতকে উঠলেন, "তুই কি পাগল হলি? এই কেসে একজন পোড়-খাওয়া উকিলের দরকার। আমি ক্রিমিনাল ল পাশ করার পর মাত্র দু-বছর মিস্টার পারেখের অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলাম। তারপর তো তোদের জন্মের পর আমি আর ওসব পথে পা দিইনি। আমি সেই অর্থে কিছুই জানি না। যা শেখা, ওই দু-বছরে মিস্টার পারেখকে দেখে শেখা।"

এবার যেন শেখর রুদ্র হালে পানি পেলেন, "হ্যাঁ কুন্তলা। বানী ঠিক বলেছে। অন্য উকিল হলে সে শুধু এটাকে একটা কেস হিসাবেই দেখবে। কিন্তু তুমি দাদাকে কাছ থেকে দেখেছ। ঘটনার দিনও কখন দাদা কোথায় ছিল, তুমি ভালো জানো। তোমার থেকে বেটার আর কেউ হতেই পারে না।"

কুন্তলা রুদ্র একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। প্রখর রুদ্র আরও কিছুটা এগিয়ে এসে বলল, "বউমা, তুমিই নাও কেসটা। আর অজানা কারও উপর আমি ভরসা করতে পারছি না। নিজের মানুষই যখন ভুল বুঝছে..."

কুন্তলা রুদ্র অসহায়ভাবে বললেন, "কিন্তু দাদা, আমি যদি হেরে যাই! আমার তো অভিজ্ঞতা প্রায় নেই বললেই চলে।"

"হারো-জেতো, অসুবিধা নেই। লড়াই করতে যদি রাজি থাকো, নেমে পড়ো। অনেকদিন তো মেয়েদের মানুষ করে জীবনটা কাটিয়ে দিলে, এবার না হয় অন্যরকম হোক।"

কুন্তলা রুদ্র তখনও শব্দ হারিয়ে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। শিবানী মায়ের হাতটা ধরে বলল, "তুমি আর না কোরো না। তোমায় সবরকম হেল্প

boierpathshala.blogspot.com

আমি করে দেব। তোমার কী চাই, শুধু বললেই হবে।"

কুন্তলা রুদ্র বললেন, "আমায় একটু ভাবার সময় দে।"

* * * * * * *

দু-দিন পর বিকালের দিকে একটা ফাইল হাতে শিবানী প্রখর রুদ্রর কুঠুরির সামনে আসে, "জানি জেঠু, এটা হয়তো ঠিক সময় না। তা-ও তোমার একটু সাহায্য দরকার ছিল। একটা কেসের ব্যাপারে।"

প্রখর রুদ্র হাসার চেষ্টা করে, "আঃ! জেলে বসে বসে মাথাটায় জং ধরে যাচ্ছিল। এবার অন্তত কিছুটা মস্তিষ্কের কসরত হবে," প্রখর রুদ্রকে কিছুটা খুশিই দেখাল, "বল বল।"

"দু-দিন আগে একটা কেস এসেছে। মানে দেখতে সাধারণই কিন্তু একটা খটকা..."

"কেসটা প্রথম থেকে বল আগে, তারপর দেখছি..."

"কেসটা নিউ আলিপুর পুলিশ থানায় এসেছে। অদ্ভুত, বড় অদ্ভুত। টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, ব্লক এল। একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে– দিশা। ওরই চারতলায় একটা ফ্ল্যাট আছে। দু-দিন আগের ঘটনা। সেখানেই বাড়ির কর্তা হত হয়েছেন। একটা হাউস পার্টি টাইপের ছিল। সেখানেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। সব মিলিয়ে ওই জনা কুড়ি মতো আমন্ত্রিত ছিলেন। তাদের মধ্যে বাচ্চা প্রায় সাত-আট জন। খুন বলব কি না বুঝতে পারছি না। পার্টিতে ড্রিঙ্কসে বিষ ছিল।"

"মানে? শুধু ওই লোকটির গ্লাসে তাই তো?"

"এটাই তো ভীষণ অদ্ভুত ব্যাপার, জেঠুমণি," শিবানী জেলের মধ্যে রাখা উঁচু বসার জায়গাটায় বসে আবার বলতে শুরু করল, "উনি মারা গেছেন খবর পাওয়ার পরই থানা থেকে ওঁর বাড়ি গিয়ে সব খাবার আর ড্রিঙ্কসের স্যাম্পল নিয়ে আসে। বডি পোস্টমর্টেমে পাঠিয়েছিল। তার পরের দিনই ওদের হাতে রিপোর্ট যায় যে ওই লোকটি, মানে অনীশ মুখোটির মৃত্যু হয়েছে Curare বিষের কারণে। আর মজার ব্যাপার হল, প্রায় সব ক-টি গ্লাসেই Curare-এর ট্রেস আছে। কিন্তু মারা গেলেন শুধু একজন। কোনওভাবে

boierpathshala.blogspot.com

কি বাকিরা সবাই জড়িত? পুলিশকে বিভ্রান্ত করার জন্য কি পরে সব ক-টা গ্লাসে বিষ মেশানো হয়? কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।"

প্রখর রুদ্র এবার মুচকি হেসে পাশে বসল, "পোস্টমর্টেম আর টক্সিকোলজির রিপোর্ট আসার পর কেউ বোধহয় তোরা ওই ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ করিসনি?"

"আলাদা করে কথা বলার কী দরকার থাকতে পারে? যা বলার তো রিপোর্টে লিখে পাঠিয়ে দিয়েছে।"

প্রখর রুদ্র চোখ মুখ কুঁচকে বলল, "আমরা যদি আমাদের ভুলগুলো থেকে বানী কিছু না শিখি, জীবনে উন্নতি করার সব রাস্তা বন্ধ। দিলীপ বসাকের কেস থেকে কী শিখলি?"

শিবানী জেঠুমণির দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রখর রুদ্র পায়চারি করতে করতে আবার শুরু করে, "মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করা পোস্টমর্টেম রিপোর্টের কাজ। কিন্তু সেটা দুর্ঘটনা, খুন নাকি আত্মহত্যা, সেটা খুঁজে বের করে কেস ক্লোজ করা পুলিশের কাজ। প্রত্যেকটা জিনিস আমরা যা দেখি, তার থেকেও বেশি কিছু যদি জানতে না পারি, কেসের শিকড় পর্যন্ত পৌঁছোতে পারবি না। আর সেটা যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ একই জায়গায় ঘুরতে থাকবি!"

"বুঝলাম। কিন্তু পোস্টমর্টেমের ডাক্তারকে কী জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল?"

"জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারতিস, Curare আমেরিকান উপজাতিদের মধ্যে বিভিন্ন নামে পরিচিত, যার সব ক-টা কমবেশি অর্থ হল 'উড়ন্ত মৃত্যু'— 'ফ্লায়িং ডেথ'। কারণ, তিরের ফলায় লাগিয়ে শত্রু নিধনের জন্য উপজাতিদের মধ্যে বহুল ব্যবহৃত বিষ। Curare কোনও একটি বিষ নয়। যে সমস্ত গাছের থেকে Alkaloids এক্সট্রাক্ট করা যায় তাদের সবাইকেই এই গোত্রের বিষের মধ্যে ফেলা যায়। এসব কেমিস্ট্রির মধ্যে বেশি না গিয়ে আসল কথায় আসি। এই বিষটি অদ্ভুতভাবে কাজ করে। মানে কেউ খেলে বা শুঁকলে এই বিষ মোটেও কোনওরকম ক্ষতি করে না। একমাত্র সরাসরি রক্তের সঙ্গে মিশলে তবেই এটি তার প্রভাব ফেলতে থাকে।"

"প্রভাব?"

boierpathshala.blogspot.com

"হ্যাঁ। আমাদের দেহের মাসলগুলোতে ব্রেনের পালস পৌঁছে যায় স্নায়ুতন্ত্রের নিউরনের মাধ্যমে। এখন নিউরন ফাইবার আর মাসল সেলের মাঝের অংশে একটি কেমিক্যাল নিউরো-ট্রান্সমিটারের কাজ করে, যার নাম Acetylcholine। এখন Acetylcholine-র কাজ হল মাসলের সংকোচন-প্রসারণকে ট্রিগার করা। অনৈচ্ছিক পেশির ক্ষেত্রে এই কাজটা অনেকটাই একটা নির্দিষ্ট গতিতে হতে থাকে। Curare মাসকুলার জাংশনগুলিতে পৌঁছে Acetylcholine-এর কাজে বাধা প্রদান করে। ফলে মানুষের দেহ-কঙ্কালের সঙ্গে যুক্ত ঐচ্ছিক পেশিগুলো প্রথমে প্যারালাইসিস হয়, তারপর অনৈচ্ছিক পেশিগুলো। মৃত্যুর কারণ, আমাদের বুক আর পেটের মাঝামাঝি থাকা শ্বসনতন্ত্রের ডায়াফ্রাম পরদাটিও প্যারালাইসিস হয়ে পড়ে—ফলে ফুসফুসে হাওয়ার প্রেশার কন্ট্রোলে ব্যর্থ হয়। শেষে শ্বাসরোধেই মৃত্যু। তাই সবার ড্রিঙ্কসে Curare থাকালেও কিছু যায় আসে না। একমাত্র সরাসরি রক্তের সঙ্গে মিশলে তবেই মৃত্যু হবে।" শিবানী কিছুক্ষণ মুখভার করে বসে রইল, "এরকম বিষও হয়, হ্যাঁ?"

প্রখর রুদ্রকে এবার একটু চিন্তিত দেখাল, "সেসব ঠিক আছে। কিন্তু এই ধরনের গাছ মূলত আমেরিকাতেই পাওয়া যায়। আর আন্দামানের কিছু দ্বীপে হয় শুনেছি। এখানে এত সহজে পাওয়াটা একটু ঠিক হজম হচ্ছে না রে।"

"তাহলে তো প্রথমে খোঁজ নিতে হয়, অনীশবাবুর রক্তে কী করে বিষ মিশল?"

"বডি যদি এখনও হ্যান্ডওভার না হয়ে থাকে, তাহলে আরও একবার পোস্টমর্টমের ওখানে খবর নে। দেহে কোনও সুঁচের ছিদ্র আছে কি না? সাধারণ Curare-এর সরাসরি রক্তে মেশার এটাই বলতে গেলে একমাত্র উপায়!"

* * * * * * * *

শিবানী পোস্টমর্টমের ডাক্তার গুপ্তাকে ফোন করল, "আচ্ছা ডা. গুপ্তা, অনীশবাবুর দেহে কোনও সুঁচের চিহ্ন ছিল?"

boierpathshala.blogspot.com

"Curare-এর জন্য জানতে চাইছেন তো?"

"হ্যাঁ।"

"ডান হাতের কনুইয়ের ভিতরের দিকে একটা ছোট্ট সুঁচ ফোটানোর চিহ্ন আছে তো। আমার রিপোর্টেও তো লেখা আছে।"

"না, আসলে আমরা টক্সিকোলজির রিপোর্টে দেখলাম, সব ক-টা গ্লাসেই Curare ছিল। তাই আমরা একটু ভুল পথে আর কী..."

"ও বুঝেছি। বিষ দেখেই আপনারা ভাবলেন বুঝি..." ড. গুপ্তা মনখোলা একটা হাসি হেসে বললেন, "না না। Curare রক্তের সঙ্গে সরাসরি না মিশলে কিছু হয় না। আমার পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা ভালো করে একবার দেখে নিন। আশা করি, আপনার সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। তা-ও যদি হেল্প লাগে, ফোন করবেন।" শিবানী 'ও.কে.' বলে ফোনটা রেখে দেয়।

* * * * * * * *

পরদিন শিবানী অনীশ মুখোটির স্ত্রী শিপ্রার সঙ্গে দেখা করল, "দেখুন, বুঝতে পারছি এই মুহূর্তে হয়তো আপনার মনের অবস্থা ভালো না, তবে কিছু জিনিস জানতে পারলে ভালো হত। মানে সেটা আপনাদের ভালোর জন্যই।"

শিপ্রা মুখোটি তখনও শোক কাটিয়ে উঠতে পারেননি। চোখটা মুছে নিলেন, "কাউকে ছাড়বেন না। কাউকে না। সব ক'টা শয়তান।"

"আপনি একটু খুলে বললে সুবিধা হত।"

"ওর দুই বিজনেস পার্টনার। অনির্বাণ ঘোষ আর ঋজু সামন্ত। কোম্পানির শেয়ার নিয়ে ওদের মধ্যে মনোমালিন্য চলছিল। ওদের ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের বিজনেসে ইনিশিয়াল পঁচিশ লাখ টাকার ইনভেস্টমেন্ট ওঁরই ছিল। ব্যাঙ্কও ওদের লোন দেয়নি। এখন বিজনেসটা একটু দাঁড়িয়ে যেতে, ওরা শুধু টাকাটা ফেরত দিয়েই গা-ঝাড়া দিতে চাইছে। উনি মাত্র ২০% শেয়ার চেয়েছিলেন, কিন্তু ওরা কোনও শেয়ার দিতেই রাজি ছিল না।"

"অনীশবাবু এটা ছাড়া এমনি কী করতেন?"

"উনি অনেক আগে ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কার ছিলেন। পরে ছেড়ে দিয়ে

boierpathshala.blogspot.com

নিজেই শেয়ারে টাকা ঢালেন। আর ওঁর ছোট ফার্মের কিছু ক্লায়েন্ট আছে। তাদেরকে উনি পরামর্শ দেন ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপারে।"

"ওঁর ফার্ম ভালো যাচ্ছিল?"

শিপ্রা নাকটা একবার জোরে টেনে, ধরা গলায় বললেন, "ইদানীং শেয়ার থেকে মিউচুয়াল ফান্ড সবই তো খারাপ যাচ্ছে। তাই বলছিলেন, নতুন কোনও ক্লায়েন্ট আসছে না। যদিও ওই পুরোনো ক্লায়েন্টরা ওঁকে ভালোমতো চেনে। তাই মন্দার বাজারে তারা নিবেশ থামায়নি। বাজারটা একটু চাঙ্গা হলেই ভালো রিটার্ন আসবে, এ কথা ওঁর পুরোনো ক্লায়েন্টরা জানেন।"

শিবানী একটু গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, "কালকের গেস্টদের একটা লিস্ট থানা থেকে পেয়েছি। তা-ও যদি একবার দেখে নেন।"

লিস্টটা নিয়ে শিপ্রা দেখতে শুরু করলেন, "আমাদের প্রতিবেশী তিনটি পরিবার। বিজনেস পার্টনার দু-জনের ফ্যামিলি। অবিনাশ। আর নীলিমার দুই ছেলে।"

"অবিনাশ আর নীলিমা— এরা কি বন্ধুস্থানীয়?"

শিপ্রা কেমন যেন একটু থমকে গেলেন, "হ্যাঁ... না মানে... নীলিমা আমার ননদ। ও লেক গার্ডেনসে থাকে।"

"আর অবিনাশ?"

"উম... মানে উনি ডাক্তার... আমার স্বামীর পরিচিত।"

"ও আচ্ছা। আর-একটা প্রশ্ন ছিল। অনীশবাবুর কনুইয়ের উলটোদিকে ইঞ্জেকশনের একটা ছিদ্র পাওয়া গেছে। আপনি কিছু জানেন?"

"ওর শুগার ছিল। হাই। ইনসুলিন নিতে হত। দুপুরেও নিয়েছিল কাল।"

"আপনার আপত্তি না থাকলে সিরিঞ্জটা নিয়ে যেতে হবে। টক্সিসিটি চেক করতে হবে।"

শিপ্রা অমনোযোগী হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ যেন ঘোর কেটেই রেগে উঠলেন, "আপনারা আমার কথা ঠিক করে শুনছেন না। আমি বলছি, ওর ওই দুই বিজনেস পার্টনারই যত নষ্টের গোড়া। ওদের ধরুন। শুধু শুধু সময় নষ্ট করছেন।"

boierpathshala.blogspot.com

এবার শিবানী কঠোর হয়, "দেখুন, আমাদের কাজটা আমাদের করতে দিন। কীভাবে করব সেটা আমাদের উপর ছাড়ুন।"

শিপ্রা আর কোনও কথা না বলে, ঘর থেকে একটা ওষুধের বাক্স এনে টেবিলের উপর রাখল। বক্সের মধ্যে একগাদা ওষুধ দেখে শিবানী বলল, "সব কি মি. মুখোটির?"

শিপ্রা সিরিঞ্জটা বের করতে করতে বলল, "হ্যাঁ। এইটা শুগারের, এটা প্রেশারের, এটা ওর কাঁধের ব্যথার জন্য আর এটা ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স। ক-দিন ধরেই ওঁর ফিভার ব্লিস্টার হয়েছিল। আর এটা ক্যালশিয়াম আর এটা আয়রন।" এত ওষুধ দেখে শিবানীর ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। সিরিঞ্জটা নিয়েই শিবানী একটা এয়ারটাইট প্যাকে ঢুকিয়ে নিল। মনে মনে ভাবতে থাকল, এত ওষুধ খেয়েও একটা মানুষ যে এতদিন বেঁচে ছিল, এই ঢের!

* * * * * * * *

অনির্বাণ ঘোষ আর ঋজু সামন্তর সঙ্গে শিবানীর দেখা হয়ে গেল ওঁদের অফিসেই। কোনও ভণিতা না করেই শিবানী সরাসরি প্রশ্ন ছুড়ে দিল, "অনীশবাবুর সঙ্গে আপনাদের ব্যাবসা সংক্রান্ত একটা বিবাদ চলছিল শুনলাম। সে ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করবেন কি?"

ঋজু সামন্ত কিছুক্ষণ অনির্বাণের দিকে চেয়ে থেকে নিজেই শুরু করলেন, "পাঁচ বছর আগে আমাদের পঁচিশ লাখ দিয়ে ব্যাবসা শুরু করতে মুখোটিবাবু সাহায্য করেন। আমরা ওঁরই পুরোনো ক্লায়েন্ট ছিলাম। চুক্তি হয়েছিল, বছরে ১২% ইন্টারেস্ট দিতে হবে আর দশ বছরে শোধ করব। প্রথম বছরটা সত্যি বলতে আমাদের খুব ভালো যায়নি। পরের বছর থেকে খাটাখাটনি করেই আমরা ব্যাবসাটা বেশ কিছুটা গুছিয়ে মুনাফা তুলতে শুরু করি। হঠাৎই পাঁচ বছর পর তিনি এখন অংশীদারিত্ব দাবি করছেন। আপনিই বলুন, এটা কী করে হয়! ব্যাঙ্ক আমাদের লোন দিচ্ছিল না বলে উনি চড়া সুদে লোন দিয়েছেন। সুদের টাকাও গুনছেন, এদিকে ব্যাবসার ভাগও চাইছেন!"

শিবানী মাঝপথে থামিয়ে বলে, "সে চুক্তির কপি দেখাতে পারেন আপনারা?"

boierpathshala.blogspot.com

অনির্বাণের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, "নিশ্চিত," বলেই অফিসের তালা-দেওয়া একটা ড্রয়ার খুলে হলদে রঙের ফাইল বের করলেন। তারপর টেবিলের উপর চুক্তিপত্রটা বের করে রাখলেন।

শিবানী কিছুক্ষণ দেখে বলল, "এর একটা কপি আমার চাই।" অনির্বাণবাবু কাগজটা নিয়ে জেরক্স করতে চলে গেলেন। শিবানী জিজ্ঞাসা করল, "ওদিন কি আপনারা নিমন্ত্রিত ছিলেন? নাকি কাজে গিয়েছিলেন?"

"আমরা আমন্ত্রিতই ছিলাম। আসলে পাঁচ মাস ধরে এই সমস্যাটা চলছেই—কখনো ফোনে, কখনো আমাদের অফিসে এসে চেল্লাচ্ছেন। তাই আমি আর অনির্বাণ ভাবলাম, যদি উনি ওঁর বাকি টাকাটা সুদ সমেত ফেরত না চান তাহলেই আমরা ১৫% দিতে রাজি আছি। তা না হলে নয়।"

"তা সেদিন কি এ ব্যাপারে কিছু কথা হয়েছিল?"

ঋজুবাবু এবার একটু হাত কচলাতে শুরু করলেন, "সত্যি বলতে কী, মুখোটিবাবু অনেকটাই পান করে ফেলেছিলেন। একটু বেসামাল আর কী! এর মধ্যে আমরা আর কী যে বলব, তারপর তো ওই এক কাণ্ড হল। চোখের সামনে..."

শিবানী একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "তার মানে অংশীদারিত্বের গল্পটা এখন বসে আপনি ফাঁদলেও কারও ধরার উপায় নেই!"

"এ কী বলছেন আপনি। শুধু শুধু মিথ্যে বলতে যাব কেন!"

"পুলিশের কাছে ভালো সাজার জন্য। যা-ই হোক, আপনাদের উপর আমার নজর থাকবে। কিছু জানতে হলে আবার আসব। আর-একটা প্রশ্ন, Curare সম্পর্কে কি কিছু জানেন?"

ঋজুবাবু কিছুক্ষণ আকাশপানে চেয়ে বললেন, "Curare? এটা কী? এটা কি কোনওভাবে মুখোটিবাবুর হত্যার সঙ্গে জড়িত?"

শিবানী মুচকি হেসে বলল, "বাঃ, অনেক কিছু জানেন দেখছি। তা আপনারা শেষ কবে আমেরিকা গিয়েছিলেন?"

ঋজুবাবু একটু সংযত হয়ে গেলেন, "এই তো, মাস দুই আগে আমি। আর তার মাসখানেক আগে অর্নিবাণ।"

boierpathshala.blogspot.com

এর মধ্যে অনির্বাণ জেরক্স করে ফিরে এলেন। শিবানী আর কোনও কথা বাড়াল না, "না জানিয়ে দেশ কেন, শহর ছাড়ারও চেষ্টা করবেন না।"

* * * * * * * *

শিবানী এরপর যায় অবিনাশের বাড়ি। অবিনাশবাবু পেশায় ডাক্তার। বাড়ির সামনে ছোট্ট বাগানের মতো আছে। যদিও অযত্নে চারিদিকে আগাছা গজিয়ে উঠেছে, একটা টগর ফুল গাছে কিছু টগর ফুটে আছে। অবিনাশবাবুর বাড়ির সামনের ছোট ঘরটা দেখলে বোঝা যায়, সেখনেই তিনি রুগি দেখেন।

শিবানী ঘরের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে অবিনাশবাবুর বিভিন্ন কনফারেন্সের ছবি ও ফলকগুলি দেখছিল। অবিনাশবাবু তার অমায়িক ভারী গলায় বললেন, "আমি জানতুম, আপনারা আসবেন। বলুন কীভাবে সাহায্য করতে পারি?"

শিবানী ঘরের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতেই বলল, "সেদিন যখন অনীশবাবু অসুস্থ বোধ করছিলেন, তখন আপনি ছিলেন?"

"ছিলাম তো। পাল্‌স ড্রপ দেখে আমিই তো অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করলাম।"

"আপনি ওঁকে কীভাবে চেনেন?"

"ওই ওঁর ফার্মের মাধ্যমে। এক বন্ধু ওঁর কার্ড দিয়েছিল। গিয়েছিলাম। বছর চারেক আগে। তারপর থেকে বলতে পারেন, একরকম ফ্যামিলি ডাক্তারের মতো হয়ে গেছি। কিছু হলেই ফোন-টোন করতেন। আমি আমার ফি নিতাম না আর উনিও ওঁর ফি নিতেন না। বুঝলেন কি না?" বলে একটু হেসে উঠলেন।

"আপনার আর কে কে আছে?"

"সব সময় পড়াশোনা আর রুগি এই নিয়েই থাকি। বিয়ে-থা করিনি।"

"আপনার দেওয়ালে অনেক দেশ-বিদেশের বিভিন্ন হসপিটালের সম্মাননা দেখতে পাচ্ছি। তা শেষ দক্ষিণ আমেরিকা কবে গিয়েছিলেন?"

"তা তো অনেকদিনই হল। প্রায় বছর পাঁচেক আগে শেষ গেছি। কেন বলুন তো?"

"অনীশবাবুর দেহে Curare পাওয়া গেছে। তার কারণেই মারা গেছেন।

boierpathshala.blogspot.com

আপনি জানেন Curare সম্পর্কে?"

অবিনাশবাবু জোরে হেসে উঠলেন, "তা বেশ বেশ। আপনি ভাবলেন বুঝি আমিই দিয়েছি। হা... হা... হা। তাহলে আর আমি খামোখা ওঁকে চেক করে অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে গেলাম কেন! মরতে দিতেই পারতাম না কি? ওখানে আমি ছাড়া আর কেউ ডাক্তার ছিলেন না। চাইলে তার সুযোগ নিতাম না কী? তা ছাড়া আমার মোটিভটাই বা কী? আমি কোনওভাবেই ওঁর সম্পত্তির ভাগ পাব না। উলটে আমার ক্ষতি! এখন ওঁর মতো অভিজ্ঞ শেয়ার কনসালটেন্ট কোথায় পাই!"

শিবানী একটা ফোটোর দিকে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতে থাকল। ছবিতে ডাক্তারবাবু আর সঙ্গে আরও একটি লোক একসঙ্গে দাঁড়িয়ে। দু-জনেরই অনেক আগের ছবি, দেখলে বোঝা যায়। শিবানী সেদিকে চোখ রেখেই বলল, "আমার প্রশ্নের উত্তর পেলাম না। Curare কী জানেন? আর ছবিতে এটা কে? আপনার সঙ্গে মুখটা খুব মেলে।"

"হ্যাঁ, আমার ভাই।"

"তাহলে যে বললেন, আপনার কেউ নেই।"

"আমি মিথ্যে বলিনি। ও ইহলোকে নেই। বাদ দিন। ওর কথা মনে এলেই মুডটা খারাপ হয়ে যায়।"

শিবানীর ভিতর থেকে একটু খারাপ লাগল, "আই অ্যাম সরি। আসলে তদন্ত করতে করতে আমরা বোধহয় সবকিছুকেই এত সন্দেহের চোখে দেখি যে মানুষগুলোকে যন্ত্রণা দিয়ে ফেলি।"

অবিনাশবাবুর কথায় আবার শিবানী সংবিৎ ফিরে পেল, "ইট্‌স ওকে। আর হ্যাঁ, ডাক্তার তো তাই Curare সম্পর্কে জানি। তবে দক্ষিণ আমেরিকার কোনও জঙ্গলে আমি যাইনি, সভ্য শহরগুলিতে গেছি। তাই Curare-এর কথা শুনলেও দেখিনি কোনওদিন।" শিবানীর কেমন যেন একটা খারাপ লাগা কাজ করতে থাকে। তাই ডাক্তারকে আর বিব্রত না করে বেরিয়ে যায়।

* * * * * * * * *

boierpathshala.blogspot.com

শিবানী সেদিন সন্ধেবেলাতেই জেঠুমণির সেলে এসে সবার সঙ্গে যা কথা হয়েছে বলে নিয়ে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছিলে, অনীশের দেহে সুঁচ ফোটানোর চিহ্ন ছিল। ডাক্তার গুপ্তাকে ফোন করায় উনি কনফার্ম করেছিলেন। ওঁর স্ত্রী-র থেকে জানলাম, ইনসুলিন নিতে হত। সেদিন দুপুরেও নিয়েছিলেন। আর মনে হয়, ওটাতেই Curare ছিল। ল্যাবে দিয়েছি। কাল রিপোর্ট পেয়ে যাব। এখন শুধু খুঁজতে হবে, কে?"

প্রখর রুদ্রকে একটু চিন্তিত দেখাল। জেলের মধ্যেই মাথা নিচু করে পায়চারি করতে লাগল, "তুই শিয়োর উনি দুপুরে নিয়েছিলেন?"

"ওঁর স্ত্রী তো তা-ই বললেন। যদি না মিথ্যা বলে থাকেন। কেন?"

"দুই আর দুই কি পাঁচ হয় রে! সেটাই বুঝতে পারছি না। তুই কি আর-একবার ডাক্তার গুপ্তাকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করবি, আর কোনও সুঁচের দাগ দেহে ছিল কি না?"

শিবানী একটু বিহ্বল মুখে জিজ্ঞাসা করল, "সে না হয় করছি কিন্তু কী হয়েছে বলবে কি?" এর মধ্যেই ডাক্তার গুপ্তা ফোন তুলতেই শিবানী কিছুক্ষণ কথা বলে উত্তর দিল, "না গো জেঠু। দেহে Curare পাওয়া গিয়েছিল বলেই উনি কয়েকবার দেহ পরীক্ষা করেছিলেন আর ওই একটাই সুঁচের চিহ্ন ছিল।"

প্রখর রুদ্র জেলের কুঠুরিটার মধ্যে পায়চারি করতে থাকল আরও অস্থিরভাবে। হঠাৎ থমকে গিয়ে শিবানীকে বলল, "অনীশের স্ত্রী সত্যি কথাই বলছে। আমি সিয়োর।" আবার পায়চারি করতে থাকল। শিবানী এবার একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "কী হয়েছে, আমাকেও একটু তো বলো। আমি যদি হেল্প করতে পারি!"

"তুই ইনসুলিনের যে সিরিঞ্জ ল্যাবে পাঠিয়েছিস, তাতে কিছু পাওয়া যাবে না।"

"শিপ্রা মুখোটি কি সেটা চেঞ্জ করে দিয়েছেন বলছ?"

"সম্ভবত না।"

"ধুস, কিছুই বুঝছি না।"

প্রখর রুদ্র এবার এসে শিবানীর পাশে বসল, "Curare বিষ শরীরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তার ক্রিয়া শুরু করে দেয়। আর টেনেটুনে হলেও চল্লিশ

boierpathshala.blogspot.com

মিনিটের মধ্যে যদি কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা না করা যায় তাহলে মৃত্যুটা জাস্ট হচ্ছেই!"

এবার শিবানী বিড়বিড় করে ওঠে, "আর সেটা যদি ইনসুলিনে থাকত তাহলে অনীশবাবু সন্ধে অবধি ঠিকঠাক থাকতেন না। আর যদি ইনসুলিনে বিষটা থাকত তাহলে আর ড্রিঙ্কসে থাকত না। আর বিষটা যখন ড্রিঙ্কসে ছিল, তখন ইনসুলিনের সিরিঞ্জও বদলানোর কোনও প্রয়োজনই নেই। মানে শিপ্রাকে সন্দেহের বাইরে আপাতত রাখা যেতে পারে।"

প্রখর রুদ্র চোখ বুজে বলতে থাকল, "সেটা তো ঠিক আছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে Curare অনীশবাবুর দেহে ঢুকল কী করে! এমন কী পদ্ধতি আততায়ী নিল যে সবার শরীরে ঢোকেনি কিন্তু অনীশবাবুর দেহে ঢুকল! বুঝতে পারছি না রে। খুবই বুদ্ধিমান লোক, যেই করে থাক।"

"তাহলে আমি জেরা চালিয়ে যাই। যদি কিছু পাওয়া যায়।"

"হুম। যেকোনও আততায়ীর কাছে পৌঁছোনোর একটাই রাস্তা। আগে তার অপরাধের পদ্ধতিটা জানা। প্রত্যেক অপরাধীই তার অপরাধ পদ্ধতির মধ্যেই নিজের কোনও না কোনও ছাপ রেখে যায়। সেটা বোঝাটা দরকার আগে। কিছু একটা বিরাট জিনিস আমরা বুঝতে পারছি না। সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় চোখ-কান খোলা রাখিস। ক্লোজ অবজার্ভেশনই এই কেসটা সল্‌ভ করবে।"

* * * * * * * *

আগামী কিছুদিন জোরকদমে শিবানী বার বার দফায় দফায় যারা যারা সেদিন মুখোটির ফ্ল্যাটে ছিলেন, সবার সঙ্গে কথা বলা শুরু করল। বারকয়েক সে বোটানি ল্যাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থেকেছে। প্রখর রুদ্র তার দুই ভাইঝি সম্পর্কে বলে, "বানী প্রচণ্ড পরিশ্রমী আর ধৈর্যশীল, সে চাইলে যেকোনও কিছুকে রপ্ত করে ফেলতে পারে। আর ইন্দ্রা অনুভূতিপ্রবণ কিন্তু ন্যাচরাল ট্যালেন্ট। বিষ, অপরাধবিজ্ঞানের খুঁটিনাটি তার যেন নখদর্পণে।"

শিবানী এখন তার সেই ধৈর্য আর পরিশ্রমের পরীক্ষা দিয়ে চলেছে। সবকিছু

boierpathshala.blogspot.com

সামনে থেকেও যেন সব অদৃশ্য! শিবানী প্রত্যেকদিনের মতোই প্রখর রুদ্রর সেলে রাতে ফেরার আগে একবার দেখা করতে এল। চোখ-মুখ শিবানীর বসে গেছে। কিছুটা মুষড়ে-পড়া মুখ নিয়ে জেলের কুঠুরিটার সামনে দাঁড়ায়। প্রখর রুদ্র জেলের দরজাটার সামনে এগিয়ে আসে, "এখনও কিছু পেলি না বুঝি? অত ভাবিস না। ঠিক পারবি। একটু ধৈর্য ধর। সময় লাগলেও আমি জানি, তুই পারবি। যেখানে যা দেখেছিস, সব ভালো করে খেয়াল কর। ঠিক পারবি।"

শিবানী একটা শুকনো হাসি এসে বলে, "ওসব ছাড়ো। যা হবার হবে। তুমি রাতে ঠিকঠাক খেয়েছ? তোমার শরীরটাও ভেঙে পড়েছে অনেকটাই।"

"আমার আর শরীর, বয়স তো অনেক হল। আস্তে আস্তে যাওয়ার সময় হল। খাওয়া-দাওয়া করছি তো। কাল থেকে গালে তিনটে ফিভার ব্লিস্টার হয়েছে। তোদের জেলে ডিমটা দেয় না, ভিটামিন বি-কমপ্লেক্সের অভাব। ঠিক হয়ে যাবে যদিও। তবে এ ক-দিন খেতে একটু কষ্ট হবে। এই যা।"

শিবানী মুচকি হেসে বলল, "আচ্ছা, আমি না হয় কাল থেকে বলে দেব কিছুদিন জেলের মেনুতে ডিম রাখতে। আর তা-ও আমি জেলের ডাক্তারকে..." শিবানী বলতে বলতে থেমে গেল। তারপর চিৎকার করে উলটোদিকে ছুটতে থাকল, "থ্যাঙ্ক ইউ জেঠু। আশা করি, কেসটা আজ রাতেই সল্‌ভ হয়ে যাবে। তুমি ঠিকই বলেছিলে, খুনের প্রক্রিয়াটা জানতে পারলে আততায়ীও হাতের নাগালে চলে আসে।"

শিবানী ছুটতে ছুটতে ফোন করল, "শ্যামল, হ্যালো, হ্যাঁ, আমি শিবানী বলছি। আমার এক্ষুনি প্রেসিডেন্সি ২০০৬ ব্যাচ ইকনমিক্স অনার্সের সব স্নাতক ছাত্র-ছাত্রীর লিস্ট টেবিলে চাই। দু-ঘণ্টার মধ্যে। আই ডোন্ট নো হাউ ইউ ডু! বাট আই ওয়ান্ট ইট নাও। উইথ অল ফ্যামিলি ডিটেলস।" শিবানী ফোন রেখেই দীপককে ফোন করল, "দীপক, গাড়ি রেডি করো। আমরা এখুনি এক জায়গায় বের হব। একটু গোপন কাজ। একটা বাড়ি থেকে গাছ চুরি করতে হবে... হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক শুনছ... মাছ না... গাছ... গাছ... আর বোটানি ফরেনসিকের ডাক্তার ভৈরবকে বলে দাও, আমরা না-আসা পর্যন্ত যেন বাড়ি না যান।"

boierpathshala.blogspot.com

* * * * * * * *

লালবাজারের ঘড়িতে তখন রাত একটা। সেই পলেস্তারাখসা হলদে দেওয়ালের ইন্টারোগেশন রুম, উপর থেকে একটা ষাট ওয়াটের বাল্‌ব জ্বলছে। ঘরের একটা দিকে দীপক আর অন্যদিকে শ্যামল দাঁড়িয়ে। টেবিলের একটা দিকে বসে আছে শিবানী আর অন্যদিকে... শিবানী জেরা শুরু করে, "সব কি নিজের মুখেই স্বীকার করবেন? নাকি আমাদের পরিশ্রম করাবেন?"

"আমি কিছুই করিনি। কী স্বীকার করতে বলছেন আপনারা? আর এই রাতে আমাকে এখানে তুলে আনার কারণ? আমি কিন্তু আপনাদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করতে পারি।"

"আগে আপনি খুনের কেসটা থেকে যাবজ্জীবন শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে বের হন, তারপর না হয় আমাদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করবেন।"

"আমি কাউকেই খুন করিনি। অযথা আপনারা সময় নষ্ট করছেন!"

"তা-ই বুঝি? তা সেদিনের স্কচটা তো আপনিই নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই বোতলটি আমরা উদ্ধার করেছি। তাতেও Curare ছিল।"

"হতে পারে। তাতে এটা প্রমাণ হয় না যে বিষ আমি মিশিয়েছিলাম। তা ছাড়া বিষ থাকলে আমি নিজেও বা খেতাম কেন?"

শিবানী হেসে ওঠে, "আপনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান বলেই খেয়েছিলেন। আপনি ভালো করেই জানেন, Curare সেবনে কোনও ক্ষতি হয় না, যদি না সরাসরি রক্তের সঙ্গে মিশছে। তাই তো সবাই যে স্কচ খাবে, তাতেই বিষ মেশালেন, যাতে সন্দেহ আর কোনওভাবেই কোনও একজনের উপর কেন্দ্রীভূত না হয়!"

"তাই যদি হবে, তাহলে অনীশের রক্তে Curare ঢুকল কী করে? আমি তো আর দক্ষিণ আমেরিকার উপজাতির মতো তার উপর তির চালায়নি!"

শিবানী এবার হাততালি দিয়ে উঠল, "আপনি ভাঙবেন তবু মচকাবেন না। আমিও হয়তো কোনওদিনই বুঝতে পারতাম না, যদি সেদিন শিপ্রা মুখোটি তাঁর স্বামীর ওষুধের বক্সটি না দেখাতেন। ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স! তা-ই তো?"

"কী বলতে চাইছেন? পরিষ্কার করে বলুন।"

শিবানীর চোয়াল দৃঢ় হয়ে ওঠে, "কাম অন। ডোন্ট অ্যাক্ট সো ইনোসেন্ট ড. অবিনাশ খাসনবিশ। আপনি অনীশদের ফ্যামিলি ডাক্তার ছিলেন। আপনি ভালো করেই জানতেন অনীশের ফিভার ব্লিস্টার হয়েছে বলে। তাই আপনিও সুযোগ ছাড়লেন না। স্কচে বেশ পরিমাণমতোই Curare মেশালেন। আপনি ভালোমতোই জানতেন, সচেতন অবস্থায় Curare-এর তিতো স্বাদ খুব সহজেই ধরা পড়ে যেতে পারে। প্রথমে সেদিনের পার্টিতে অনীশের কেনা একটি বোতল খুলে পার্টি শুরু হল। অনীশ আর সবাই একটু হালকা বেসামাল হতেই আপনি আপনার বোতল খুললেন। যাতে কারও সন্দেহ না হয়, নিজেও খেলেন। আর হতভাগ্য অনীশের গালের ভিতরে ফিভার ব্লিস্টারের ক্ষত দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে Curare রক্তে মিশতে শুরু করে। তারপর তো সময়ের অপেক্ষা। মদ্যপ অবস্থায় পড়ে-থাকা ব্যক্তিকে আর প্যারালাইজ্‌ড অবস্থায় পড়ে-থাকা ব্যক্তিকে এত সহজে পার্টিতে কে-ই বা খেয়াল করতে যেত! কিন্তু এখানেই একটা মোক্ষম ভুল করে বসেছিলেন আপনি। সকাল পর্যন্ত পড়ে থাকতে দিতেন। সবাই তো অর্ধেক সংজ্ঞাহীন ছিলই। কী দরকার ছিল নিজেকে বেশি সৎ প্রমাণের চেষ্টা করার! নিজেকে সন্দেহের বাইরে রাখতে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন অনীশ অসুস্থ, তারপর নিজেই অ্যাম্বুলেন্স ডাকলেন। আপনি ভালোমতোই জানতেন, অনীশ হসপিটালে যাওয়ার আগেই মারা যাবে। কী তা-ই তো?"

ডাক্তার অবিনাশ খাসনবিশের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল, "এতসব কোর্টে প্রমাণ করতে গেলে আগে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে Curare আমার কাছে আছে। আর আমি গত পাঁচ বছর আমেরিকা কেন, দেশের বাইরে যাইনি।"

"ঠিক কথা। ডাক্তার ভৈরবের রিপোর্টটা, দীপক," শিবানী হাত দিয়ে দীপকের দিকে ইশারা করল। দীপক এসে টেবিলে একটা রিপোর্ট রাখল। ফাইলের ভিতরে একটা এয়ারটাইট খামে কয়েকটা সবুজ পাতা আর গাছের ছাল। শিবানী ফাইলটা এগিয়ে দিল ডাক্তার খাসনবিশের দিকে, "পুরো গাছটাই পেলে বিষটা যে আপনার কাছেই ছিল, তা প্রমাণ করা কি খুব কঠিন

boierpathshala.blogspot.com

হবে অবিনাশবাবু? আপনার বাড়ির টগর গাছের গায়ে একটা মোটা কাছির মতো পাকানো গাছ জড়িয়ে উঠেছে। প্রথম দিন দেখে ভারী অদ্ভুত লেগেছিল। এরকম গাছ আমি আগে দেখিনি। বোটানি ল্যাবে পড়াশোনা করতে করতে জানতে পারলাম সব থেকে মারাত্মক রকমের Curare-টি হল Tubocurarine। এটি যে গাছ থেকে পাওয়া যায় তার বিজ্ঞানসম্মত নাম Chondrodendron Tomentosum। এই গাছটিই তো আপনার বাড়ি আছে। তা-ই তো?"

ডাক্তার অবিনাশ একটু মুচকি হেসে উঠলেন, "এত কিছুর পরও কোর্টে আমায় খুনি প্রমাণ করতে গেলে একটা জোরালো মোটিভের দরকার। সেটা কোথা থেকে খাড়া করবেন? অনীশের সঙ্গে আমার কোনও আর্থিক রেষারেষি ছিল না, ব্যক্তিগত তো না-ই। তাহলে এবার কী করবেন?"

শিবানী হাত দিয়ে শ্যামলের দিকে ইশারা করল। শ্যামল এগিয়ে এসে টেবিলে একটা নামের লিস্ট রাখল। শিবানী ডাক্তার অবিনাশের চোখে চোখ রেখে বলল, "হ্যাঁ অনীশবাবুর সঙ্গে ছিল না ঠিকই। কিন্তু শিপ্রা মুখোটির সঙ্গে?" অবিনাশবাবুর মুখটা হঠাৎই কেমন যেন থমথমে হয়ে গেল। শিবানী আবার বলা শুরু করল, "খুন কি শুধু লোভের কারণেই হয়, অবিনাশবাবু? প্রতিহিংসাতেও হয় তো, নাকি? কি বলেন? যা-ই হোক, বাকিটাও আমিই বলি। ২০০৬ ইকনমিক্স প্রেসি ব্যাচ, অভিলাষ খাসনবিশ। ব্রাইট স্টুডেন্ট। আপনার ভাই তো? খবর নিয়েছি আমরা। গ্র্যাজুয়েশনের কয়েকদিন পর বন্ধুরা একসঙ্গে মিলে হিমাচল ঘুরতে যায়। কলেজের হার্টথ্রব ছিলেন তখন শিপ্রা মুখোটি, ও সরি, তখন তো তিনি দাস ছিলেন। যা-ই হোক ট্রিপে চ্যালেঞ্জ হল— সব থেকে বেশি মদ্যপান যে পুরুষ করতে পারবে, সেরাতে শিপ্রা দাসের সঙ্গে একই ঘরে থাকার সুযোগ সে-ই পাবে। প্রকৃতির আদিমতম চাহিদার ফাঁদে আপনার ভাই আর সব ছেলের মতোই পা দিল। কিন্তু সে জিততে পারেনি। রাগে-হতাশায় সে রাতের অন্ধকারে হোটেলের বাইরে চলে যায়। অতিরিক্ত মদ্যপানে টাল সামলাতে না পেরে পাহাড় থেকে পড়ে যায়। পরদিন তার ছিন্নভিন্ন দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া দলা-পাকানো দেহটা উদ্ধার হয়।

boierpathshala.blogspot.com

আপনি পুলিশে কেস করতে চাইলেও, পুলিশ কেসটি দুর্ঘটনার কেস বলেই বন্ধ করে দেয়।"

ডাক্তার অবিনাশ এবার চিৎকার করে উঠল, "ওটা দুর্ঘটনা ছিল না। একটা নোংরা মেয়েমানুষ তার শরীরের খিদে মেটাতে আমার ভাইয়ের বলি চড়াল, তাকে এত সহজে আমি ছাড়তে রাজি ছিলাম না। অনেক উকিল–পুলিশের কাছে গেছি। সব শালা এককথা। বলে কিনা দুর্ঘটনা। আর যার জন্য এটা হল, সে পার পেয়ে যাবে! আমায় অভিলাষ অনেকবার বলেছিল, সে শিপ্রাকে খুব ভালোবাসে কিন্তু মনের কথা বলে উঠতে পারে না। আমি বলেছিলাম গ্র্যাজুয়েশনের পর প্রোপোজ করতে। কিন্তু ট্রিপটা আমার ভাইকেই কেড়ে নিল। ভাইয়ের মৃত্যুর পর আমি দক্ষিণ আমেরিকা আমার কাজের জন্য চলে গিয়েছিলাম। সেখানের Tubocurarine সম্পর্কে জানতে পারি। মনে মনে ভাবলাম, এর থেকে ভালো উপায় আর কিছু হতেই পারে না। ভিড়ের মধ্যে চলতে চলতে শিপ্রার শরীরে একটা ছোট্ট সুঁচের খোঁচা। ব্যাস।"

"তাহলে অনীশকে মারলেন যে?"

"দেশে ফেরার পর অনেকভাবে শিপ্রাকে খোঁজার চেষ্টা করেও বিফল হই। বছর দুই-তিন আগে আমি শেয়ারে টাকা ইনভেস্টের জন্যই অনীশের সঙ্গে দেখা করি। অনীশের অফিসে শিপ্রার ছবি দেখে বিন্দুমাত্র চিনতে ভুল হয় না। তাই অনীশের সঙ্গে সখ্য বাড়িয়ে ধীরে ধীরে তার বাড়িতেও যেতে শুরু করি। শিপ্রা আমায় কোনওদিনই দেখেনি, তাই চিনত না। অনীশবাবুর বাড়ি গিয়ে দেখলাম নতুন সংসারে শিপ্রা বেশ খুশি। মন বদলে গেল। ওকে মেরে দিলে তো সব শেষ। আমার ভাই মারা যাওয়ার পর ঠিক কতটা কষ্ট নিয়ে আমি বেঁচে আছি, সেটা বোঝানোটা বেশি দরকার। তখন ঠিক করে ফেললাম, অনীশকেই মারব। তাই ওদের বিশ্বাস অর্জন করে আরও কাছে যেতে থাকি, যাতে সঠিক সময়ে যা করার করতে পারি। আর সেই সময় এসেও গেল যখন অনীশ তার মুখের ফিভার ব্লিস্টারের জন্য ওষুধ চাইতে আসে। এবার আপনারা যা শাস্তি দেন দেবেন। পারলে ফাঁসির ব্যবস্থা করবেন। আমার একমাত্র ভাইটিই ছিল। সে-ই যখন নেই, এতদিন তো শুধু প্রতিশোধটাই

boierpathshala.blogspot.com

নেওয়ার জন্য বেঁচে ছিলাম। সেটা হওয়ার পর এখন কেমন যেন বুকটা ভার-ভার লাগছে। তাই ফাঁসিটাই দেখুন।"

শিবানী উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ল, "ওটা বিবেকের দংশন। ডাক্তার হয়ে একজন মানুষ মেরেছেন, তার অপরাধবোধের বোঝা তো বইতেই হবে।"

"সে আপনি যা-ই বলুন। এটা না হলে ওই মেয়েমানুষটার শিক্ষা হত না। আপনি ভাইয়ের ব্যাপারটা কখন জানলেন?"

"আপনার ঘরে আপনার সঙ্গে আপনার ভাইয়ের ছবি দেখে। একই ঘরে অভিলাষের গ্র্যাজুয়েশন ডে-রও ছবি আছে। অভিলাষ যে মেয়েটির পিছনে দাঁড়িয়ে, সেটি শিপ্রা। প্রথম দিন খটকা লেগেছিল, কিন্তু পরে আর অত তলিয়ে ভেবে দেখা হয়নি। আর আপনি Tubocurarine এ দেশে আনলেন কী করে? এয়ারপোর্টে তো আটকানো উচিত ছিল।"

ডাক্তার অবিনাশ হেসে বলে উঠলেন, "তিনটে বীজ নিয়ে এসেছিলাম। Tubocurarine বীজও দেখতে প্রায় একটা কুমড়োর দানার মতোই। শুধু একটু খসখসে। তাই বোধহয় আর অত কেউ খেয়াল করেনি। যদিও ফর সেফ সাইড, আমি নিজেও একটা গিলে নিয়েছিলাম। যাতে অন্তত একটি বীজ হলেও আমি আনতে পারি।"

শিবানী মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। দীপককে ইশারা করে নিয়ে যেতে বলে। দীপক অবিনাশবাবুকে নিয়ে চলে যায়। শিবানী ভাবতে থাকে মানুষ জীবটা বড়ই অদ্ভুত। তার প্রেমের যেমন সীমা নেই, ঘৃণাও তেমন সীমাহীন। শুধুমাত্র ভাইয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য একটা লোক কতটাই না বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। সে তার সব মানসম্মান,প্রতিপত্তিকে ছেড়ে যেতেও পিছপা হয়নি। সত্যি বড় অদ্ভুত জীব... মানুষ।

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

নষ্ট ভ্রূণ

শহরের অন্যতম শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. মীনাক্ষী Fetel Doppler-টা দিয়ে আবারও ভালো করে দেখলেন। তারপর সোনোগ্রাফির, স্ক্রিনের দিকে হতাশ হয়ে তাকিয়ে থাকেন। তিনি ভালোমতোই পরিস্থিতিটা বুঝতে পারছেন তা-ও আরও একবার নিশ্চিত হতে চাইছেন। টেবিলে শোয়া মহিলাটি জিজ্ঞাসা করলেন, "এবারও কি তাহলে..." ডা. মীনাক্ষী কিছু উত্তর দেওয়ার দরকার বোধ করলেন না— নাকি শুনতেই পেলেন না কে জানে! পরীক্ষা করে বাইরে আসতেই মহিলাটির স্বামী ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ম্যাডাম, এবার কি ছেলে হবে?" ডা. মীনাক্ষী নিঃশব্দে ডায়ে-বাঁয়ে মাথা নাড়ালেন।

*　　*　　*　　*　　*　　*　　*　　*

প্রায় বছর কুড়ি পর কুন্তলা রুদ্র আর তাঁর গাইড মিস্টার পারেখ মুখোমুখি। মি. প্রশান্ত পারেখ— শহরের এক সময়ের নামী ক্রিমিনাল লইয়ার। এখন যদিও অবসর নিয়েছেন। কুন্তলা রুদ্র যখন বছর তেইশের সদ্য ল ডিগ্রী পাশ করা ছাত্রী, তখন পারেখ বছর পঁয়ত্রিশের দুঁদে উকিল। শহরের মন্ত্রী থেকে ক্রিমিনাল সবাই লাইন দিত তাঁর বাড়ির সামনে। প্রশান্ত পারেখও নিজের সহকারী বাছতেন খুব সতর্কভাবে। যাদের বাছতেন তাদের শুধু আইন জানলেই চলত না, সঙ্গে তাদের উপস্থিত বুদ্ধি, অবজার্ভেশন, অপরাধকে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা— সবকিছুর পরীক্ষা নিতেন। অনেক কেসই আসত যেগুলো কোনও না কোনওভাবে তিনিও জানতেন তাঁর মক্কেলই অপরাধী। সেই কেসের সব তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে কোর্টে পেশ হতে দিতেন না। তাঁর কেস জেতা হয়ে গেলে নিজেরই কোনও বিশ্বস্ত ছাত্রকে দিয়ে উচ্চ আদালতে নিম্ন আদালতের বিরুদ্ধে কেস করাতেন। উচ্চ আদালতে ওই কেস আর তিনি লড়তেন না।

ফলে তাঁরই সংগ্রহ করা তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে তাঁর কোনও ছাত্র উচ্চ আদালতে জিতে যেত। এভাবে তিনি দু-কূল রক্ষা করেছেন— একহাতে যেমন টাকা ইনকাম করেছেন, অন্য হাতে দোষীর শাস্তি সুনিশ্চিত করেছেন। আজ এতদিন পর মি. পারেখকে দেখে কুন্তলা রুদ্রর সেসব কথা মনে পড়ে গেল। দু-বছর সহকারী হিসেবে কাজ করার পর, সব ছেড়ে সংসারধর্মে মন দিতে চাইলে তখন মি. পারেখ বলেছিলেন, "কুন্তলা, ইউ হ্যাভ এ ব্রাইট ফিউচার, ডোন্ট ওয়েস্ট ইট।" কিন্তু তখন দুই মেয়েকে সামলেই উঠতে পারছেন না, তা আর ফিউচার!

মি. পারেখই মুখ খুললেন, "কী রে, কেমন আছিস বল? এতদিন পর? বাড়ির সব ভালো তো? তোর কন্যাদ্বয় কী করছে এখন?"

কুন্তলা এতদিন পর মি. পারেখকে দেখে কী বলবেন, বুঝে উঠতে পারছিলেন না, "হ্যাঁ স্যার। ওই আর কী, ভালো আছি। এক মেয়ে এখন লালবাজার ক্রাইম ডিপার্টমেন্টের ইনস্পেকটর আর ছোটটা আগের মাসেই দিল্লিতে চাকরি পেল।"

কুন্তলা রুদ্র ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে আবার শুরু করলেন, "আপনার বই পড়ার অভ্যাসটা এখনও আছে দেখছি। ঘরটা পরিবর্তন হয়নি, শুধু বইয়ের সংখ্যাগুলো অনেক বেড়ে গেছে।"

"ওই আর কী! বয়স তো হচ্ছে। অবসরের জন্য কিছু তো চাই। এই আর কী। তারপর তুই বল, হঠাৎ এতদিন পর?"

"না মানে, আপনার সঙ্গেই দেখা করতে..."

মি. পারেখ এবার তাঁর ইজিচেয়ারের উপর আয়েশ করে বসলেন, "সে ভালো কথা। কিন্তু ভুলে যাস না, তুই আমার কাছে দুই বছর কাজ করেছিস। আর আমিও ক্রিমিনাল ল-ইয়ার ছিলাম। তাই তোর হাতে-পায়ের অস্থিরতা অন্য কথাই বলছে। যা-ই হোক সময় নে। আমারও হাতে আজকাল অঢেল সময়। ততক্ষণ আমি একটা চা বলি।"

মি. পারেখ হেঁকে চা বলার পর কুন্তলা রুদ্র এদিক-ওদিক তাকিয়ে, হাতের মধ্যে হাত ঘষে বলতে শুরু করলেন, "আসলে স্যার, আমার ভাশুর জেলে। একটি লোকের হত্যার কেসে। কিন্তু বিশ্বাস করুন স্যার, সব মিথ্যা। উনি সারাদিন বাড়িতেই ছিলেন।"

boierpathshala.blogspot.com

পারেখবাবু টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়লেন, "কিন্তু আমি যে কেস নিই না রে। বেশিক্ষণ দাঁড়াতেই পারি না আর হাঁটুর ব্যথার জন্য। তা আর কেস লড়া!"

কুন্তলা রুদ্র আমতা আমতা করে বললেন, "না মানে স্যার, বলছিলাম... মানে আমার বড় মেয়ে চায়, ভাশুরও চান। মানে আর কী কেসটা আমি লড়ি।"

মি. পারেখ এবার মৃদু হেসে উঠলেন, "বাঃ এ তো বেশ ভালো কথা! তা আমি কী করতে পারি বল?"

"মানে স্যার, আপনি তো আমায় দু-বছর দেখেছেন। আমি আপনার থেকে সৎ একটা মতামত জানতে চাই। আমি কি আদৌ পারব?"

"তুই যদি না পারিস, তাহলে জেনে রাখ, আর খুব কম লোকই আছে কলকাতা শহরে। তোর ভাশুরের কেসটার বিস্তারিত আমি জানি না, তবে পেপারে পড়েছি। লেগে পড়।"

"স্যার আপনি যদি একটু গাইড করে দেন ব্যাপারগুলোতে?"

"কোনও চিন্তা নেই। তা-ই হবে। তবে আমি বলব একটু ভালো করে নিজে স্টাডি কর— সাক্ষ্যপ্রমাণ যা পাওয়া গেছে— শুধু সেটুকু না, বরং যেখানে যেখানে মনে হচ্ছে নিজে গিয়ে খোঁজখবর কর। মনে রাখিস, যেকোনও কেসে হোমওয়ার্কটা ভীষণ জরুরি। তোর কাছে যত বেশি তথ্য, তুই তত এগিয়ে থাকবি। ছোট থেকে ছোট জিনিসও মিস করিস না।"

এর মধ্যেই ঘরে চা নিয়ে আসে একটি বছর পঁচিশের মহিলা, সঙ্গে দুটো মিষ্টি আর একটা কাপ কেক। পারেখবাবু অমায়িক হেসে প্লেটটা কুন্তলা রুদ্রর দিকে এগিয়ে দিলেন। প্লেটটা নিয়ে কুন্তলা রুদ্র বললেন, "তা স্যার, আপনাদের ছেলেদের কী খবর?"

হঠাৎ করেই মি. পারেখের মুখটা কেমন যেন থমথমে হয়ে গেল। চায়ের কাপটা টেবিলে রেখে মৃদুকণ্ঠে বললেন, "বাড়ির খবর খুব একটা ভালো না, বুঝলি।"

"কেন?"

মি. পারেখ একবার ভিতরের দরজার দিকে দেখে শুরু করলেন, "কী বলি বলত। এই যে চা দিয়ে গেল, সেটা আমার ছোট বৌমা। ছোটবউমার এই তিন দিন আগেই মিসক্যারেজ করে গেল!"

boierpathshala.blogspot.com

"সত্যি আনফরচুনেট!"

"সে আর বলতে। এই নিয়ে তিনবার এরকম হলো গত দু-বছরে।"

"তিনবার?" কুন্তলা রুদ্রকে একটু চিন্তিত দেখাল।

"হ্যাঁ রে। দেখ না, বড়ছেলের বিয়ে হয়েছে সাত বছর হতে গেল। অনেক চেষ্টা করেও কিছু হল না। তারপর তো জানা গেল, ওর কী সমস্যা আছে। ছোটছেলের তিন বছর হল বিয়ে হয়েছে, তার মধ্যে এই ব্যাপার! বাড়ির উপর যেন একটা শনির দশা!"

"আপনার বাড়ির লোকেদের সঙ্গে একটু কথা বলা যায়?"

"কেন?"

"আমার ভাশুর বলেন, একবার হলে দুর্ঘটনা, দ-ুবার হলে সমাপতন আর তিনবার হলে শত্রুর চক্রান্ত। কোনও একটা সিনেমার ডায়ালোগ! কিন্তু ভীষণ যুক্তিপূর্ণ।" মি. পারেখ একটু টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়েন, "তোর কী মনে হচ্ছে ব্যাপারটা... মানে সিরিয়াসলি?"

"না স্যার। আমি বলছি না যে আমি ঠিক। শুধু ব্যাপারটা একটু বাজিয়ে দেখতে চাই।"

আর কোনও কথা না বলে মি. পারেখ ভিতরে নিয়ে গিয়ে সবার সঙ্গে কুন্তলা রুদ্রর পরিচয় করিয়ে দেন। ভিতরে যদিও নিজের পুরোনো ছাত্রী বলেই পরিচয় করিয়ে দেন। মি. পারেখের বড়ছেলে একটি কলেজের ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট, ছোটছেলে একটি মিডিয়া হাউসের প্রোডাকশন ম্যানেজার, বড়বউমা গৃহবধূ আর ছোটবউমা বাংলা সিনেমার ছোটখাটো চরিত্রে অভিনয় করেন। এঁদের সবারই বয়স পঁচিশ থেকে বত্রিশের মধ্যে। বড়বউমা অনীতাকে কুন্তলা রুদ্র জিজ্ঞাসা করলেন, "স্যারের কাছে শুনছিলাম, আপনাদের বাড়ির কথা। খুবই বড় দুর্ঘটনা।"

অনীতা যেন কেমন একটু থ মেরে গেল, তারপর ধীরে ধীরে বলল, "কী বলব বলুন তো। ভগবান যে কেন এত নিষ্ঠুর! বাবার একটা নাতিপুতির খুব শখ। তা আমি তো আর সে শখ পূরণ করতে পারলাম না।" অনীতা থমথমে মুখে মাথা নামিয়ে নিল।

boierpathshala.blogspot.com

কুন্তলা রুদ্র অনীতার স্বরূপ বোঝার জন্য বললেন, "আপনার রাগ হয় না? আপনি কখনো মা হতে পারবেন না আর ছোটজন তিন তিনবার..."

অনীতার চোখটা যেন দপ করে জ্বলে উঠেই নিভে গেল, "কী বলছেন আপনি! বাড়িতে একটা বাচ্চার জন্য বাবা আঁকুপাকু করছে আর আপনার এসব মনে হচ্ছে? আপনি কী মনে করেন, ছোটর বাচ্চা না-হওয়াতে আমি খুব খুশি হচ্ছি? আমি মা হতে পারব না জেনে খুব দুঃখ হয়, নিজের উপর রাগ হয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি ছোটকে হিংসা করি। ওর কোল আলো হলে আমার তো কিছুটা হলেও ভালো লাগবে।

"কিন্তু ভাগের মা কি গঙ্গা পায়?"

"দেখুন। আপনি আপনার সীমা ছাড়াচ্ছেন। আপনার এসব ফালতু কথায় সত্যি পালটাবে না। আমি নিজে এবার উপোস করে ছোটর জন্য বড়ঠাকুরের মন্দিরে পুজা দিয়েছি।" ড্রেসিং টেবিলের একটা তালা-দেওয়া ড্রয়ার খুলে একটা ছোট্ট বাক্স বের করে আনলেন। যেন কোথাও হারিয়ে গেলেন, "সোনার হারটা বানিয়েছিলাম যে আসছে তার জন্য। বাড়ির কেউই জানে না। ভেবেছিলাম, হসপিটালে যখন প্রথম দেখব তখন দেব। দু-বছর ধরে এখানেই পড়ে। জানি না আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে।" মাথা নেড়ে আবার বাক্সটা ভিতরে রেখে কুন্তলা রুদ্রর দিকে ফিরে বললেন, "দেখুন, আপনার না জেনে কোনও কিছু এভাবে বলাটা উচিত না। আমার কথায় খারাপ লেগে থাকলে সরি।"

"আপনার স্বামী?"

"উনি তো এখনও ফেরেননি।" অনীতা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "সন্ধে সাতটা বাজে। হয়তো আর আধ ঘণ্টা।"

এবার কুন্তলা রুদ্র মি. পারেখের ছোটবউমা প্রমীলার সঙ্গে দেখা করে এ কথা-সে কথার পর জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার শরীর এখন কেমন যাচ্ছে?"

"শরীর আছে মোটামুটি। লোয়ার অ্যাবডোমেইনে ব্যথা আছে এখনও।"

"আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। ডাক্তার কী বলছে? বার বার এরকম হওয়ার কারণ?"

"জানি না। ভালোমতোই তো খাওয়া-দাওয়া করলাম। ভিটামিনের ট্যাবলেট,

boierpathshala.blogspot.com

আয়রন ট্যাবলেট সব নিলাম। তা-ও যে কেন?”

“অন্য কোনও ডাক্তারের সঙ্গে আর কথা বলেননি?”

“আগে যিনি দেখছিলেন, ডা. মানালি কুণ্ডু তিনি নিজেই এবার অন্য একজনকে রেফার করেছিলেন। তা-ও যে কেন... কী জানি!” প্রমীলা মাথা নামিয়ে নিল।

মুড ঠিক করার জন্য কুন্তলা রুদ্র বললেন, “ইদানীং তো বেশ কয়েকটা সিরিয়ালে আপনাকে দেখছি।” প্রমীলার মুখে হালকা হাসির রেখা দেখা গেল, “হ্যাঁ, ওই আর কী। প্রথমদিকে তো খুব একটা ভালো রোল পাইনি। ইদানীং কয়েকটা সিরিয়ালের গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্বচরিত্রের কাজ পেয়েছি। একটা সিনেমায় সাইন করেছি আগের বছর ডিসেম্বরে। এই আগস্ট থেকে শুটিং শুরু হবার কথা।”

“বাঃ তাহলে তো বেশ গুড নিউজ।” কুন্তলা রুদ্র এবার মিঃ পারেখের ছোট ছেলে অভিরাজের দিকে ফিরে বললেন, “আপনি তাহলে খুশি?”

অভিরাজ বললেন, “সে খুশি তবে বাচ্চাটা হলে ভালো লাগত! তিন তিনবার কী যে হচ্ছে!”

প্রমীলা স্বামীর মুড ঠিক করার জন্য বললেন, “ছাড়ো তো। হয়ে যাবে। কোনও মেডিক্যাল সমস্যা হচ্ছে। এবার তো শহরের নামী শিশু বিশেষজ্ঞ ড. মীনাক্ষী দেখছেনই। পরের বার নিশ্চিত ঠিক হয়ে যাবে।”

কুন্তলা রুদ্র অভিরাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তা আপনাদের কি লাভ ম্যারেজ?”

অভিরাজ একটু লাজুক হেসে বলল, “হ্যাঁ। ওর একটা শ্যুটিংয়ের ফ্লোর ম্যানেজার ছিলাম আমি। সেখান থেকেই পরিচয়। তারপর আমি বাইকে করে ড্রপ করতাম... তারপর বাবা একদিন দেখতে পেয়ে বিয়ে দিয়ে দিল।”

“আর আপনার মা?”

প্রমীলাই উত্তরটা দিল, “উনি খুব একটা খুশি ছিলেন না। এখনও নয়। আসলে ওঁর বিশ্বাস, যারা সিনেমা-যাত্রায় অভিনয় করে, তাদের চরিত্রের ঠিক থাকে না!”

“তার মানে তোমরা বিয়ের জন্য ঠিক রেডি ছিলে না?”

অভিরাজ বলল, "কিছুটা তো বটেই। আমি তখন পার ডে হিসেবে টাকা পাই। স্টুডিয়োপাড়ায় যে পরিচালক পাই, তাকেই ধরে তার ফ্লোর ম্যানেজারের কাজ শিখছি। এই মিডিয়া হাউসটায় সাত মাস হল কাজ পেয়েছি। খুব বেশি পাই না, তবে আর কাজ খোঁজার মাথাব্যথাটা নেই।"

প্রমীলাও যোগ করল, "আর বাকি আমার মোটামুটি যা হচ্ছে তাতে দু-জনের হয়েও বাড়িতে কিছু দিতে পারছি।"

কুন্তলা রুদ্র মিসেস পারেখের সঙ্গে কথা বলতে গেলেন, "আন্টি, আপনি বাড়ি থেকে প্রায় কত বছর বের হন না?"

মিসেস পারেখ ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, "সে তো অনেক বছর হতে চলল। প্রায় বছর চার-পাঁচ তো আর বাইরে বেরই হইনি। ওই ছাদে যাই, ফুলের টবগুলোতে জল দিই, এই আর কী।"

"আপনি তো ছোটবউমা ও ছেলের বিয়েতে খুব একটা খুশি না। তা-ই তো?"

মিসেস পারেখের চোয়াল শক্ত হল, "খুশি হওয়া বা না-হওয়ার তো কিছু নেই। ওদের মনে হয়েছে, বিয়ে করেছে। মা হিসেবে বলা উচিত ছিল, বলেছি। শোনেনি। এখন তার ফল ভোগ করছে। না হলে, এরকম অলক্ষণ কেউ কখনো শুনেছে? তিন তিনবার? আমার কী? এমনিতেই তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। তোমার স্যারের ইচ্ছে ছিল নাতি-পুতির মুখ দেখবে, সেটা যে হবে না, ভালোই বুঝছি!"

"আপনি তো বাড়িতেই থাকেন। দুপুরে আপনি, স্যার আর আপনার বড়বউমা বাড়িতে থাকে বুঝি?"

"বড়বউমা তো থাকে না। বড়বউমা দুপুর ১২টার পর পাশের স্কুলে সেলাই শেখাতে যায়। কর্তা খেয়েদেয়ে একটু ঘুমোন।"

"আর আপনি?"

"আমার দুপুরে ঘুম আসে না। আমি টিভি দেখি, সেলাই করি। আর দুপুরে ওই পার্সেল–টার্সেল এলে রিসিভ করি।"

"পার্সেল?"

মিসেস পারেখ ঠোঁট উলটে জবাব দিলেন, "ওই যে, ছেলে-বউমারা সব

boierpathshala.blogspot.com

ফোন থেকে অর্ডার দেয় যে। কীসব ফ্লপ, খাট আছে ওতে।"

কুন্তলা রুদ্র মুচকি হেসে বললেন, "ফ্লিপকার্ট। আর কিছু আসে?'

এবার মিসের পারেখের মুখে একটা চওড়া হাসি দেখ গেল, "হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাই। আসলে বয়স হচ্ছে তো... আর তো তেমন কিছু বলতে চিঠি আসে।"

"কার কার?"

"বড়ছেলের আসে। ওই ব্যাঙ্কের লোনের চিঠি আর ফোনের বিল, ছোটছেলের সিনেমার পত্রিকা আসে, আর ছোটবউমার মাঝে মাঝে আসে। আমাদের আর কারও কিছু আসে না।"

কুন্তলা রুদ্র ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ছোটবউমার জন্য আলাদা সিনেমার পত্রিকা আসে?"

এবার মিসেস পারেখ জোরে মাথা ঝাঁকালেন, "না, না, পত্রিকা নয়। ওর যে কী আসে, জানি না। মাঝে মাঝে আসে।"

"শেষ কবে এসেছিল? কুরিয়ার?"

"এই তো গত সপ্তাহে, না, ইন্ডিয়ান পোস্ট।"

এর মধ্যেই অভিরাজবাবুর দাদা অভিজয়বাবু ফিরে এসেছেন। কুন্তলা রুদ্র একবার অভিজয়বাবুর সঙ্গেও কথা বললেন, "আপনার কাজ ঠিক কি ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে?"

"কেন বলুন তো? অনীতার কাছে শুনলাম, আপনি নাকি ভাইয়ের বাচ্চা মিসক্যারেজ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমাদের সন্দেহ করছেন? কী খুঁজতে চাইছেন? উকিলরা মোটেই সুবিধার নয়, সে নিজের বাবাকে দেখেই বুঝেছি। আপনারা রাতকে দিন করে দিতে পারেন।"

কুন্তলা রুদ্র মৃদু হেসে বললেন, "আমি এত দূর যাইনি। শুধু আপনার ল্যাবের কাজটা কীরকম জানতে চাইছিলাম।"

অভিজয়বাবু আরও ব্যাজার মুখে বললেন, "কেন, আপনি কি ল্যাবে কাজ করতে আসবেন?"

"যেতেও তো পারি। উকিলদের কি নতুন কিছু শেখার আগ্রহ থাকতে নেই?"

"আমি বিজয়গড় কলেজের বায়ো ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট। ল্যাবের ছেলে-মেয়েদের

boierpathshala.blogspot.com

জন্য অ্যাগার প্লেট রেডি করে দেওয়া, ব্যাকটেরিয়া কালচার করাতে হেল্প করা আর জিনিসপত্র স্টেরিলাইজ করা— এসবই করি। যাতে কোনও ইনফেকশন না হয়... আর কিছু?"

কুন্তলা রুদ্র আর কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার আগে মি. পারেখ জিজ্ঞাসা করলেন, "কিছু বুঝলি?"

"কথা বলে তো এখনও পর্যন্ত মনে হল প্রমীলারই শারীরিক অক্ষমতার জন্য মিসক্যারেজটা হয়েছে। তা-ও তিন তিনবার বলেই কিছুতে মনটা মানছে না। একবার আরও কতকগুলো জিনিস দেখার দরকার। আজ আসি। আর কেসের ব্যাপারে আমি আবার আসব কিন্তু স্যার।"

"একদম। তোরা এতদিন পর মাঝে সাঝে এলে খুশিই হই।"

* * * * * * *

'কুন্তলা রুদ্র,' একটি হসপিটালের পরিচারিকা কেবিনের বাইরে এসে এদিক-ওদিক দেখতে থাকলেন। কুন্তলা রুদ্র উঠে দাঁড়াতেই সে বলল, "এবার আপনি।"

কুন্তলা রুদ্র ধীরপায়ে ডা. মীনাক্ষীর কেবিনটায় ঢুকলেন, সঙ্গে শিবানী। বয়সের হিসেবে দেখতে গেলে, ডা. মীনাক্ষী কুন্তলা রুদ্রর প্রায় সমবয়সীই বলা যায়। কুন্তলা রুদ্র চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, "দেখুন, আমি ঠিক আপনার রুগি না। আসলে আমার আপনার থেকে কতকগুলো জিনিস জানার ছিল।" ডা. মীনাক্ষীর চোখটা কুঁচকে গেল। কুন্তলা রুদ্র থামলেন না, "আপনারই এক পেশেন্ট প্রমীলা পারেখের ব্যাপারে একটু জানার ছিল।"

ডা. মীনাক্ষী হাত তুলে থামার ইশারা করলেন, "আর আপনি কী করে ভাবলেন, আমি একজন রুগির ইনফর্মেশন এভাবে দিয়ে দেব? ডাক্তারদের কি এথিক্স থাকে না?"

"আপনি ভুল বুঝছেন। আসলে তিন তিনবার এমন একটা ঘটনা তাই একটু জানতে চাই। আমি প্রমীলাদের পুরোনো পারিবারিক বন্ধু।"

"যা ঘটেছে তা অভিপ্রেত না। তার মানে এটাও না, যে-কেউ এসে গল্প

boierpathshala.blogspot.com

শোনালেই আমাকে তার সঙ্গে সব ডিসকাস করতে হবে। আর আপনি কি ডাক্তার?"

এবার শিবানী নিজের আই-কার্ডটা টেবিলের উপর রেখে ডা. মীনাক্ষীর দিকে এগিয়ে দেয়, "আজ্ঞে না, আমি পুলিশ আর উনি উকিল। প্রমীলার শ্বশুরমশাই এক সময়ের নামকরা উকিল ছিলেন। তিনি মনে করছেন আপনাদেরই গাফিলতি— তা না হলে আর তিন তিনবার! উনি আপনাদের হসপিটালের বিরুদ্ধে একটা কেস করার জন্যই এই উকিলকে নিযুক্ত করেছেন। আমি শুধু ওঁকে নিয়ে একবার কথা বলতে এলাম সত্যিটা জানতে। যদি প্রথম থেকেই এরকম অসহযোগিতার মনোভাব হয়, তাহলে কোর্টে যাওয়া ছাড়া তো আর কোনও উপায় থাকে না। আমি চাইছিলাম, ব্যাপারটা যদি ওঁদের মনের ভুল হয়, তাহলে কোর্টের বাইরে মেটানো যায় কি না। আপনিও জানেন, শেষ পর্যন্ত কেস আপনারা জিতুন আর হারুন, হসপিটালের নাম একবার গেলে ক্ষতি আপনাদেরই। এবার ভাবুন।"

ডা. মীনাক্ষী ঠিক বিশ্বাস করতে পারেন না। আই-কার্ডটা হাতে নিয়ে ভালো করে দেখেন, "অলরাইট। বাট এখন আমি যা বলছি, সবই আনঅফিশিয়াল। আপনারা কেস যদি করেন, তারপরে আমার স্টেটমেন্ট রেকর্ড করতে পারেন। এখন যা বলছি, এই কথাগুলো আমাদের মধ্যে হয়নি কোনওদিনই।"

ল্যাপটপে ঝটাঝট প্রমীলার কেস রেকর্ডটা খুললেন, "দেখুন, গর্ভস্থ ভ্রূণের মৃত্যু অনেক কারণেই হতে পারে। যেমন— জেনেটিক ডিসঅর্ডার, আয়রন বা মিনারেল কম হওয়া, বা কোনও ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়া। আগে কেসটা আমারই এক ছাত্রীর কাছে ছিল। প্রথম মিসক্যারেজের পর, দ্বিতীয়বার সব ভিটামিন, ভ্যাকসিনের খেয়াল নিজে রেখেছিল। নিজেই ফোন করে মনে করিয়ে দিত। ও এসব ব্যাপারে খুবই দায়িত্বশীল। কিন্তু দ্বিতীয় মিসক্যারেজটা হল। এবার ও ভ্রূণটা ল্যাবে পাঠিয়ে টেস্ট করে। কারণটা খুব সাধারণ— গর্ভবতী অবস্থায় সতেজ খাবার খাওয়া উচিত। কিন্তু প্রমীলা পারেখই কী খেয়েছিলেন বলতে পারেননি। ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে বাচ্চা মারা যায়। এবারে আমার ছাত্রীটি আর ঝুঁকি না নিয়ে আমার কাছে রেফার করে। আমি এবার সবই

boierpathshala.blogspot.com

খেয়াল রাখছিলাম। কোনও বাসি খাবার, তেলেভাজা খেতে বারণ করে দিই। কিন্তু এবারও মিসক্যারেজটা হল। আর সেই একই কারণ— LISTERIA।"

কুন্তলা রুদ্র চিন্তিতভাবে মুখ খুললেন, "বার বার? একটু সন্দেহজনক নয় কি?"

ডা. মীনাক্ষী চশমাটা খুলে টেবিলে রাখলেন, "কিছুটা তো বটেই। কিন্তু কীভাবে, সেটাই তো বুঝছি না। আমার ইন্টিউশন বলছে, প্রথমবারও হয়তো একই কারণ ছিল।"

শিবানী জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, এই ব্যাকটেরিয়াতে মায়ের ক্ষতি হয় না?"

ডা. মীনাক্ষী একটু ঠোঁট চেপে হাসলেন, "ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন। গর্ভপাত করানোর জন্য অনেকরকম টক্সিক গাছের ব্যবহার হত প্রাচীনকালে। এদের সমস্যা হল, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গর্ভস্থ ভ্রূণের সঙ্গে মায়েরও মৃত্যু হতে পারে। LISTERIA কতটা বিষাক্ত হবে তা নির্ভর করে হোস্টের উপর– মানে কীসের উপর জন্মাচ্ছে তার উপর। এখন এই ব্যাকটেরিয়া বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পূর্ণবয়স্কদের খুব একটা ক্ষতি করতে পারে না— জ্বর, ডায়েরিয়া, বমি– মোটামুটি এর বেশি কিছু হয় না। যদি পূর্ণবয়স্ক কেউ মারা যায়, সেটা সরাসরি LISTERIA-এর প্রভাব বলা যায় না, ডিহাইড্রেশনের জন্য হতে পারে। কিন্তু LISTERIA গর্ভস্থ ভ্রূণ বা একদম ছোট বাচ্চাদের জন্য প্রাণঘাতী।"

কুন্তলা রুদ্র বললেন, "আপনি বলতে চাইছেন, কেউ জেনেশুনে দিচ্ছে?"

"আমি কী করে বলব বলুন। তদন্ত করা তো পুলিশের কাজ। আমি সত্যিটাই বলতে পারি— হসপিটাল কোনওভাবে জড়িত না। আমারাই বরং কেসটা নিয়ে একটু বিচলিত।"

শিবানী গলাখাঁখারি দিয়ে টেবিলের উপর সোজা হয়ে বসে, "কিছু মনে করবেন না। এটা রিপোর্টের কোথাও থাকবে না। কিন্তু প্লিজ সত্যি বলবেন। আপনারা কি গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করেন?"

এবার ডা. মীনাক্ষী একটু রেগে গেলেন, "দেখুন, এটা আমার রোগী দেখার টাইম। অযথা আপনারা সময় নষ্ট করছেন। আপনারা এখন আসতে পারেন। আমরা একটা রেপুটেড হসপিটাল। এসব বেআইনি কাজ আমাদের এখানে হয় না।" হাত জোড় করে নমস্কার করে ডা. মীনাক্ষী বেশ কড়াভাবেই বলেন,

boierpathshala.blogspot.com

"আউট!" কুন্তলা রুদ্র আর শিবানী উঠে দরজা ঠেলে বাইরে যাওয়ার মুখেই পিছন থেকে ডা. মীনাক্ষী বলে ওঠেন, "তবে আপনার মনের শান্তির জন্য বলে রাখি, পুলিশ ম্যাডাম। আপনি যা ভাবছেন, সেটা না-হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ, প্রমীলার দ্বিতীয় সন্তান ছেলেই ছিল। বাকি দুটো মেয়ে। আসুন এবার।"

* * * * * * * *

পরের দিন কুন্তলা রুদ্র শিবানীকে কলেজ পাঠালেন অভিজয়বাবুর ব্যাপারে কতকগুলো খবর নিতে আর নিজে গেলেন টালিগঞ্জের স্টুডিয়ো পাড়ায়— অভিরাজের ব্যাপারে খবর নিতে। আরও কিছু খোঁজখবর করে বিকালে এলেন মিঃ পারেখের বাড়িতে, "স্যার, একবার যদি সব ক-টা দেখে নেন?"

মি. পারেখ যথারীতি তাঁর পড়ার ঘরের চেয়ারে বসে মুখে একটা চুরুট কামড়ে ধরে ফাইলটা দেখা শুরু করলেন, "তোর কাছে ফাইলে সব আছে কিন্তু একটা জিনিস ভুল করেছিস। কোর্টে কবে উঠছেন তোর ভাশুর?"

কুন্তলা রুদ্র একটু অবাক চোখে টেবিলের দিকে ঝুঁকে পড়লেন, "কী স্যার? পরের সপ্তাহে ফার্স্ট ডেট।"

মি. পারেখ টেবিলের উপর ফাইলটা রেখে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, "তোর মতো একজন ব্রাইট স্টুডেন্টের থেকে এটা এক্সপেক্টেড ছিল না। অনেক দিনের অনভ্যাস হয়তো। তোর ফাইলে সাক্ষীর অভাব নেই এটা প্রমাণ করার যে তোর ভাশুর হয়তো সেদিন ওখানে ছিলেন না। কিন্তু প্রমাণ? সেটা নেই যে। বেসিকটা আরও একবার মনে করিয়ে দিই তোকে–'Evidence can be either direct or circumstantial. A direct evidence is subjective by nature whereas a circumstantial evidence is more objective and is subject to the laws of probability.' মানে?"

কুন্তলা রুদ্র মাথা নিচু করে শুরু করেন, "Direct Evidence একটা ঘটনাকে পুনর্গঠনে সাহায্য করে, যেমন– আই উইটনেস, অপরাধীর কনফেশন।"

"আর আইনের চোখে এই এভিডেন্স সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কারণে বদলে যেতে পারে। আই উইটনেস বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রলোভন বা ভয়ে

boierpathshala.blogspot.com

হোস্টাইল হয়ে যায়। তাই এগুলোর দাম কিন্তু আইনের চোখে কমই, যতক্ষণ না Circumstantial Evidence সাবমিট করতে পারছ। মনে রেখো, সরকারপক্ষের কাছে কিন্তু DNA-ফিঙ্গারপ্রিন্টের মতো বড়সড়ো Circumstantial Evidence আছে। তার সামনে তোর পরিবারে বা পরিবার ঘনিষ্ঠ চার-পাঁচজন সাক্ষী। ধোপে টিকবে না। সরকারপক্ষের উকিল প্রথম দিনই তোর সাক্ষীদের বায়াস্‌ড সাক্ষীর লিস্টে ফেলে ওদের বক্তব্যকে ভয়েড প্রুফ করতে বেশি সময় নেবে না!"

কুন্তলা রুদ্রর মুখে চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে, "তাহলে?"

মিঃ পারেখ একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "প্রত্যেক খেলার একটা নিয়ম থাকে। 'আর্ট অফ ওয়ার' বইটা পড়েছিস?" কুন্তলা রুদ্র নিঃশব্দে মাথা নাড়েন। মি. পারেখ আবার শুরু করেন, "যখন তোমার প্রতিপক্ষ তোমার থেকে বেশি শক্তিশালী হয়, তার সঙ্গে হয় সখ্য করো আর যদি লড়তেই হয় তাহলে নিজের দুর্গ আগে বাঁচাও। প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতে দাও— তোমার কাজ শুধু প্রতিহত করে যাওয়া। তারপর যখন তার রিসোর্স তলানিতে, যখন তার সমস্ত সৈন্য যুদ্ধের ক্লান্তিতে ধুঁকছে– ঠিক তখনই আক্রমণ করো। কী বুঝলি?"

কুন্তলা রুদ্র একটু চিন্তিত মুখে বলল, "তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, আমি যেন প্রথম ডেটে আমার একটাও সাক্ষীকে বক্সে না ডাকি, বরং সরকারপক্ষের সাক্ষীদের ক্রস একজামিন করে কনফিউজ করে দিই?"

"Exactly. তোর কালকের কাজ হল আগে সরকারি পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য ভালো করে শোনা। লুপহোল খুঁজে বের করা। বার বার প্রশ্ন করে তাদের কনফিউজ করে দেওয়া। ভুলে যাস না, তোর এই কেসের মূল অস্ত্র হল সময়। মানুষের স্মৃতি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিকে হতে থাকে। তাই যত লম্বা টানতে পারবি, তত সাক্ষীদের কনফিউজ করা সহজ হবে। আর ততদিনে পারলে স্ট্রং কোনও Circumstantial Evidence জোগাড় কর। না হলে, এ কেস বেশি দিন টেনে রাখতে পারবি না।"

"ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ডি.এন.এ. সব তো ওদের কাছে। সেগুলো কী করে যে মিথ্যে প্রমাণ করব বুঝতে পারছি না।"

boierpathshala.blogspot.com

"কে বলল তোকে মিথ্যে প্রমাণ করতে? তোকে শুধু প্রমাণ করতে হবে ওগুলো প্লান্টেড। দ্যাট'স ইট।"

"তাহলে আমি কী Circumstantial Evidence দেব, বুঝতেই তো পারছি না!"

মি. পারেখ একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "কেন, মোবাইল লোকেশন? সেদিন উনি যেখানে যেখানে গিয়েছিলেন, কোথাও যদি সিসিটিভি থাকে, তার ফুটেজ জোগাড় কর। আপাতত কালকের জন্য এটুকুই। তারপর কালকে কী হচ্ছে দেখা যাক।"

কুন্তলা রুদ্র তাড়াতাড়ি কাগজপত্র আর ফাইল গুছিয়ে নিল। মি. পারেখ বললেন, "তা তুই একা যাবি নাকি মেয়ে আসবে নিতে?"

কুন্তলা রুদ্র একটু হেসে বললেন, "মেয়ে আসবে," হাতের ঘড়ির দিকে একবার দেখে বললেন, "এখনও ঘণ্টাখানেক সময় আছে। তার মধ্যে আপনার সমস্যাটার একটা সমাধান করি।"

মি. পারেখ একটু অবাক হয়ে বললেন, "কোনটা?"

"আপনার পুত্রবধূর মিসক্যারেজের ব্যাপারটা। আজ তো রবিবার। সবাইকে ডাকুন। দেখা যাক।"

মি. পারেখ চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন, "তাহলে বলছিস স্বাভাবিক না?"

"একেবারেই না স্যার! একবার সবার সঙ্গে কথা বলা যাক। দেখি কোনও সমাধানে পৌঁছোনো যায় কি না।"

মি. পারেখ পড়ার ঘরে সবাইকে ডেকে পাঠালেন। সবাই এসে এক-এক করে ঘরে দু-পাশের দুটো সোফায় বসে পড়ল। সবাই এই সময় ঠিক কী ভাবছে জানা নেই, তবে কুন্তলা রুদ্র মনের মধ্যে এটাকেই একটা কোর্টরুম ভেবে নিয়েছেন। মি. পারেখ তাঁর জজ-সাব আর অপরাধী? না, না, না। যতক্ষণ অপরাধ প্রমাণ না হচ্ছে, 'অপরাধী' শব্দটা ব্যবহার করাই যাবে না— এখন তো শুধুমাত্র 'Accused'! যুক্তির বেড়াজালে জজসাহেবের সামনে Accused-কে বিন্দুমাত্র সুযোগ দেওয়া চলবে না, তবেই একটা সময় পর সে মুখ থুবড়ে পড়বেই। শুধু দরকার একটু ধৈর্য আর স্থিতধী হওয়া।

boierpathshala.blogspot.com

"অভিজয়বাবু, আপনার লোনের তো তিনটে কিস্তি এখনও বাকি?"

অভিজয়বাবু চোখ দুটো জ্বলে উঠতে গিয়েও যেন থমকে গেল, "হ্যাঁ। তাতে কী আসে যায়? আপাতত ঠিক চলছে না। কিছুদিনের মধ্যেই দিয়ে দেব। কলেজে কিছু সমস্যার জন্য আমাদের মতো পার্টটাইমারদের মাইনে দু-মাস ধরে হচ্ছে না বলে সমস্যা হচ্ছে। দিয়ে আমি দেব ঠিকই।"

"বলছি, Listeria-টা কলেজের ল্যাবেই বানিয়েছিলেন?"

অভিজয়বাবু রেগে দাঁড়িয়ে ওঠেন, "কী আজেবাজে বকছেন? হঠাৎ আমি ল্যাবে Listeria কালচার করতে যাবই বা কেন? কোনও স্যার বললে তারপরই আমি বানাই। তা ছাড়া জিনিসপত্রের চাবি স্যারেদের কাছেই থাকে। তাদের ছাড়া আমার কিছু করার নেই।"

"কলেজের অনেক প্রফেসরই কিন্তু বলেছেন, আপনার মতো দক্ষ ল্যাব টেকনিশিয়ান পাওয়া যায় না। পি.এইচ.ডি.-র স্টুডেন্টদেরও নাকি আপনি ভালো ভালো সাজেশন দেন।"

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে অভিজয়বাবু জবাব দেন, "কম দিন ল্যাবে কাজ করছি না। সময় পেলে লাইব্রেরির বইগুলো পড়ি। তাই আমার যেরকমভাবে মনে হয় হেল্প করার চেষ্টা করি। ক-দিন আগেই তো হারাধন স্যারকেও ওঁর পেপারে হেল্প করেছি। উনি খুব খুশি হয়েছিলেন। আমি যখন যেমন পারি, হেল্প করার চেষ্টা করি।"

"হারাধন স্যার? মানে হারাধন জনার্দন রায়। আপনাদের রিটায়ার্ড গেস্ট লেকচারার?"

"হ্যাঁ।"

"তাঁর বয়ানটাই তাহলে বলি। উনি এটাও বলেছেন, আপনি অনেক রাত পর্যন্ত ল্যাবে কাজ করেন। সবাই চলে যাওয়ার পরও। সেটা কেন?"

অভিজয়বাবু আরও রেগে গেলেন, "আপনি ফালতু কথা বলছেন। আমি ল্যাবে কাজ করতে পারব না? আমার ভালো লাগে তাই করি। আর তা ছাড়া Listeria-র সঙ্গে বা আমার ল্যাবের সঙ্গে প্রমীলার বাচ্চা মারা যাওয়ার কী সম্পর্ক তা তো আমি বুঝছি না!"

boierpathshala.blogspot.com

কুন্তলা রুদ্র এবার এগিয়ে এলেন, "Listeria খাবারে কন্টামিনেটেড হলে কী হতে পারে?"

"কী আর হবে! পেট খারাপ, বমি-বমি, ডায়েরিয়া। এর বেশি কিছু হবে বলে তো মনে হয় না। আর তা ছাড়া ল্যাবে আমরা কাজ করি ম্যাডাম কারও ক্ষতি করতে যাই না। বেকার ভাট বকছেন আপনি।"

কুন্তলা রুদ্র ঠান্ডা গলায় বললেন, "যা জানার ছিল, জানা হয়ে গেছে আমার। আপনি এবার বসতে পারেন।" অভিজয়বাবু আর কোনও কথা না বলে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বসে পড়েন।

কুন্তলা রুদ্র এবার অভিরাজবাবুর দিকে ফিরে তাকান, "আপনার প্রোডাকশন হাউস তো আপনাকে চিঠি ধরিয়েছে। তিন মাসের মধ্যে চাকরি ছাড়তে হবে তো! তা নতুন কোথাও কাজ দেখছেন?"

এবার মি. পারেখ যেন একটু থতমত খেয়ে উঠলেন, "সে কী ছোটখোকা? এসব তো বলিসনি?"

অভিরাজবাবু একটু বিরক্ত হয়ে উঠলেন, "ধুস। কী বলব? আমাদের লাইনে এরকম লেগেই থাকে। এক প্রোডাকশন হাউস লস করতে থাকলে লোক ছাড়িয়ে দেয়। অন্য কোথাও দেখতে হবে। হয়ে যাবে।"

কুন্তলা রুদ্র শান্তভাবে বলে ওঠেন, "মানে, এই মুহূর্তে আপনি আরও একজনের দায়িত্ব বা খরচ কোনওটাই নিতে রাজি নন। তা-ই তো?"

"সেটা তো কিছুটা। তার মানে এই নয় যে আমি আমার সন্তানের মৃত্যুকামনা করি। আর আমার চাওয়া, না-চাওয়াতে কী বা আসে যায়? ডাক্তারই তো বাঁচাতে পারল না। এত ভালো ডাক্তার, এতগুলো টাকা... সব জলে।"

"একটা শিশুর দায়িত্ব নিতে রাজি নন। এটা সরাসরি স্ত্রী-র সঙ্গে আলোচনা করলেই পারতেন। শুধু শুধু একটা প্রাণ আসার আগেই মেরে দিলেন?"

"কী যা-তা বলছেন আপনি, মিসেস রুদ্র। আমি কী করে একটা গর্ভস্থ ভ্রূণকে মারব? আমি কোনও সাধুবাবা তো নই, যে অভিশাপ দিলেই ফলে যাবে! তা-ই না?"

শেষের কথাগুলোতে শ্লেষের তীক্ষ্ণতা কুন্তলা রুদ্রর মনোযোগকেও বিব্রত

boierpathshala.blogspot.com

করে। তবে ধৈর্য ধরে কুন্তলা রুদ্র আবার চেষ্টা চালালেন, "তাহলে আপনি কী করে মারলেন, আপনিই বলুন।"

অভিরাজ পারেখ এবার যেন বেশ কিছুটা বিরক্ত, "আচ্ছা মুশকিল! আপনি তো আচ্ছা পাগল মহিলা। মানছি, আমার এই মুহূর্তে একটা বাচ্চার দায়িত্ব নেওয়ার মতো আর্থিক ক্ষমতা ছিল না, তা বলে নিজের সন্তানকে আসার আগেই মেরে দেব? ওরা জন্মালে এ বাড়ির প্রথম সন্তান হত। আমার ভাবার দরকারও হত না। না বলতেই বাবা এমনিতেই অনেক কিছু প্ল্যান করে রেখেছিলেন। তাই খরচটা গৌণ ব্যাপার, মিসেস রুদ্র। আমি না পারলেও আমার বাবা হয়তো পারতেনই আমাদের সাহায্য করতে। আচ্ছা, ছাড়ুন এসব। আমি মারবটা কেন? কী মোটিভ আমার?"

"কেন, আপনি যে ছেলে চাইতেন, তাই..." অভিরাজবাবু রেগে দাঁড়িয়ে উঠলেন, "কী যা-তা বলছেন আপনি! আমি তো জানতামই না আগে থেকে আমাদের ছেলে হবে না মেয়ে। প্রত্যেকবারই মিসক্যারেজের পরেই জেনেছি। যদি ছেলের জন্যই মারি তাহলে দ্বিতীয়বার তো ছেলে ছিল, তাকে আমি কেন মারলাম? আপনার বিশ্লেষণটা একটু শুনি!"

কুন্তলা রুদ্র বললেন, "আমার যা জানার ছিল, জানা হয়ে গেছে। আপনি বসুন।"

এবার ঘুরে দাঁড়ালেন প্রমীলার দিকে, "আপনার কী পার্সেল এসেছিল গত সপ্তাহে?"

প্রমীলা যেন হঠাৎ করেই ঘাবড়ে গেল, "মানে? না মানে... তেমন কিছু তো না... ওই এক বন্ধু একটা উপহার পাঠিয়েছিল।"

"উপহারটা কী ছিল?"

প্রমীলা বাঁদিকে মাথাটা হেলিয়ে একটু উপরের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলেন, "ওই তো... একটা ছোট কাচের গণেশ।"

"আর আপনার বন্ধুর নাম?"

প্রমীলা চোখের মণি চকিতে ডান থেকে বাঁয়ে চলে গেল, "মিতালি... মিতালিই... হ্যাঁ ওই তো, মিতালি দাস।"

boierpathshala.blogspot.com

কুন্তলা রুদ্র এবার কাছে এসে ঝুঁকে পড়লেন, "আপনার বন্ধুর নাম কি ড. হাজরা?"

প্রমীলা শক খাওয়ার মতো করে সোফার উপরে টানটান হয়ে বসলেন, "কে... কে ড. হাজরা? আমি এরকম কাউকে তো চিনিই না।"

কুন্তলা রুদ্র মোবাইলে একটা ছবি খুললেন, "ইন্ডিয়ান পোস্ট কনসাইনমেন্ট নং EK04455456IN। যিনি পোস্ট করেছেন, নাম ড. হাজরা। আজ দুপুরেই আপনাদের পোস্ট অফিস থেকেই রেকর্ডটা খুঁজে বের করা। সময়ের অভাবে আগের দুটো খুঁজতে পারিনি। আমার বিশ্বাস, আগেও ড. হাজরা আপনাকে আরও দুটো পার্সেল করেছিল। তা-ই তো?"

প্রমীলা ধরা গলায় বলার চেষ্টা করে, "কী...ই...ইইই... বাজে বকছেন আপনি, আমি নিজের সন্তানদের মারতে কেন যাব?"

কুন্তলা রুদ্র হেসে উঠলেন, "যাক তাহলে নিজে মুখেই তুমি স্বীকার করলেন?"

"মানে?"

মুচকি হেসে কুন্তলা রুদ্র বললেন, "আমি তো শুধু পার্সেলটা কে পাঠিয়েছিল, সেটা জানতে চাইছিলাম। আমি একবারও বলিনি তো যে আপনি আপনার সন্তানদের মেরেছেন!" প্রমীলার চোখ, মুখ কেমন যেন বিহ্বল দেখায়। কুন্তলা রুদ্র আবার শুরু করেন, "এবার কেন করেছেন, নিজে মুখে বলবেন কি?"

প্রমীলা পারেখ এখনও লড়ার শেষ চেষ্টা করতে থাকেন, "আমি মোটেই মারিনি ওদের।"

কুন্তলা রুদ্র ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা সোফাতে বসলেন, "আমিই বলি তবে। তোমার বয়স সবে পঁচিশ। কেরিয়ারের পিক টাইম। আর আগের বছর থেকেই বেশ কিছু কাজ পেতে শুরু করেছ। এ বছর একটা সিনেমার কথা আছে, সব মিলিয়ে এখুনি হয়তো মা হতে চাওনি। কিন্তু অভিরাজ বোধহয় রাজি হচ্ছিল না। আজ দুপুরে তোমার মেকআপ আর্টিস্টের সঙ্গেও কথা বলেছি। গত বছর প্রথম বাচ্চা আসার পরই অ্যাবোর্ট করার কথা অভিরাজকে বলেছিলে। অভিরাজ রাজি হয়নি। এসব কথা তো তুমি তোমার মেকআপ আর্টিস্টকে নিজেই বলেছ। তাই বোধহয়, শেষ পর্যন্ত..."

boierpathshala.blogspot.com

প্রমীলার হাত-পা ঠক-ঠক করে কাঁপছিল। এবার সে চেঁচিয়ে উঠল, "তা কী করতাম? লাভ ম্যারেজ করেছি, ঠিক আছে। কিন্তু বিয়ে করতে না করতেই প্রেগন্যান্ট হয়ে গেলাম। এত করে বোঝালাম ওকে যে এখন বাচ্চা নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আমাদের সংসারের অবস্থাটাও ঠিক না; তা-ও কে শোনে কার কথা! তখন একদিন রাস্তায় ফিরতে ফিরতে ড. হাজরার পোস্টার দেখলাম। জানি না, কী মনে করে মেল করেছিলাম। সে-ই পথ দেখাল। আর প্রথম বাচ্চাটা অ্যাবোর্ট করার পর অভিরাজেরও জেদ বেড়ে গেল, কিছুতেই প্রোটেকশন নিত না।" প্রমীলা মাথায় হাত দিয়ে মাথা নামিয়ে নেন, "কী করতাম আমি? এতগুলো বছর ধরে পরিশ্রম করেছি, আর আজ যখন চান্স আসছে তখন..." প্রমীলার গলা কান্নায় বুজে আসে।

মিসেস পারেখ উঠে এসে প্রমীলার মাথাটা বুকের কাছে জড়িয়ে নেন, "আজ থেকে তুই আমার কাছে শুবি। সব সময় সারাজীবন শুধু পুরুষমানুষগুলোর ইচ্ছেরই দাম আছে! আমাদের যেন নেই! চুপ কর।" হঠাৎ করেই মা মারা-যাওয়া প্রমীলার আবেগের বাঁধ ভেঙে যায়। মিসেস পারেখের কোমর জড়িয়ে ধরে জোরে কাঁদতে শুরু করে।

কুন্তলা রুদ্র উঠে গিয়ে টেবিলের উপর থেকে নিজের ফাইলটা নিয়ে মি. পারেখের দিকে একবার দেখে বলেন, "স্যার, আপনার পারিবারিক ব্যাপার— আপনি যা ভালো বোঝেন... এখন বোধহয় আমার যাওয়ার সময় হল।"

মি. পারেখ নিশ্চুপে মাথা নাড়েন। এর মধ্যেই শিবানী এসে দরজায় অনেকক্ষণই দাঁড়িয়েছে। কুন্তলা রুদ্র বেরিয়ে যাওয়ার আগে ফিরে তাকান, "প্রমীলা, কাল পারলে একবার ড. মীনাক্ষীর কাছে যেয়ো। তোমার কিছু মেডিক্যাল টেস্টের প্রয়োজন আছে। তোমার অসহায়তাটা হয়তো বুঝতে চেষ্টা করছি, কিন্তু তারপর যেটা করেছ সেটা তোমার ভবিষ্যতের জন্য খুব একটা সুখপ্রদ না-ও হতে পারে। কম বয়সে বার বার অ্যাবোর্ট করলে বা মিসক্যারেজ হলে, অনেক কারণে ইনফার্টিলিটি এসে যাওয়ার একটা চান্স থেকে যায়। ভগবান করুন, তোমার যেন তা না হয়।"

* * * * * * * *

boierpathshala.blogspot.com

গাড়ির সামনের সিটে এখন মা-মেয়ে বসে, শিবানী আর কুন্তলা রুদ্র। প্রায় রাত ন-টা বাজতে যায়— রাস্তার লোকের ভিড়টা ধীরে ধীরে কমতির দিকে। শিবানীর মনে একটা দ্বিধা উঁকি দিচ্ছে, "মা, তুমি কি আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলে যে প্রমীলাই?"

রাস্তার থেকে চোখ ফিরিয়ে কুন্তলা রুদ্র বললেন, "না তো। প্রসেস অফ এলিমিনেশন। প্রশ্ন করতে থাকো, সম্ভাবনা যাচাই করতে থাকো আর সবার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ খেয়াল করো। অভিজয়বাবুকে প্রশ্ন করে বুঝলাম, উনি Listeria কালচার করতে জানেন ঠিকই, বেসিক আইডিয়াও হয়তো আছে; কিন্তু সেটার বেশি কিছু জানেন না আর সেভাবে তলিয়ে ভাবলে তেমন কোনও মোটিভও দাঁড়ায় না। অভিরাজকে প্রশ্ন করে বুঝলাম, সে Listeria-র কথা জীবনে প্রথমবার শুনছে। তার একটা দুর্বল মোটিভ থাকলেও বাদ দিতে হল। কিন্তু Listeria-র কথা প্রথমবার বলতেই প্রমীলা দুই পা একটা আর-একটার উপর তুলে দিয়েছিল, দুটো হাত একটার উপর এনে চকিতে চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। বডি ল্যাঙ্গুয়েজের ভাষায় এটাকে বলে প্রোটেকটিভ পোসচার। কেউ যখন মানসিকভাবে বিপদ আশঙ্কা করে, তখন না চাইতেও মানুষ প্রোটেকটিভ পোসচারে চলে যায়। মিটিং-এর সময়ে দেখবি, অনেকে এভাবে বসে থাকে। তার মানেই হল, এই মুহূর্তে যে মতামত সবাই দিচ্ছে, সেটার সঙ্গে সে পুরোপুরি রাজি নয়। তাই নিজেকে প্রোটেক্ট করে নিজের মনে যুক্তি সাজাচ্ছে আর সম্ভাব্য সুবিধানুয়ায়ী বিকল্প খুঁজছে। তারপর মনে আছে? বন্ধুর নাম জিজ্ঞাসা করতেই প্রমীলার মাথা বাঁদিকে হেলে যায়। এর অর্থ, ওই সময়ে ও আমার কথা শোনার থেকে বেশি মনোযোগী ছিল নিজের উত্তর সাজাতে। আমরা যখন মনোযোগ দিয়ে কিছু শুনি, দেখবি না চাইতেও কিছুটা হলেও আমাদের ঘাড় ডানদিকে হেলে যায়। এই সবকিছুই বলে দিচ্ছিল, প্রমীলা মিথ্যে বলছিল। আর সব থেকে বড় থ্যাঙ্কস তো তোকে। তুই পোস্ট অফিস থেকে পার্সেলের ডিটেলসটা বের না করে দিলে হয়তো এতটা সহজ হতই না।"

শিবানী চোখ বড়-বড় করে ওঠে, "আগে ভাবতাম আমাদের বাড়িতে একটা ডিটেকটিভ। এখন তো দেখছি দুটো। বাপ রে... তবে মিসেস পারেখ আর

boierpathshala.blogspot.com

অনীতাকে কীভাবে বাদ দিলে, সেটা বুঝলাম না।"

কুন্তলা রুদ্র হেসে উঠলেন, "খালি ফালতু বকতে পারিস তুই। অনীতা প্রমীলার সন্তানের জন্য সোনার হার বানিয়েছিল। পাড়ার মন্দিরে খবর নিয়ে দেখেছি, দিন পনেরো আগে প্রমীলার জন্য উনি পূজাও দিয়েছিলেন। এত কিছুর পর তাঁকে আর সন্দেহের তালিকায় রাখা যায় না। উনি বোধহয় ভীষণভাবে মাতৃত্বের অতৃপ্তিটা প্রমীলার মাধ্যমে মেটাতে চাইছিলেন। আর মিসেস পারেখ বউমার উপর রেগে থাকলে তাকেই মারতেন! শুধু শুধু যে শিশু জন্মায়নি, তাকে মারতে যাবেন কেন? বিশেষ করে সে যখন বংশের প্রদীপ!"

শিবানী মজা করে ওঠে, "ব্রাভো মিসেস রুদ্র। আপনি রুদ্র ফ্যামিলির নাম রোশন করবেন। হা...হা...হা।"

কুন্তলা রুদ্র আদর করে শিবানীর বাহুতে একটা চড় বসিয়ে দেন, "সামনে তাকিয়ে গাড়ি চালা। জেঠুর সঙ্গে থেকে থেকে তোমার জ্যাঠামিটা বড় বেড়েছে!"

কুন্তলা রুদ্র সামনের রাস্তার দিকে তাকান। প্রমীলার কথা ভেবে শিবানীর মনটা খচখচ করে ওঠে। সে জীবনে কিছু করতে চায় কিন্তু পরিবারের দায়িত্ব সবকিছুই যেন তার অস্তিত্বকে ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিতে চায়! শিবানী একবার আড়চোখে কুন্তলা রুদ্রর দিকে তাকায়। কুন্তলা রুদ্র আনমনে সামনের দিকে তাকিয়ে। শিবানী ভয়ে ভয়ে বলে ওঠে, "মা, তোমারও কী মনে হয়? আমরা যদি না হতাম তাহলে হয়তো তুমি আজ অন্য কোথাও থাকতে? আপশোস হয় তোমার?"

কুন্তলা রুদ্র একবার শিবানীর দিকে ফিরে শুকনো হেসে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে রাস্তার দিকে নিশ্চুপে দেখতে থাকেন। বাইরের লোকজন অনেকটাই কমে গেছে। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের হলদে আলোগুলো সব অন্ধকারকে সরিয়ে দিচ্ছে। আর একঝাঁক দামাল হাওয়া তখন কুন্তলা রুদ্রর কাঁচা-পাকা চুলগুলোকে এলোমেলো করে মুখের উপর আছড়ে ফেলছে।

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

নামে কী আসে যায়

"ইয়োর নেম? ইন্দ্রাণী রুদ্রা?"

"ইয়েস।"

"হোয়াই ডিড ইউ কিল হিম?"

"আই ডিড নট কিল হিম।"

"তো মরনে সে পহেলে ও আপকা নাম দিবার পে কিউঁ লিখা?"

* * * * * * * *

ইন্দ্রাণী দিল্লিতে আসার পর ধীরে ধীরে সব গুছিয়ে নিচ্ছে। নতুন অফিস, নতুন শহর। জেঠুমণির ব্যাপারটা মনের মধ্যে খচখচ করলেও সে একরকম নিজেকে এসবের থেকে দূরেই রাখতে চাইছে। অন্ধকার জগতে সবার রং পালটে যায়! তার কাছের মানুষগুলোর আর কারও রং পালটে যাক, এটা সে আর চাইছে না। তার থেকে বরং মানুষগুলো অচেনাই থাকুক। সেই ভালো। জেঠুর কেসটা মা লড়ছে জানতে পেরে একটুও খুশি নয়। তবুও নিজের মা-কে হারতে দেখতে চায় না বলেই ড. হাজরার ব্যাপারটা জানিয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে এ কথাও পরিষ্কার করে দিয়েছে, যে তার নাম যেন না জড়ায়। সে কোনওভাবেই কলকাতা ফিরে যাচ্ছে না আপাতত।

দিল্লিতে একটা রেন্ট ফ্ল্যাট নিয়েছে—থার্ড ফ্লোর। সব মিলিয়ে তিনটে বেডরুম, একটা বসার ঘর, একটা কিচেন আর দুটো বাথরুম। ওরা অফিসের তিনজন মেয়ে একসঙ্গে থাকে। সবার আলাদা আলাদা সময় ডিউটি। যেদিন সন্ধের দিকটায় যে থাকে, খাবার বানানোর দায়িত্ব তারই। এই আবাসনটা পাঁচতলা। রাস্তার উপরেই আবাসনটা— খুব বড়সড়ো না। আবাসনের লোকেরা নিজেরা নিজেদের সময়মতো আসা-যাওয়া করে। মেন গেটের চাবি

সব ফ্ল্যাটেই একটা করে দেওয়া আছে। ফ্ল্যাটের মালিক শ্যাম তোলানিজি সেকেন্ড ফ্লোরেই থাকেন।

ইন্দ্রাণী সকাল সকাল উঠে গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যায়। প্রত্যেকদিনই তার সাজপোশাক মোটামুটি একই— একটা কুর্তি, স্কিনফিট পাজামা, চোখে হালকা কাজল, ঠোঁটে পিঙ্ক লিপস্টিক আর মাথার পিছনে উঁচু করে বাঁধা টানটান চুল। সকাল সকাল অফিস যায় আর একএক-দিন একএক সময়ে ফেরে— আই.টি. সেক্টরে কাজের চাপ যেদিন যেরকম তার উপরেই আর কী! অফিসও বেশি দূর না— হাঁটা-পথে মিনিট কুড়ি। জীবন একরকম নির্বিকার, নিরীহ ও একঘেয়েভাবেই চলছিল। যদিও এই একঘেয়েমিটাই যেন ইন্দ্রাণী বেশি করে চায় আজকাল— তার জীবনটাও আর পাঁচটা মানুষের মতো একঘেয়ে আর সাধারণ হয়ে উঠুক! কিন্তু মানুষের চাওয়া-পাওয়াগুলোর হিসেব বড় অদ্ভুত! কখন যে কী হয় কে জানে!

সকালের ঘুমটা তখনও ভাঙেনি ফ্ল্যাটের সবার— দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা। ইন্দ্রাণীর আর-এক ফ্ল্যাটমেট নিশা দরজা খুলতেই হকচকিয়ে যায়—সামনে দাঁড়িয়ে পুলিশ। নিশা জিজ্ঞাসা করে, "ইয়েস?"

"ইঁহা ইন্দ্রাণী কৌন হ্যায়?"

"ও তো সো রহি হ্যায়। থোড়া রুকিয়ে। মগর ক্যা হুয়া?"

"প্লিজ কল হার। উই উইল টক টু হার।"

নিশা আর কোনও কথা না বলে ইন্দ্রাণীকে ডেকে নিয়ে আসে। ইন্দ্রাণীও ঘুম চোখে কিছুটা অবাক হয়, "ক্যা হুয়া?"

"তৈয়ার হো লিজে। আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। লেডি কনস্টেবলকে খবর দেওয়া হয়েছে। এক্ষুনি এসে যাবে।"

"মানে কী? আপনারা কী চান? আমি কী করেছি?"

"এখন আপাতত জিজ্ঞাসাবাদের জন্য যেতে হবে। দ্বিতীয়তলায় একজন খুন হয়েছেন। দেওয়ালে আপনার নাম লিখে রেখে মারা গেছে।"

নিশা সোফাতে বসে পড়ে, "সেকেন্ড ফ্লোর? শ্যাম তোলানিজি? জিসকা গ্রাউন্ড ফ্লোর পে জুয়েলারি শপ থা?"

boierpathshala.blogspot.com

পুলিশকর্মীটি নিশার দিকে ফিরে বলে, "জি হাঁ।"

ইন্দ্রাণী কিছুটা এই অনাহূত উটকো ঝামেলাতে যেন বিরক্ত হয়, "কিন্তু আমি তো কিছুই করিনি।"

এর মধ্যে একটি মহিলা কনস্টেবল এসে যায়। পুলিশকর্মীটি বলেন, "সে ঠিক আছে। কিন্তু আপাতত আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।"

"ও.কে.। কিন্তু যাওয়ার আগে ক্রাইম-সিনটা দেখতে চাই।"

মহিলা কনস্টেবলটি ঝাঁজিয়ে ওঠে, "নট পসিবল। ওটা আইনবিরুদ্ধ।"

ইন্দ্রাণীকে এবার আরও বিরক্ত দেখায়, "প্লিজ ডোন্ট টিচ মি রুলস। আপনারা এমনিতেই কোনও প্রমাণ ছাড়া শুধুমাত্র সন্দেহের বশে আমায় নিয়ে যাচ্ছেন। আমি রুল জানি। আমার মা ল ইয়ার। আমি আপনাদের সাহায্যই করতে চাইছি। শুধু শুধু ব্যাপারটা কঠিন করে তুলতে চাইলে পরে আপনারাই সমস্যায় পড়বেন।"

এবার দুই পুলিশকর্মী একে অন্যের দিকে ফিরে চাইলেন। তারপর পদস্থ পুলিশ অফিসারটি বললেন, "ওকে। ঠিক আছে, আপনি দেখতে পারেন। কিন্তু কিছুতে টাচ করা যাবে না।"

ইন্দ্রাণী আর কোনও কথা না-বলে দু-জন পুলিশকে অনুসরণ করে। এক্ষুনি বাড়িতে ফোন করার দরকার নেই, আগে দেখাই যাক কী হচ্ছে। শ্যাম তোলানিজির সেকেন্ড ফ্লোরের ফ্ল্যাটটা মোটামুটি বড়ই। ভিতরের শোয়ার ঘরের মধ্যে জিনিসপত্র ওলটপালট হয়ে আছে— আলমারিটা হাট করে খোলা, বিছানার চাদর এলোমেলো হয়ে আছে। মেঝেতে বডিটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে, চারিদিকে রক্তে ভেসে যাচ্ছে। আর যেদিকে মাথা করে শ্যামজি পড়ে আছেন, সেদিকের দেওয়ালে বড় করে হিন্দিতে লেখা—'ইন্দ্রাণী'। এতক্ষণে ইন্দ্রাণী তাকে সকাল সকাল বেঁধে আনার কারণটা আরও ভালো করে বুঝল। ইন্দ্রাণী একটু এগিয়ে গিয়ে দেওয়ালে লেখা তার নামটা ভালো করে দেখতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই মহিলা কনস্টেবলটি আটকে দেয়, "প্লিজ কোঅপারেট ম্যাডাম। সামনে যাবেন না। আমাদের টিম আসছে। প্লিজ ডোন্ট কন্টামিনেট দ্য ক্রাইম সিন।"

boierpathshala.blogspot.com

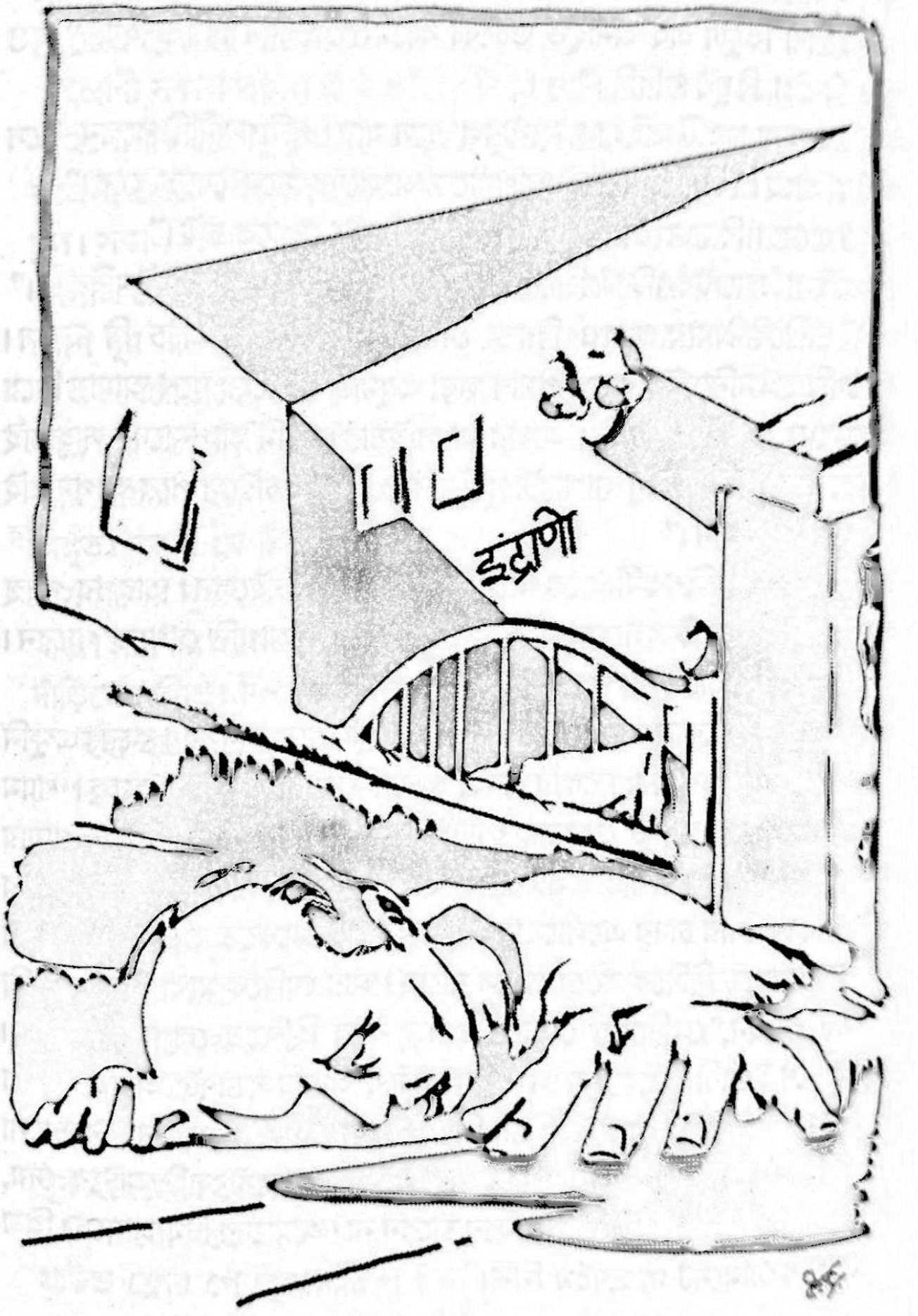

boierpathshala.blogspot.com

ইন্দ্রাণী দূর থেকে যতটা ভালো করে দেখার দেখে নেয়। একবার আলমারির কাছে গিয়ে লকারের কি-হোলটা ভালো করে দেখে নিল।

* * * * * * *

থানায় আসার পর সাব-ইনস্পেকটর জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন, "ইয়োর নেম? ইন্দ্রাণী রুদ্রা?"

"ইয়েস।"

"হোয়াই ডিড ইউ কিল হিম?"

"আই ডিড নট কিল হিম।"

"তাহলে উনি মারা যাওয়ার আগে দেওয়ালে আপনার নাম কেন লিখে গেলেন?"

"আমি কী করে জানব! অদ্ভুত তো! আপনি পুলিশ, আপনি খুঁজে বের করুন। আমি সারারাত ফ্ল্যাটেই ছিলাম।"

"কোনও প্রত্যক্ষদর্শী?"

"নহি। আমার একজন ফ্ল্যাটমেট দিল্লিতে নেই। অন্যজন নাইট ডিউটি করে সকাল ৫টায় ফিরেছিল।"

"প্ল্যান আপকা অচ্ছা হি থা। কিন্তু সমস্যা হয়ে গেল, শ্যামজি মারা যাওয়ার আগে দেওয়ালে আপনার নাম লিখে রেখে গেলেন।"

ইন্দ্রাণী একটু হাসল, "পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা আসতে দিন। আবাসনের সবার বয়ান নিন। কী কী চুরি গেছে, লিস্ট বানান। আমার রুম সার্চ করে চোরাই মাল উদ্ধার করুন। মার্ডার ওয়েপন খুঁজে বের করুন। তারপর না আপনার থিয়োরি সবাই বিশ্বাস করবে। না হলে কোর্টে আপনি একটা লেখার ভিত্তিতে আমায় খুনি প্রমাণ করতে পারবেন না!"

সাব-ইনস্পেকরটা একটু ধাক্কা খেলেন যেন, "ক্যা মতলব আপকা? যদি হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্ট রিপোর্ট দিয়ে দেয় যে ওটা শ্যাম তোলানিজির হাতের লেখা, তাহলেই হবে।"

ইন্দ্রাণী একটু হাসল, "নো হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্ট ক্যান বি সিয়োর... যে ওটা

boierpathshala.blogspot.com

শ্যামজিরই লেখা।" সাব-ইনস্পেকরটি আর কোনও কথা না বলে গটগটিয়ে চলে গেলেন।

* * * * * * * *

পরদিন দুপুরে একজন মহিলা পুলিশকর্মী হাতে একটা ফাইল নিয়ে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে দেখা করতে এল। নাম অদিতি ব্যানার্জি। ঢুকেই চেয়ার টেনে পরিষ্কার বাংলা ভাষাতেই বলল, "আপনি তো বাঙালি? যা হোক, শুনলাম নাকি কাল রমেশ নায়েককে আপনি বলেছেন, কোনও হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্ট বলতে পারবে না লেখাটা শ্যামজির লেখা কি না?"

"হ্যাঁ বলেছি। আপনাদের রিপোর্ট কি এসে গেছে? কী বললেন এক্সপার্ট?"

অদিতি একটু বিরক্ত হলেন, "সবকিছু আপনাকে বলার দরকার মনে করছি না। আপনি খুনটা কেন করলেন সেটা বলুন?"

ইন্দ্রাণী আবার হেসে উঠল, "অর্থহীন প্রশ্ন করে আপনারা সময় নষ্ট করছেন। ফ্ল্যাটের সবার বয়ান নিন। কে কোথায় ছিল, ভেরিফাই করুন। আমি খুন করিনি। ওই আমার নামটা ছাড়া আর কিছুই নেই আপনাদের কাছে! তা ছাড়া ফার্স্ট ফ্লোরে আরও একটা পরিবার থাকে। তাদের সঙ্গে কোনওদিন মিট করিনি। তবে দরজার বাইরে নেমপ্লেটে দেখেছি 'ইন্দ্রাণী সিং' নামে একজন থাকে। কী করে জানলেন যে তিনি নন?"

অদিতি এবার একটু থমকে যায়, "কই, কনস্টেবলরা তো সেরকম কিছু বলেনি!"

"আপনারা সব ফ্ল্যাটের সবার বয়ান নিয়েছেন? ঘটনাস্থলে 'ইন্দ্রাণী' লেখা দেখেই কেউ আমার নাম বলেছে আর আপনারাও চলে এলেন। একবার বাজিয়েও দেখলেন না।"

"তোমার কী মনে হয় শুনি।"

"আমার কথা শোনার আগে একবার যদি বলতেন, শ্যামজির দেহে কতগুলো আঘাত ছিল আর পোস্টমর্টেম অনুযায়ী আঘাতের পর কতক্ষণ পর্যন্ত বেঁচে থাকার চান্স ছিল তাহলে হয়তো সাহায্য করতে পারি।"

boierpathshala.blogspot.com

অদিতি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, "সব মিলিয়ে এলোপাথাড়ি এগারোটা আঘাত— তলপেট, বুক, গলা। ডানদিকের পাঁজর। তবে প্রথম কোপটা বোধহয় গলাতেই ছিল। আঘাতের পর বিছানা থেকে নিজেকে টেনে টেনে নিয়ে গিয়ে নামটা লিখেছিলেন। তবে অতগুলো আঘাত, তার মধ্যে একটা হৃৎপিণ্ড ফুটো করে দিয়েছিল, ওই অবস্থায় এক-দেড় মিনিটের বেশি বেঁচে ছিলেন বলে মনে হচ্ছে না।" অদিতি যেন হঠাৎ করেই আবার সাবধানি হয়ে গেল, "কিন্তু এসবে কী দরকার? আপনার খুনটা করার অনেক কারণ ছিল। আপনার সামনের ফ্ল্যাটের মি. শর্মা বয়ান দিয়েছেন, কিছুদিন আগেই আপনার সঙ্গে শ্যামজির খুব ঝগড়া হয়েছে।"

ইন্দ্রাণী হেসে উঠল, "হয়েছিল তো। কিন্তু কারণটা শর্মাজি জানেন না। ফ্ল্যাটটা শ্যামজির। আমরা তিনজন মেয়ে ভাড়া থাকতাম। আমরা সময়মতো ভাড়া দিয়ে দিতাম। তা-ও কারণে-অকারণে ফ্ল্যাটে এসে বসে থাকতেন আর আমাদের উদ্দেশে খারাপ প্রস্তাব রাখতেন। আগের সপ্তাহেও তখন একা ছিলাম। এসেছিলেন। ঘর থেকে সেইজন্যই ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিই। আমি তো অন্য ফ্ল্যাট খুঁজতেও শুরু করে দিয়েছিলাম। কিন্তু অবিবাহিত একা মেয়ে থাকবে শুনলেই লোক মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর শ্যামজির মতো জানোয়ারগুলো সেটারই সুযোগ নেই।" ইন্দ্রাণী রাগে ফুঁসতে থাকে।

"তাহলে আর কে হতে পারে?"

"সেটা আমি কী করে জানব? তবে আমার মনে হয় ওটা শ্যামজির লেখা নয়।" অদিতি ভ্রূ কুঁচকে তাকাতেই, ইন্দ্রাণী আবার শুরু করল, "আমরা হাতে পেন নিয়ে বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মধ্যে রেখে লিখি। শ্যামজি যখন মারা গেছেন, নিজের আঙুল দিয়ে লিখেছিলেন। মানে রক্তে লেখা আমার নামটার কথা বলছি। এগারোটা আঘাত মানে যথেষ্ট যন্ত্রণাক্লিষ্ট অবস্থায়। হয়তো হাতও কাঁপছিল। তাই সে লেখার সঙ্গে ওঁর কোনও স্বাভাবিক হ্যান্ডরাইটিং মিলবে না। হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্টরা শুধু রাইটিং স্টাইল নয়, বরং অক্ষরের প্রেশার পয়েন্টগুলো দেখে ডিসাইড করেন। দুই আঙুলের মধ্যে রাখা পেন আর আঙুল দিয়ে লেখা কতকগুলো অক্ষরের প্রেশার পয়েন্ট প্রায় কারও মিলবে

boierpathshala.blogspot.com

না। তাই এটা বলা মুশকিল যে ওটা শ্যামজিই লিখেছিলেন। আপনাদের হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্টও তো তা-ই বলেছেন, নাকী?"

অদিতি একটু অবাক হয়, "হুম"।

ইন্দ্রাণী উঠে দাঁড়ায়, "তাহলে আমি এবার আসি? কারণ আমার মনে হয় না আপনাদের কাছে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার মতো আর কিছু আছে। কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণও নেই। তাই আমাকে অযথা আর আটকে রাখলে সেটা বোধহয় আপনাদের কারও জন্যই সুখকর হবে না। আমি বরং আপনাদের সাহায্য করতে চাই। ফ্ল্যাটের সবার বয়ান নিন। সেটা বেশি দরকার।"

অদিতি অবাক হয়ে ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে থাকে। তার কেরিয়ারে এত নিস্পৃহ আর দৃঢ় মেয়ে খুব কমই দেখেছে। যেন শিকারি চিতার মতো কাল রাত থেকে ওত পেতে ছিল। আর আজ সুযোগ আসতেই, এক থাবায় ধরাশায়ী করে দিয়েছে। অদিতির এরপর আর সত্যি বলার কিছু ছিল না। অদিতি ভাবতে থাকে, এই মেয়ে যদি সত্যিই খুন করে থাকে, তাহলে ধরা কঠিন। শাতির খিলাড়ি! তা-ও নিয়মরক্ষার খাতিরে অদিতি বলল, "আপনি এখন আসতে পারেন। তবে শহর ছেড়ে কোথাও যাবেন না।"

ইন্দ্রাণী বেরিয়ে যাওয়ার আগে টেবিলে রাখা ফাইলটার দিকে চোখ পড়ল। ক্রাইম সিনের কিছু ছবি আর রিপোর্টের অংশ ফাইল থেকে বেরিয়ে এসেছিল। ইন্দ্রাণী ঝুঁকে পড়ে ভালো করে ছবি ক-টা দেখল, "আমার সম্ভাবনাই ঠিক মনে হচ্ছে। ওটা শ্যামজি মনে হচ্ছে লেখেননি।"

অদিতি সংবিৎ ফিরে পিছনে তাকিয়ে বলল, "মানে?"

"ছবিগুলো ভালো করে দেখুন," ইন্দ্রাণী ছবিগুলো টেবিলের উপর ছড়িয়ে দিল, "ক্রাইম সিনের অবস্থা বলছে, শ্যামজি খাট থেকে হাতাহাতির সময়ে পড়ে গিয়ে বুকে ঘষে ঘষে দেওয়াল পর্যন্ত গিয়েছিলেন। সারা মেঝেতে ঘষটে-যাওয়া রক্তের ছাপ। দেওয়াল পর্যন্ত গিয়ে কোনওমতে আমার নামটি লিখে মারা গেছেন। এখন কথা হল শ্যামজির উচ্চতা পাঁচ ফুট সাত, দেহের উপরের অংশের উচ্চতা দুই ফুট আট বা নয়ের কাছাকাছি। হাতের দৈর্ঘ্য যদি আমার স্মৃতি খুব ভুল না করে, প্রায় দেড় ফুটের কাছাকাছি। হয়তো একটু

boierpathshala.blogspot.com

কমই। এখন শ্যামজি মাটিতে পড়ে-থাকা অবস্থায় বুকে ভর দিয়ে উঁচু হওয়ার চেষ্টা করলে ছয় ইঞ্চিমতো হয়তো মেঝে থেকে উপরে ওঁর দেহের ঊর্ধ্বাংশ থাকবে। এই অবস্থায় সর্বোচ্চ হাত প্রসারিত করে লিখলে লেখা যেখান থেকে শুরু হচ্ছে, তার উচ্চতা মেঝের থেকে দুই ফুট উপরে। আপনার রিপোর্ট দেখুন। আপনাদের এভিডেন্স কালেক্ট টিম লিখেছে, মেঝে থেকে লেখা যেখান থেকে শুরু হচ্ছে, তার উচ্চতা প্রায় আড়াই ফুট। মানে লজিক্যালি দেখলে প্রায় ৬ ইঞ্চির গড় মিল। দ্বিতীয় কথা, শুধুমাত্র লেখার অংশটুকুর কথা বললে– উপর থেকে নীচের দিকের দৈর্ঘ্য প্রায় এক ফুট আর বাম থেকে ডানদিকে প্রস্থ প্রায় এক ফুট তিন ইঞ্চি। এখন আপনি ভেবে বলুন, আপনাকে এগারোবার আঘাত করা হয়েছে। আপনি যন্ত্রণায় মরতে বসেছেন। আপনি চান আপনার খুনির নাম লিখতে। ভালো কথা। আপনি শুয়েই মেঝেতে লেখার চেষ্টা না করে কষ্ট করে দেওয়ালে কেন লিখতে যাবেন? আচ্ছা, ধরে নিলাম আপনি দেওয়ালেই লিখতে চান। তাহলে দেওয়ালের যেটুকু অংশ আপনার হাতের মধ্যে সহজে উপলব্ধ, তার মধ্যেই তো লিখবেন? নাকি সারা দেওয়াল জুড়ে ভোটের পোস্টারের মতো বড় বড় করে লিখতে বসবেন?"

অদিতিকে একটু এবার চিন্তিত দেখায়, "আপনি বলতে চাইছেন একজন মৃত্যুপথযাত্রীর পক্ষে এত বড় ফন্টে লেখা স্বাভাবিক নয়?'

"স্বাভাবিক কি না জানি না। তবে অস্বাভাবিক তো বটেই। আমি হলেও আমার হাত যেটুকু সহজে পৌঁছোয়, সেখানেই মোটামুটি সাইজের লিখতাম। শুধু শুধু কষ্ট করে হাত স্ট্রেস করে এত বড় করে লিখতে যেতাম না। উলটোদিকে পোস্টমর্টেমের রিপোর্টও বলছে, অতগুলো মারাত্মক আঘাত নিয়ে বেশি সময় বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না। তাই বুকে ভর দিয়েও উঠে লেখার মতো অবস্থায় ছিলেন কি না, সেটা নিয়েও একটু ভাবুন।"

অদিতিকে একটু চিন্তিত দেখায়, "আপনি এখন আসুন। দরকার হলে আমরা ডাকব। প্লিজ আমাদের সহযোগিতা করুন। আর আমাদের এক কনস্টেবল আজ সবার বয়ান নিতে যাবে। আপনাকেও হয়তো আরও একবার জিজ্ঞাসা করা হতে পারে। প্লিজ কোঅপারেট।"

boierpathshala.blogspot.com

ইন্দ্রাণী নিঃশব্দে মাথা নাড়িয়ে চলে যায়।

* * * * * * * *

এক সপ্তাহ পর অদিতির ফোন পেয়ে ইন্দ্রাণী থানায় আসতেই অদিতি বলল, "আরে বসুন বসুন। কেমন আছেন?" ইন্দ্রাণী একটু থমকে যায়। অদিতি হাসি-হাসি মুখ করে বলল, "কী লজ্জার বলুন তো! আমি তো গত পরশুই জানলাম আপনার বাবা কলকাতা পুলিশের ডি.আই.জি. আর দিদিও ক্রাইম ব্রাঞ্চ। সবার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করতে গিয়ে জানলাম।"

ইন্দ্রাণী মৃদু হাসল, "ইটস ও.কে.।"

"আসলে আমরা সবার বয়ান নিয়েছি, আপনাদের ফ্ল্যাটের। সবার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করেছি। কিন্তু কারও বয়ানেই কোনও অসামঞ্জস্য চোখে পড়ছে না। তাই একবার আপনার সঙ্গে আলোচনা করতেই আপনাকে ডাকা।"

"ও.কে.। ছোট করে বলুন। দেখি যদি হেল্প করতে পারি।"

"আপনাদের ফার্স্ট ফ্লোরের ইন্দ্রাণী সিং স্বামী আর ছেলের সঙ্গে থাকেন। তিন বছর আগে ফ্ল্যাটটি কিনেছেন। সেরাতেও ফ্ল্যাটে স্বামী আর ছেলের সঙ্গেই ছিলেন। সকালে ছ-টায় উঠে গাড়ি করে ছেলেকে নিয়ে ক্যারাটে ক্লাসে গিয়েছিলেন। সাড়ে সাতটার দিকে ফিরে পুলিশ দেখে ব্যাপারটা জানতে পারেন। বলছেন, উনি নিজে দেখেনওনি উপরে গিয়ে। ওঁর স্বামীর বক্তব্য, আগের দিন সন্ধ্যাবেলা ন-টার দিকে ফেরার সময়ও গ্রাউন্ড ফ্লোরে দোকানে শ্যামজিকে দেখেছিলেন। তারপর ঘরেই ছিলেন। সকালে ওঁর স্ত্রী ছেলেকে নিয়ে ফিরে আসার পরই জেনেছেন। মাসকয়েক আগে শ্যামজির দোকান থেকে ই.এম.আই.-তে গয়না কিনেছেন। প্রায় লাখ দুয়েক টাকার। তাই একটা মোটিভ তো আছেই।"

"ওঁরা কী চাকরি করেন?"

"মিসেস সিং-এর বুটিক আছে। আর মিস্টার সিং একটা অ্যাড এজেন্সির ক্রিয়েটিভ ডিজাইনার।"

"না। তাহলে এই দু-লাখ টাকার মোটিভটা মোটেই দাঁড়াচ্ছে না। কারণ

boierpathshala.blogspot.com

যদি খুব ভুল অনুমান না করি, এঁদের মাসিক ইনকাম কম করে হলেও সত্তর-আশি হাজার হবেই। এঁদের ব্যবসা কি খারাপ যাচ্ছে? বা চাকরিতে কোনও খারাপ অবস্থা?"

"না, সেরকম তো কিছু এখনও পাইনি।"

"তাহলে, ফ্ল্যাটের লোনের টাকা আর খরচখরচার পরও যা থাকে, তাতে দু-লাখ টাকা মেটাতে সময় লাগবে হয়তো বছরখানেক বা তার বেশি। কিন্তু তার জন্য খুন করার প্রয়োজন দেখছি না। এক যদি হঠাৎ টাকার দরকার না হয়ে থাকে। শ্যামজির আলমারি থেকে কত টাকার গয়না লোপাট? টাকা কিছু?"

"শ্যামজির ফ্যামিলি ইউ.পি.তে থাকে। তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। বিপত্নীক প্রায় পাঁচ বছর। এক ছেলে আর বউমা। তারা কিছু বলতে পারল না। তবে ক্যাশিয়ার বলেছে, আগের রাতে সে পাঁচ লাখ টাকা গুনে শ্যামজির হাতে দিয়েছিল। কথা ছিল পরদিন সকালে শ্যামজি ব্যাঙ্কে জমা করতে যাবেন। কিন্তু আমরা তো কোনও টাকাই পাইনি। গয়নার ব্যাপারে যদিও ভদ্রলোক কিছু বলতে পারেননি সঠিক।"

"বাকিরা?"

"আপনার ফ্লোরের সামনের শর্মা ফ্যামিলির লোক চারজন। বয়োজ্যেষ্ঠ দম্পতি। তাঁদের দুই ছেলে-মেয়ে— বয়স তেইশ-চব্বিশের কোঠায়। ছেলে অমর নাইট ডিউটিতে অফিসে ছিল। আমরা ফোনের লোকেশনও চেক করেছি। অফিসে গিয়েও জিজ্ঞাসা করেছি। মেয়ে অঙ্কিতা। আসলে সে-ই সেদিন আপনার নাম বলেছিল। লেট নাইট পার্টি করে দুটোর দিকে যখন ফিরছিল তখন নাকি শ্যামজির ফ্ল্যাটে কোনও মহিলার চাপা কণ্ঠস্বর পায়। কিন্তু অত খেয়াল করে শোনেনি। দম্পতিদ্বয় ঘরেই ছিলেন সারাদিন। এদের চারজনের কোনও মোটিভ আছে কি না এখনও তেমন কিছু আমরা পাইনি।"

"শ্যামজি আন্দাজ ক-টার দিকে মারা গিয়েছিলেন?"

"রিপোর্ট বলছে আন্দাজ রাত দুটো থেকে আড়াইটে।"

ইন্দ্রাণী একটু ভেবে বলল, "এদের মধ্যে ক্যাশিয়ার ভদ্রলোক জানতেন,

boierpathshala.blogspot.com

সে-রাতে শ্যামজির কাছে পাঁচ লাখ টাকা আছে, সেটা কি একটা মোটিভ হতে পারে?"

অদিতি একটু দোনামনা করে বলল, "যদি ইদানীং টাকার দরকার থেকে থাকে তাহলে অন্য কথা। না হলে লোকটির কথা শুনে বুঝলাম, বিয়ের সিজনে ষাট-সত্তর লাখ পর্যন্তও এক সপ্তাহে বিক্রিবাটা হয়ে যায়। এর মধ্যে ক্যাশ বিশ-ত্রিশ লাখ তো বটেই। সেটা শ্যামজি সপ্তাহের শেষে ব্যাঙ্কে ফেলে আসেন। তাই ক্যাশিয়ার যদি টাকার লোভের জন্যই মেরে থাকে তাহলে আর কয়েক মাস পরেই বিয়ের সিজন শুরু হবে। তখন খুন করলে কি লাভটা বেশি হত না?"

ইন্দ্রাণী দাঁত দিয়ে নখ খেতে খেতে বলল, "পয়েন্ট! আচ্ছা, শ্যামজি আমাকে যেমন কুপ্রস্তাব দিত, ফ্ল্যাটের অন্য একা থাকা মেয়েদেরও না-দেওয়াটা অস্বাভাবিক। সেটাকে কি ভেবে দেখেছি?"

অদিতি বলল, "হ্যাঁ। ফোর্থ ফ্লোর ফ্ল্যাটেও দু-জন মেয়ে থাকে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। তাদের একজন স্বীকার করেছে, শ্যামজি অনেক প্রস্তাব দিত। সে কোনওমতে এসবের থেকে দূরে আছে। কিছুটা ভয়ে ভয়েও ছিল মনে হচ্ছে। অন্য মেয়েটি বেশ ডাকাবুকো টাইপ– নাম রেশমি। নিজেই বলল, নিজের ইচ্ছেয় যার সঙ্গেই শুই কারও কিছু বলার নেই। খবর নিয়ে জানলাম স্ট্রাগ্‌লিং মডেল। কিন্তু অঢেল পয়সা দু-হাতে ওড়ায়। জিজ্ঞাসা করাতে সেটাতেও দেখলাম রাখঢাক নেই। দিব্যি বলে দিল সব কিছুর একটা দাম আছে। শ্যামজি তার সঙ্গে কাটানো সময়ের দাম দিতেন।"

ইন্দ্রাণী একটু ভেবে বলল, "হুম। এক বোকা না হলে সোনার ডিম দেওয়া মুরগি কেউ কাটে না। তা এই দ্বিতীয় মেয়েটি কি সে-রাতে শ্যামজির ফ্ল্যাটে ছিল? জিজ্ঞাসা করলেন কিছু?"

"হুম। জানাল রাত আড়াইটে পর্যন্ত আফটার শুট পার্টিতে ছিল। খবর নিয়ে দেখেছি, সত্যি বলছে। প্রোডিউসার নিজে গাড়ি করে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল সে-রাতে। তিনটের দিকে। শুধু একটা জিনিস বলল, যেটা ভাবার।"

"কী?"

boierpathshala.blogspot.com

2021/5/8

"বলল, লিফট নাকি সে-রাতে সেকেন্ড ফ্লোরে থেমেছিল। লিফ্‌ট খোলার পর একজন মহিলা লিফ্‌টে ঢুকতে গিয়েও আর ঢোকেনি— রেশমিকে দেখে থেমে যায়। মুখে নাকি একটা দোপাট্টা জড়ানো ছিল। রেশমি মদ্যপ অবস্থায় থাকায় অতটা ভালো করে লক্ষ করেনি। খেয়ালও নেই।"

ইন্দ্রাণী একটু ভেবে বলল, "হিসেব মিলছে। অঙ্কিতা রাতের দুটোর দিকে ফিরছিল, তখন শ্যামজির ফ্ল্যাটে কোনও মহিলার গলার আওয়াজ শুনেছিল। রেশমি রাত তিনটের পর দু-তলায় কোনও মহিলাকে লিফ্‌টের সামনে দেখেছিল। খুনের সময় আন্দাজ আড়াইটা। সমস্যা হল আমাদের আবাসনটি ছোটমাপের প্রাইভেট প্রপার্টি। না আছে কোনও সিসিটিভি, না আছে কোনও দারোয়ান! আচ্ছা, রেশমির ঘরের আর, একটি মেয়ে?"

অদিতি বলল, "হ্যাঁ, নমিতা। ওকে একটু সন্দেহজনক লাগছে। কারণ, রেশমি না-ফেরা পর্যন্ত ও ফ্ল্যাটে একাই ছিল।"

"এর মধ্যে একজন মিথ্যে বলছে। আর না হলে কয়েকজন মিলে মিথ্যে বলছে। না হলে সবকিছু এত ভালোভাবে ম্যাচ করেছে..." ইন্দ্রাণী চেয়ারে হেলান দিয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে, "অঙ্কিতা যদি মিথ্যে বলে তাহলে রেশমির কাউকে তখন সেকেন্ড ফ্লোরে দেখার কথা ছিল না। যদি না ওই একই সময়ে কেউ লিফ্‌টের জন্য আর পাঁচ দিনের মতো ওয়েট করছিল। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন দুটো। সেকেন্ড ফ্লোরে আর কোনও ফ্ল্যাট নেই—শ্যামজির ছাড়া। তাহলে সে সেকেন্ড ফ্লোর থেকে লিফ্‌ট নেওয়ার জন্য ওয়েট কেন করবে? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন, সাধারণভাবেই যদি অপেক্ষা করছিল তাহলে রেশমিকে দেখে লিফ্‌টে উঠল না কেন? থমকে কেন গেল? অঙ্কিতা আর রেশমির বয়ান এতটাই ম্যাচ করে তা দেখে মনে হচ্ছে, দু-জনেই সত্যি বলছে। আর না হলে দু-জনেই মিথ্যে। তবে আমি যত দূর এদের দেখেছি, খুব একটা এদের চেনাজানা বা বন্ধুত্ব আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু তা-ও সন্দেহের থেকে বাইরে রাখাটাও এক্ষুনি যাবে না।"

অদিতি টেবিলে রাখা জলের গ্লাস থেকে ঢক ঢক করে জল খেয়ে বলল, "আপনি আমায় সব গুলিয়ে দিচ্ছেন! এখন মনে হচ্ছে সবাইই বোধহয়

boierpathshala.blogspot.com

খুনি!" অদিতি একটু ঝুঁকে পড়ে, "তবে আপনাকেও আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কিন্তু এখনও সন্দেহের বাইরে রাখেনি।"

ইন্দ্রাণী হেসে ফেলে, "জানি, জানি। সে বুদ্ধি আমার আছে। আমার বাড়িতেই দুটো পুলিশ আছে। আপনি কী ভাবেন, আপনাদের মনোভাব আমি বুঝি না? আপনি আমায় ছেড়ে দিয়ে পিছনে লোক লাগালেন, এটা দেখার জন্য আমি কোনও ভুল পদক্ষেপ বা অপরাধের প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করছি কি না? থানায় এনে এই যে এত ভালো ভালো কথা বলছেন, সেটাও তো এটাই জানার জন্য, সে-রাতে সেকেন্ড ফ্লোরের ওই লিফ্‌টের জন্য ওয়েট করা মেয়েটা আমিই কি না! অফিসে একটা নতুন ছেলে এসেছে– আমার টেবিলের উলটোদিকে তিন টেবিল ছেড়ে বসে। ষণ্ডা চেহারা, ভারী সোলের বুট পরে অফিস আসে। হাতের ভিতরের দিকে আঙুলের নীচের অংশে কড়া পড়েছে।"

অদিতি টানটান হয়ে চেয়ারের উপর সোজা হয়ে বসে। ইন্দ্রাণী উঠে টেবিলে দু-হাতে ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ায়, "আসলে কী জানেন মিসেস ব্যানার্জি, আই-টি কর্মচারীরা বাই ডিফল্ট সোফিস্টিকেটেড হয়। সে তাদের ব্যাঙ্কে টাকা থাক আর না-ই থাক। আর সারাদিন ল্যাপটপ টিপে হাতের নখ ভোঁতা হতে পারে কিন্তু হাতে কড়া পড়ে না। ভারী পুলিশমার্কা বুট তো পরেই না। আর-একটু সাবধানি হতেই পারতেন, তা-ই না?"

অদিতি ব্যানার্জি উঠে দাঁড়ায়, "ওয়েল। লেট মি বি স্ট্রেট। আমরা এখনও আপনাকে সন্দেহের বাইরে রাখিনি। তাই আমরা আমাদের মতো করে তদন্ত চালাবই। সে আপনার পছন্দ হোক বা না হোক। আপনার ফ্ল্যাটমেট নিশা সারারাত অফিসে ছিল, নিজেই দায়িত্ব নিয়ে সেরাতের সবার বায়োমাট্রিক অ্যাটেন্ডেন্স ডেটা আমাদের দিয়েছে। তার ফোনের লোকেশনও সারারাত অফিসেরই ছিল। আপনি সেরাতে ফ্ল্যাটে একা ছিলেন—ভোর ৫টা পর্যন্ত তো বটেই। তাই আপনার কাছে যথেষ্ট সুযোগ ছিলই। কারণও ছিল।"

ইন্দ্রাণী ঠিক ততটাই নিস্পৃহভাবে উত্তর দেয়, "ট্রাস্ট মি, যার জন্য জেলে আমায় একরাত কাটাতে হয়েছে; তাকে এত সহজে আমি ছাড়ব না।"

* * * * * * * *

boierpathshala.blogspot.com

কয়েকদিন পর ইন্দ্রাণী অদিতিকে ফোন করল, "একবার আজ সন্ধেবেলা আমাদের ফ্ল্যাটে আসতে পারেন? কথা দিতে পারছি না, তবে হয়তো আপনাদের খুনিকে আজ ধরে দিতে পারব। দেরি করবেন না। ঠিক সাতটা।" অদিতি ফোনটা রেখে দেয়। তার যেন বিশ্বাস হচ্ছে না— তারা যেটা খুঁজে পাচ্ছে না, এই মেয়েটা নাকি বলে, সে করে ফেলেছে! ঠিক আছে গিয়ে দেখা যাক একবার।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা অদিতি ব্যানার্জি, সাব-ইনস্পেকটর নায়েক আর দু-জন কনস্টেবল এলেন ইন্দ্রাণীর ফ্ল্যাটে। এর মধ্যে অন্য রুমমেট রাধিকা ফিরে এসেছে। অদিতিরা আসতেই ইন্দ্রাণী সবাইকে বসতে দিয়ে চা বানাল। তারপর একটা চেয়ারের উপর বসে হাতে চায়ের কাপটা নিয়ে শুরু করল, "রাধিকা আর নিশা, তোরা নিশ্চয়ই অবাক হয়েছিস! হঠাৎ আবার পুলিশ কেন?"

রাধিকা আর নিশা একে অন্যের চোখের দিকে তাকাতে লাগল। অদিতি বলল, "ওরা বোধহয় বাংলাটা ঠিক..." রাধিকা মাঝপথেই থামিয়ে বলল, "সমঝ সাকতে হ্যায়। বস বোল নহি পাতি। থোড়া তো সারপ্রাইজ হুঁ হি।"

"কিছুই না। আমার উপর শ্যামজির খুনের চার্জ ছিল। সেটা থেকে নিজেকে রেহাই দেওয়ার চেষ্টা। লিটল ডিসকাশন।"

অদিতি বলল, "প্লিজ ডোন্ট ওয়েস্ট এনি মোর টাইম। প্লিজ লেট আস নো হোয়াট ইউ নো।"

ইন্দ্রাণী হাসতে হাসতে বলল, "সেইজন্যই তো ডাকা। আমি আবাসনে সবার সঙ্গে আবার করে কথা বলেছি এর মধ্যে। কোথাও একটা কিছু অসামঞ্জস্য তো থাকবেই। কারণ, কেউ একজন বা কয়েকজন মিথ্যে বলছে। সেই অসামঞ্জস্যটা খুঁজে বের করাই বেশি দরকার ছিল। আগে নমিতার কথাটা বলে নিই। নমিতা রাত সাড়ে তিনটে পর্যন্ত একাই ছিল। আর তাকেও যে শ্যামজি উত্ত্যক্ত করত, এটা সে স্বীকার করেছে। এখন অঙ্কিতা আর রেশমির বয়ান থেকে জানা যায় সেরাতে ওই একই সময়ে সেকেন্ড ফ্লোরে কোনও না কোনও মহিলা ছিল। অঙ্কিতা আর রেশমির বয়ানের মিলটার কারণে এটা মেনে নেওয়া যায় যে ওরা সত্যি বলছে। আর-একটা কারণ হল, শ্যামজি মারা গেলে আখেরে রেশমির ক্ষতিই। তাই তার মিথ্যে বলে কাউকে লুকানোর কোনও প্রয়োজন

boierpathshala.blogspot.com

নেই। আর আমি রেশমির সঙ্গে এর মধ্যে কথাও বলেছি। মেয়েটি বেশ ঠোঁটকাটা– ডোন্ট কেয়ার টাইপ। এবার তাহলে বাকি থাকে সেকেন্ড ফ্লোরের মেয়েটি কে ছিল, সেটা খোঁজা। সেটা নমিতা নয়, কারণ রেশমি যখন ফেরে তখন তাদের ফোর্থ ফ্লোরের ফ্ল্যাটের দরজা নমিতাই খুলেছিল।"

সাব-ইনস্পেকটর নায়েক বলে উঠলেন, "হতেই তো পারে, সিঁড়ি দিয়ে লিফ্টের আগেই উঠে গিয়ে ঘরে ঢুকে গিয়েছিল?"

ইন্দ্রাণী হেসে বলল, "চলুন, লেটস ট্রাই। আমি যদিও পাঁচবার করেছি। সে-রাতে রেশমি লিফ্টে একাই ছিল। সেকেন্ড ফ্লোরের পরে ডাইরেক্ট থেমেছিল ফোর্থ ফ্লোরে। সেকেন্ড ফ্লোর থেকে ফোর্থ ফ্লোর লিফ্টের দরজা বন্ধের পর পৌঁছোতে সময় লাগে ৬ সেকেন্ড মতো। আর সেকেন্ড ফ্লোর থেকে ফোর্থ ফ্লোর সব মিলিয়ে সিঁড়ি ৬০টা, দূরত্ব ১৬ মিটার মতো। মানে ৬ সেকেন্ডে কাউকে এই ১৬ মিটার ক্রস করতে গেলে প্রায় ৯.৬ কিমি/ঘণ্টায় সিঁড়ি চড়তে হবে। আর ঘরের মধ্যে ঢুকতে হলে আরও জোরে দৌড়োতে হবে– ধরে নিন ১০ কিমি/ঘণ্টা। আর ট্রাস্ট মি, গ্রাভিটেশনাল ফোর্সের বিরুদ্ধে ১০ কিমি/ঘণ্টায় টানা ৬০টা সিঁড়ি চড়া ইজ নট অ্যান ইজি টাস্ক। এক আপনি যদি অ্যাথলেটিক না হন। আপনারা কেউ চাইলে ট্রাই করতেই পারেন।"

সবাই একবার বাইরে গিয়ে চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিল। লিফ্টের মধ্যে থাকল সাব-ইনস্পেকটর নায়েক। চারতলায় গিয়ে দাঁড়াল ইন্দ্রাণী। অদিতি চার-পাঁচবার ও সঙ্গের দু-জন কনস্টেবল কয়েকবার চেষ্টা করল। অদিতি চেষ্টা করে দু-বার লিফ্ট পৌঁছোনোর প্রায় একই সময়ে চারতলায় পৌঁছোল। কিন্তু ঘরের দরজা পর্যন্ত পৌঁছোতে পারল না।

এর মধ্যে ঘরের দরজা খুলে রেশমি আর নমিতা বেরিয়ে এসে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করতে লাগল। কী হচ্ছে বোঝার পর ওরা ইন্দ্রাণীর ফ্ল্যাটে এসে জমা হল। এদিকে ইন্দ্রাণীদের সামনের ফ্ল্যাটের শর্মা ফ্যামিলিও দৌড়োদৌড়ির শব্দ শুনে ইন্দ্রাণীদের ফ্ল্যাটে গুটিগুটি এসে জড়ো হল।

যদিও সবাই বাংলায় বুঝবে কি না, তার তোয়াক্কা না করেই ইন্দ্রাণী ঘরে এসে সোফায় বসে আবার শুরু করল, "একতলার ইন্দ্রাণী সিংয়ের সঙ্গে বেশ

boierpathshala.blogspot.com

কয়েকবার কথা বললাম। ভদ্রমহিলা বেশ ভালো। কিন্তু সন্দেহ করা বা না-করা— দুটোর কোনওটার জন্যই যথেষ্ট কারণ পাচ্ছিলাম না। ঠিক তখনই আজ ক্যান্টিনে অনির্বাণের একটা কথা সব পরিষ্কার করে দিল," ইন্দ্রাণী নিশার দিকে তাকাল। নিশা চোখ সরিয়ে নিল। অদিতি বলে উঠল, "অনির্বাণ কে?"

"নিশার বয়ফ্রেন্ড। নিশা, ডু ইউ ওয়ান্ট টু সে সামথিং? এরপর হয়তো আর সুযোগ পাবে না।"

"ক্যা মতলব তুমহারি?"

"ঘটনার দিনের পর থেকে এখনও আর কোনও নাইট ডিউটি তোমার পড়েনি। অনির্বাণ বলল, সেরাতে ও দুটোর কিছু পরে তোমায় ফোন করেছিল। চারবার। তুমি ফোন তোলোনি। কেন বলবে কি?"

"মেরি মরজি। তুমি জিজ্ঞাসা করার কে? আমার পারসোনাল লাইফ। আমার ভালো লাগেনি তাই তুলিনি। কাজে ছিলাম।"

অদিতি একটু অধৈর্য হয়ে পড়ল, "হ্যাঁ, ফোন ধরেনি। তাতে কী?"

ইন্দ্রাণী হেসে বলল, "আপনাকে আমি যদি পর পর চারবার ফোন করি, আপনি কি আমায় কল ব্যাক করবেন না? একটা বারও কী হয়েছে জানার জন্য! আসল ব্যাপার হল নিশা নিজের ফোন রেখে সেদিন অফিসের বাইরে বেরিয়েছিল। ফোন ডেস্কেই ছিল, যাতে ফোন পরে ট্র্যাকিং হলেও লোকেশন অফিসই দেখায়।"

নিশা চিৎকার করে ওঠে, "ঝুট বাত। আমার বায়োমেট্রিক দেখে নাও। পুলিশকে দেওয়াই আছে।"

ইন্দ্রাণী ঠোঁট চেপে মুচকি হাসল, "দ্যাট'স আ মাস্টারস্ট্রোক ইন ডিড। পুলিশকে নিজেই বায়োমেট্রিক অ্যাটেন্ডেন্স ডেটা এনে দিয়ে দেওয়া। সাক্ষী মিথ্যে বলতেই পারে। কিন্তু বায়োমেট্রিক কার্ড রেকর্ড সন্দেহ করার কোনও জায়গাই নেই। যাতে কেউ আর ভুলেও সিসিটিভি চেক করার কথা না ভাবে। তা-ই তো?" নিশার মাথাটা নিচু হয়ে এল।

অদিতি বলল, "মানে?"

"মানে আপনাদের সামনে একটা দারুণ এভিডেন্স এনে দিল যার পরে আর

boierpathshala.blogspot.com

সন্দেহ কে-ই বা করবে? বাট দ্যাট ওজ দ্য ট্রিক। আমি সাজিয়ে বলার চেষ্টা করছি। নিশা, ভুল হলে প্লিজ কারেক্ট মি। নিশা অফিস পৌঁছোনোর পর রিসেপশনে বলে, সে আজ নিজের বায়োমেট্রিক কার্ড আনতে ভুলে গেছে। সিকিয়োরিটি গার্ড নিয়ম অনুযায়ী একটা ভিজিটার কার্ড সাময়িক ব্যবহারের জন্য দেয় আর রেজিস্টারে এন্ট্রি করিয়ে নেয়। নিশার ভিজিটার কার্ডের নং ছিল ৬। দরজা দিয়ে ঢোকার সময় নিজের পারসোনাল কার্ড আর ভিজিটার দুটো কার্ডই সে পাঞ্চ করে। রাতের বেলা দেড়টার দিকে সে যখন বের হয় তখন নিজের পাঞ্চকার্ড ব্যবহার না করে ভিজিটার কার্ডটি ব্যবহার করে। ফলে পরে আপনাদের যে বায়োমেট্রিক রিপোর্টটি দিয়েছিল, সেটায় রাত ৮টায় নিশার কার্ডের আর ভিজিটার কার্ড নং ৬-এর অফিসে ঢোকার এন্ট্রি আছে। দেড়টার দিকে ভিজিটার কার্ড নং ৬-এর অফিস থেকে বের হওয়ার এন্ট্রি আছে কিন্তু নিশার কার্ডের বের হওয়ার কোনও এন্ট্রি নেই। আপনারা আর পাঁচটা কার্ডের ভিড়ে ভিজিটার কার্ড নং ৬-কে লক্ষ্যই করলেন না। আপনারা দেখছিলেন নিশার কার্ডের এন্ট্রি। যা-ই হোক, নিশা কাজ মিটিয়ে ফিরল রাত সাড়ে তিনটে। লিস্টে আবার ভিজিটার কার্ড নং ৬ দিয়ে অফিসে ঢোকার এন্ট্রি হল। আরও কিছুক্ষণ অফিসে কাটিয়ে চারটের দিকে নিশা অফিস থেকে বের হল দুটো কার্ডই পাঞ্চ করে। তাই বায়োমেট্রিক অনুযায়ী নিশা অফিসে ঢুকেছিল সন্ধে আটটায় আর বেরিয়েছিল পরদিন ভোর চারটে। ফোনও অফিসে ছিল। সো পারফেক্ট অ্যালিবাই। অনির্বাণের কথায় সন্দেহ হওয়ায় আজ প্রথমেই সিকিয়োরিটি রুমে গিয়ে সেদিনের সিসিটিভি চেক করে দেখলাম, দিব্যি নিশা দেড়টার দিকে বের হচ্ছে আর ফিরছে সাড়ে তিনটের দিকে। আমি শুধু বুঝতে পারছিলাম না বায়োমেট্রিক এন্ট্রিটা কী করে ম্যানিপুলেট হল। তারপর আজ অফিস থেকে বের হওয়ার সময় একজনকে ভিজিটার কার্ড ফেরত দিতে দেখেই মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রেজিস্টার চেক করে আর বুঝতে বাকি রইল না।"

নিশা এবার একটু খেঁকিয়ে উঠল, "হাঁ, মে নিকলি থি। পারসোনাল কাজ ছিল। আমার অফিস থেকে বের হওয়াতে কিছুই প্রমাণ হয় না যে আমি

boierpathshala.blogspot.com

শ্যামজিকে খুন করেছি!"

"অ্যাবসোলিউটলি নট। কিন্তু পাঁচ লাখ টাকাটা পাওয়া গেলে প্রুফ হয়ে যাবে বোধহয়।"

নিশা আরও জোরে চেঁচিয়ে ওঠে, "আমার ঘর খুঁজে দেখো। কোথাও কোনও পাঁচ লাখ টাকা নেই।"

ইন্দ্রাণী হেসে ওঠে, "আই নো ইউ আর নট দ্যাট মাচ ফুল। যে এত প্ল্যান করতে পারে, সে এত বড় ভুলটা করবে না। টাকা তোমার অফিসের ডেস্কের নীচের ড্রয়ারে আছে। এমন জায়গা, যেখানে পুলিশ সার্চ করবেই না। ভুলে যেও না অফিসের ভিতরেও ক্যামেরা আছে। খালি হাতে গেলে আর প্যাকেট নিয়ে ফিরলে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল ক্যামেরার ফুটেজে।" নিশা এবার একটু তোতলাতে থাকে, "ও... ও মেরা পারসোনাল হ্যায়। উধার লি কিসিসে।"

"আচ্ছা? ধার নিয়ে বুঝি অফিসের ডেস্কে রাখতে হয়? ঘরে বা ব্যাঙ্কে রাখতে নেই?"

"নহি, ডাল দেতি ব্যাঙ্ক মে এক দো দিন মে..."

"চলো, আমিই বলি। শ্যামজি টাকাপয়সা রাখার ব্যাপারে একটু কুসংস্কারমনস্ক, সে লকার দেখলেই বোঝা যায়। লকারের ভিতরে একদিকে লক্ষ্মী-গণেশের ছবি আর সামনে হলুদ আর সিঁদুর ছড়ানো। অন্যদিকে টাকা রাখা থাকত। তাই ও টাকা উদ্ধার হলেও সামান্য হলুদ আর সিঁদুরের দাগ হয়তো পাওয়া যাবে। আর যদি না-ও পাওয়া যায়, আগের রাতে শ্যামজির দোকানের ক্যাশিয়ার নিজে হাতে টাকা গুনেছিলেন। এক-দুটো টাকায় তাঁর ফিঙ্গারপ্রিন্টও পাওয়া যাবেই। নাউ ডোন্ট সে কি তুমি ক্যাশিয়ারের থেকে টাকা ধার নিয়েছিলে। ইউ হ্যাভ নো ওয়ে টু এসকেপ! শুধু মোটিভটা এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। সেটা কি নিজেই বলবে?"

নিশা এবার দু-হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল, "ক্যা কারতি ম্যায়? এক বছর আগে যখন এখানে এসেছিলাম তখন শ্যামজির সঙ্গে একটু বেশিই ক্লোজ হয়ে গিয়েছিলাম। ছয় মাস আগে অনির্বাণের সঙ্গে সম্পর্ক শুরু হয়। আমি অনিকে চিট করতে চাইনি। সেইজন্য শ্যামজিকে এড়িয়ে যেতে থাকি। কিন্তু

boierpathshala.blogspot.com

আমি জানতামই না, লোকটা আমাদের প্রাইভেট মুহূর্তগুলো ক্যামেরাবন্দি করে রাখত। যখন আমি ওকে এড়িয়ে যেতে লাগলাম তখন লোকটা আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে লাগল। পুলিশের কাছে যাব, বহুবার ভেবেছিলাম। কিন্তু ভয় পেতাম। পুলিশের কাছে গেলেই তো সবাই সবকিছু জেনে যেত। সেইজন্য... বিশ্বাস করো...আমি খুন করতে চাইনি। কিন্তু উনি আমার জন্য আর কোনও রাস্তাই খোলা রাখেননি!" নিশা দু-হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকে আর ঘরের মধ্যে তখন এক অপার্থিব নিস্তব্ধতা।

অদিতি ইন্দ্রাণীর দিকে তাকাতেই ইন্দ্রাণী বলল, "আমি অফিসে অলরেডি রিট্ন অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে দিয়েছি। কাল সিসিটিভি ফুটেজের কপি পেয়ে যাবেন। রেজিস্টারে ভিজিটার কার্ডের এন্ট্রি চেক করলে বাকি তথ্যগুলোও পেয়ে যাবেন। আর ওর ডেস্কের নিচের ড্রয়ারে টাকা লক্ড আছে। তা-ও পেয়ে যাবেন। হোপ, দ্যাট'স এনাফ।"

অদিতি নিশার দিকে ফিরে বলল, "হোয়্যার ইজ দ্য মর্ডার ওয়েপন?"

নিশা মাথা নিচু করে বলল, "শ্যামজিকে ফ্ল্যাট মে হি হ্যায়। সবজি কাটার ছুরি রান্নাঘর থেকেই নিয়েছিলাম। আবার ধুয়ে জায়গায় রেখে দিই।"

এতক্ষণে শর্মা দম্পতির মেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু তুমি ইন্দ্রাণীর নাম লিখেছিলে কেন?"

নিশা ধরা গলায় উত্তর দেয়, "জাস্ট টু অ্যাভয়েড ডাউট অন মি। কারও একটা নাম লিখে পুলিশকে ভুল পথে চালাতে চাইছিলাম। তখন ইন্দ্রাণীর নামটাই মাথায় আসে।"

ইন্দ্রাণী শান্তভাবে বলে, "আর টাকা চুরি?"

"ওটা বোনাস। আগের থেকে প্ল্যান ছিল না। চাবি বিছানার নীচেই থাকে। লকার খুলে পাঁচ লাখ পেয়ে গেলাম!"

অদিতি কনস্টেবল দু-জনকে ইশারা করতেই, মহিলা কনস্টেবলটি গিয়ে নিশার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেয়। নিশাও আর কোনও কথা না বলে নতমুখে পা বাড়ায়। অদিতি পিছন ফিরে একবার শুধু বলে, "থ্যাঙ্কস।"

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

যারা পেল না আলো

কোর্টের বাইরে ভিড় উপচে পড়েছে। এর মধ্যেই মিডিয়ার কাছে খবর পৌঁছে গেছে, কলকাতা পুলিশের ডি.আই.জি. শেখর রুদ্রর দাদা প্রখর রুদ্রকে খুনের দায়ে কোর্টে তোলা হচ্ছে। পুলিশ ইতিমধ্যে কোর্ট চত্বর ঘিরে ফেলেছে। ভিতরে মিডিয়া ঢোকা বারণ। তাই ক্যামেরা আর সাংবাদিকরা বাইরেই ভিড় জমিয়েছে। প্রখর রুদ্র এসে কোর্টের একপাশের বক্সে দাঁড়ালেন। ক-দিনের অযত্নে স্বাস্থ্য ভেঙেছে কিছুটা, মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি।

সরকারপক্ষের উকিল মি. দাশগুপ্ত সওয়াল শুরু করলেন, "মাই লর্ড, আদালতে দণ্ডায়মান এই ব্যক্তি, শ্রীপ্রখর রুদ্র এক বিচারাধীন আসামি, প্রতীক সরকারকে সুচতুরভাবে হত্যা করেছেন। যদিও কলকাতা পুলিশের দক্ষ অফিসার প্রদোষ চ্যাটার্জি অপরাধী প্রখর রুদ্রকে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণসহ গ্রেপ্তার করেছেন। প্রমাণের কথাই যখন উঠল, আমি আরও একবার মহামান্য আদালতকে মনে করিয়ে দিতে চাই, আমাদের কাছে ঠিক কী কী প্রমাণ আছে। আমাদের কাছে আছে ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ, যেটি হত্যার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার হয়েছিল। ঘটনাস্থলে প্রখর রুদ্রর উপস্থিতির প্রমাণ হিসাবে, তাঁর চুল ও আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। চুলের ডি.এন.এ. টেস্ট পজিটিভ। আদালতের কাছে ফরেনসিকের রিপোর্টও দেওয়া আছে। এসব তথ্যপ্রমাণ অভ্রান্তভাবে প্রমাণ করে যে এই জঘন্য হত্যার ষড়যন্ত্রের পিছনে জড়িত ব্যক্তি একমাত্র প্রখর রুদ্র। আদালতের কাছে আমার আবেদন, এই অপরাধীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক।"

এবার কুন্তলা রুদ্র উঠে দাঁড়ালেন, "শাস্তির জন্য এত দ্রুততা কেন, মি. দাশগুপ্ত? সবে তো কেস শুরু। আগে তো অপরাধ প্রমাণ হোক।"

মি. দাশগুপ্ত কটাক্ষ করে বলে উঠলেন, "ও রিয়েলি? আর কী প্রমাণের বাকি আছে? আসলে প্রথমবার এরকম হয়!"

কুন্তলা রুদ্র কটাক্ষ গায়ে না মেখে আদালতের কাছে সাক্ষীর বয়ানের আরজি জানালেন। আদালত অনুরোধ মঞ্জুর করলে, এক-এক করে সাক্ষী হিসাবে শেখর রুদ্র, শিবানী রুদ্র ও রুদ্র পরিবারের বাড়ির কাজের লোক মালতীকে ডাকা হল। সবারই বক্তব্য মোটামুটি একই রকম– ঘটনার দিন হসপিটাল থেকে বাড়ি ফেরার পর প্রখর রুদ্র বাড়িতেই ছিলেন। এবার সেদিনের হাসপাতালের ডিউটিতে থাকা ডা. প্রসাদকে কাঠগড়ায় ডাকা হল। কুন্তলা রুদ্র জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা ডাক্তার প্রসাদ, ঘটনার দিন আপনি প্রদোষবাবুকে বাকিদের নিয়ে হসপিটাল থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিলেন। সঠিক?"

ডাক্তার প্রসাদ একবার চারিদিকে দেখে বললেন, "হ্যাঁ।"

"সবাই একসঙ্গেই বেরিয়েছিল তো? আপনার সামনে দাঁড়ানো ওই ব্যক্তিও বেরিয়েছিল তো?"

"হ্যাঁ ওঁরা সবাই একসঙ্গেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন।"

"তারপরে আপনার সামনে দাঁড়ানো লোকটি কি ফিরে এসেছিল?"

ডাক্তার প্রসাদকে একটু বিব্রত দেখাল, "সবার খবর রাখা সম্ভব নয়। আমি রুগি দেখতে যাই। কে কখন ঢুকছে-বেরোচ্ছে দেখা আমার কাজ না।"

পিছনে বসা মি. দাশগুপ্ত খুক খুক করে হেসে উঠলেন, "বলছি কুন্তলা ম্যাডাম, আপনার হয়ে গেলে আমি কতগুলো প্রশ্ন করতে পারি? ওঁকে?" কুন্তলা রুদ্র কটমট করে তাকিয়ে বসে পড়লেন।

মি. দাশগুপ্ত শুরু করলেন, "তা মি. প্রসাদ, সেদিন যখন প্রতীককে, মানে যে ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে, সেই প্রতীককে যখন হাসপাতালে আনা হয় তখন ওর অবস্থা কীরকম ছিল? আর আপনারা কী ব্যবস্থা নিলেন?"

ডাক্তার প্রসাদ একটা বুকভরে দম নিলেন, একটু ভেবে বললেন, "লোকটির জ্ঞান ছিল তখনও। কিন্তু বেশ ঝিমিয়ে পড়েছিল। বুঝলাম তাড়াতাড়ি বমি করানো দরকার। আর সায়ানাইডের বিষক্রিয়ায় রক্তের লোহিতকণিকা ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করে বলেই শ্বাস কষ্টের একটা সমস্যা থাকে। তাই কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা করি আর ব্লাড ট্রান্সফিউশনের জন্যও ভেবেছিলাম।"

"বিপদ কি হাতের বাইরে ছিল?"

boierpathshala.blogspot.com

"একেবারেই না। আপেলের বীজের amygdalin আর পাচনরসের HCL-এর মিশ্রণ হাইড্রোজেন সায়ানাইড তো আর ইনস্ট্যান্ট তৈরি হয় না। একটু হলেও সময় লাগে। তবে আর আধ ঘন্টা দেরি হলে প্রাণহানির আশঙ্কা বাড়ত।"

"সেদিন হসপিটালে প্রখর রুদ্র আপনাকে অন্য কিছু দিতে বলেছিল। আদালতকে বলবেন কি সেটা কী?"

"সোডিয়াম থায়ো-সালফেট।"

"আপনি দিয়েছিলেন?"

"না। পাগল নাকি! একদম যখন আর কিছুই করার থাকে না তখনই সোডিয়াম থায়ো-সালফেট ব্যবহার করা হয়। এটিও যথেষ্ট শক্তিশালী একটি বিষ। একে অন্যের বিষক্রিয়াকে প্রশমিত করে বলেই ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এতে রিস্ক হল, যদি পরিমাণ বেশি-কম হয়ে যায়, মৃত্যু তখন অবশ্যম্ভাবী!"

মি. দাশগুপ্ত জজের দিকে এগিয়ে যান, "আমি মহামান্য আদালতকে অনুরোধ করব প্রতীকের পোস্টমর্টেম রিপোর্টটি দেখতে। সেখানে প্রতীকের মৃত্যুর কারণ সোডিয়াম থায়ো-সালফেট। তাই একথা সহজেই অনুমেয়, সেদিন প্রখর রুদ্রের লক্ষ্যই ছিল প্রতীকের মৃত্যু।"

কুন্তলা রুদ্র উঠে দাঁড়ালেন, "আই অবজেক্ট, মাই লর্ড! সেদিন প্রখর রুদ্র সোডিয়াম থায়ো-সালফেটের কথা বলেছিলেন বলেই তিনি কখনোই খুনি প্রমাণিত হন না। তাই যতক্ষণ না উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, ততদিন প্রখর রুদ্রর বেইল মঞ্জুর করা হউক।"

মি. দাশগুপ্ত হেসে বললেন, "এগজ্যাক্টলি, মিসেস রুদ্র। কিন্তু ওঁর সেদিনের উদ্দেশ্যটা অবশ্যই পরিষ্কার হয়। আর খুনি প্রমাণের জন্য তো এত প্রমাণ আছে। আপনার কোনটা পছন্দ বলুন? যাই হোক, মাই লর্ড, মিসেস রুদ্রর কথার সূত্র ধরেই বলি— যাদের যাদের উনি কোর্টে সাক্ষী হিসেবে পেশ করেছেন, সবাই ব্যক্তিগতভাবে ওঁর পরিচিত। সব থেকে বড় কথা, সবাই মিসেস রুদ্রর পরিবারের লোকও বটে। তাই তাদের বয়ানের উপর ভিত্তি করে কখনোই প্রখর রুদ্র নির্দোষ প্রমাণিত হন না। আমরা পারিবারিক সাক্ষীদের

boierpathshala.blogspot.com

মিথ্যে সাক্ষ্য দিতে অনেকবার দেখেছি। তাই কোনও নিরপেক্ষ ব্যক্তির সাক্ষী বা প্রমাণ ব্যতীত আদালত যেন কোনওভাবেই বেইল মঞ্জুর না করে। দ্যাট'স অল, মাই লর্ড।"

কুন্তলা রুদ্র মনে মনে ভাবতে থাকেন— পারেখ স্যার ঠিকই বলেছিলেন। আজকের দিনটা যে করে হোক, শুধু বেইলের জন্যই লড়া যাক। তারপর কিছু সময় চেয়ে নিয়ে তাগড়া প্রমাণ জোগাড় করতেই হবে। আরও কয়েক প্রস্থ সাক্ষীদের প্রশ্নপর্ব চলে দুই তরফেই। দিনের শেষে প্রখর রুদ্রর দোষী হওয়ার দিকেই এখনও পাল্লা ভারী, এই যুক্তিতে বেইল নাকচ হয়ে যায়।

* * * * * * * * *

সন্ধের দিকটা প্রখর রুদ্র সেলে এসে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল। শিবানীর জেঠুর জন্য একটু খারাপ লাগল। কিন্তু বুঝতে না দিয়ে বলে উঠল, "আরে, কী ভাবছ এত? চিন্তা কোরো না, সত্য কোনওদিন চাপা থাকে না। মা ঠিক তোমায় ছাড়িয়ে নেবে। আসলে মা অনেকদিন পর কোর্টে এল তো। একটু সময় দাও।"

প্রখর রুদ্র নিস্পৃহভাবে শিবানীর দিকে তাকাল, "সেটা চিন্তা নয়। আসলে কী জানিস, ভগবানকে আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু প্রকৃতির অদ্ভুত একটা ব্যালেন্স করার ক্ষমতা আছে। কেউ কোনও ভুল করলে তার ভুলের মাশুল তাকে দিতেই হয়।"

"ভুল? তুমি আবার কী ভুল করেছ?"

"পুরোনো পাপ... ছাড়... বাদ দে," প্রখর রুদ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

"কীসের পাপ?"

"বভ্রুবাহন, ছাড়। তুই কী কাজে এসেছিস বল?"

শিবানী মাথা নাড়ায়, "মাঝে মাঝে কী যে বলো, কিছুই বুঝি না। একটা প্যাঁচালো কেস এসেছে, যদি একটু তুমি..."

প্রখর রুদ্র মিচকি হেসে উঠল, "সে তোর হাতে ফাইল দেখেই বুঝেছিলাম।" সেলের ভিতরে রাখা একটা চেয়ারে বসে বলল, "বল দেখি..."

boierpathshala.blogspot.com

শিবানী বলা শুরু করল, "চন্দননগরে একটা পুরোনো কবর আছে। তার পিছন থেকে বেশ কিছু ছোট শিশুর মৃতদেহ পাওয়া গেছে। বেশির ভাগই গলে-পচে গেছে। সব মিলিয়ে একশো সাতাশটা। ফরেনসিক টেস্ট চলছে। সব ক-টা মৃতদেহই কালো পলিথিনে জড়ানো ছিল। মানে আর কী হসপিটালের বর্জ্যের ব্যাগেই শিশুগুলোকে ভরে... সারা শহর ব্যাপারটা নিয়ে বেশ তেতে আছে। মিডিয়া তো যা-তা গুজব ছড়াচ্ছে।"

"কী করে জানা গেল?"

"এখানেই আমার একটু সন্দেহ আছে আর কী। পোস্টমর্টেম এক্সপার্ট ডা. মিত্র নিজে লালবাজারে ফোন করে জানান যে তাঁর এক বিশেষ পরিচিত নাকি ব্যাপারটা সমক্ষে এনেছে। সে নাকি তখন ওখানে ঘুরতে গিয়েছিল। তাকে নাকি সন্দেহ কারার কিছু নেই... কিন্তু তা-ও একটা সন্দেহ তো থেকেই যায়..."

প্রখর রুদ্র নীচের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই কি অপরাধী খুঁজছিস নাকি কার মাথায় কাঁঠাল ভাঙবি তা-ই খুঁজছিস?"

শিবানী একটু অবাক হয়ে বলল, "মানে?"

"মানে যারা আসল অপরাধী, তাদেরই ধরতে চাস নাকি চারিদিকের প্রেশারে যাকে সামনে পাবি, তাকেই সামনে দাঁড় করিয়ে দিবি?"

শিবানী মুখ ফুলিয়ে ফেলল, "আমি কি তা-ই বললাম? কিন্তু যে লোকটা ব্যাপারটা খুঁজে পেয়েছে, তাকে তো একটু সন্দেহ হবেই। তার নামটাও অদ্ভুত। ভূতনাথ শাস্ত্রী।"

প্রখর রুদ্র একটু হেসে বলল, "তা বেশ। কিন্তু কতকগুলো স্ট্রং লজিক্যাল রিজন আছে লোকটিকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাইরে না রাখলেও, নীচের দিকে করে দেওয়াই যায়।"

"যেমন?"

প্রখর রুদ্র চেয়ারের উপর হেলান দিয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করল, "একশো সাতাশটা সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যু। কীরকম সাংঘাতিক ব্যাপার বুঝতে পারছিস? যে এর সঙ্গে জড়িত, সে শুধু শুধু ঠিক কী কারণে এই

boierpathshala.blogspot.com

অপরাধকে সবার সামনে আনতে চাইবে?"

শিবানী একটা চক্কর মেরে বলল, "অনুশোচনা! হয়তো এতদিন পর নিজের ভুল বুঝতে পেরে সবার সামনে ব্যাপারটা নিয়ে আসতে চাইছে।"

"ঠিক মিলছে না। অনুশোচনা হলে সে পুলিশের কাছে এসে আত্মসমর্পণ করত, তার সঙ্গীদের নাম নিজেই দিত। পুলিশের সঙ্গে এরকম রহস্য-রহস্য খেলত কি? কাল তার সঙ্গীরা ধরা পড়লে কি তার সঙ্গীরা তাকে ছেড়ে দেবে? আর পুলিশের সঙ্গে যদি লুকোচুরি খেলারই ইচ্ছে থাকত, তাহলে এতটা নিজেকে কি আর সামনে আনত? না রে, আমার মনে হচ্ছে, আপাতত লোকটাকে জেরাটা চালিয়ে যা যদি কিছু ইনফর্মেশন পাওয়া যায়। কিন্তু খুব বেশি সন্দেহজনক দেখছি না। আর কিছু পেলি?"

শিবানী একটু চিন্তিত মুখে বলল, "তবে এই ভূতনাথ শাস্ত্রী লোকটা বেশ কাজের। পোস্টমর্টেম হেল্পার ডা. মিত্রের। আমরা যাওয়ার আগেই দু-তিনটে বডি ওখানেই দেখে বলে দিল, ও যে চার-পাঁচটা বডি চেক করেছে, সবক-টা সদ্যোজাত বাচ্চার আর না হলে তারা হয়তো ভূমিষ্ঠ হয়নি, তার আগেই..."

"দেন হি মাস্ট বি গুড ইন হিজ ওয়ার্ক। আমি অ্যানাটমির ব্যাপারে বিশেষ জ্ঞান যদিও রাখি না," প্রখর রুদ্র ঠোঁট উলটে বলল।

শিবানী এবার একটু মুচকি হেসে বলল, "তা বলা যায়। আমাকে বুঝিয়েও বলল তো। মানুষের শিরদাঁড়ায় নাকি চারখানা কার্ভ থাকে— Cervical, Thoracic, Lumbar, Sacral। এগুলোর মধ্যে নাকি Thoracic আর Sacral আমাদের জন্মের আগে ভ্রূণ অবস্থাতেই তৈরি হয়ে যায় আর বাকি দুটো নাকি মোটামুটি আমরা হাঁটতে শেখার পর। যে দেহগুলো পাওয়া গেছে তাঁদের ওই বাকি দুটো কার্ভ নেই। গুগল করে দেখলাম। গুগলও তা-ই বলছে।"

প্রখর রুদ্র ঠোঁট চেপে চোখ বড় বড় করে বলল, "ইমপ্রেসিভ!"

"কিন্তু কথা হল, এবার কী করব? সেটা তো বলো?"

"দেখ, টিভি থেকে পেপার সব জায়গায় খরবটা নিয়ে লেখা লিখি হচ্ছে। বলাই বাহুল্য, এরা কিছুদিন চুপ থাকবেই। আর এদের হাতেনাতে ধরতে না পারলে আপাতত তো খুব বেশি এভিডেন্স তোদের হাতেও নেই।"

boierpathshala.blogspot.com

"হ্যাঁ, সেটায় পৌঁছোই কী করে?"

"যেখানে ব্যাপারটা ঘটেছে, তার দশ থেকে বারো কিমি রেডিয়াসের সব হাসপাতাল, ক্লিনিকের লিস্ট জোগাড় কর। আমার মনে হয় না-এর থেকে দূরে কোথা থেকে এসে ভ্রূণগুলোকে ওই কবরখানায় রেখে যাবে কেউ! খুব দূর থেকে এলে প্রত্যেকটা ভ্রূণ একবার করে আনার তুলনায় একবারে অনেকগুলো করে আনতে হত। সেক্ষেত্রে যে কারওই চোখে পড়ার সম্ভাবনা থাকতই। তাই আপাতত আট-দশ কিমি রেডিয়াস ধরেই এগো। তারপর দেখা যাক কী হচ্ছে।"

শিবানী ঠোঁট উলটে বলল, "সে তো বুঝলাম। কিন্তু কী ধরে এগাব?"

"তিন-চার মাস ওয়েট করে যা। তারপর সোর্সদের নামিয়ে দে। নকল রুগি সাজিয়ে সব হসপিটাল আর ডাক্তারদের কাছে পাঠা। আর এভিডেন্স হিসাবে আর কী কী পাওয়া গেছে?"

"আর হসপিটালের বর্জ্য যেমন হয়— তুলো, গজ, ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ আর এটা-সেটা কাগজ। বেশির ভাগ কাগজপত্রই যদিও পচে-গলে গেছে। শুধু কয়েকটা বোধহয় গত সপ্তাহে পোঁতা। সেটার কাগজপত্রগুলো এখনও আস্ত আছে, শুধু পেনের কালি-টালিগুলো উঠে গেছে অনেকটাই। তবে ছাপা অক্ষরে কিছু হসপিটালের নাম পেয়েছি। সেগুলোর পিছনে লোক লাগিয়েছি।"

প্রখর রুদ্র একটু চিন্তা করে বলল, "ওই কাগজগুলোর EDD টেস্ট কর।"

"কী টেস্ট?"

"Electrostatic Detection Device। বহুলপ্রচলিত নাম হল ESDA। কাগজের উপর কিছু লিখলে তার একটা প্রেশার পড়ে। এই টেস্টের মাধ্যমে সেই প্রেশার পয়েন্টগুলো ভিজিবল করা হয়। পুরোনো গোয়েন্দা গল্পে পড়িসনি? গোয়েন্দা একটা লেখার প্যাডে পেনসিলের গ্রাফাইট ঘষে আগে যা লেখা হয়েছিল, সেটা দৃশ্যমান করে তোলে। এটা সেটারই আধুনিক রূপ। তবে এটায় মূল কাগজটার কোনও ক্ষতি হয় না। একটা ভ্যাকুয়াম প্লেটের উপর কাগজটা রেখে তার উপর খুব পাতলা পলিথিন দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়। তারপর ওটার উপর দিয়ে চার্জ স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি ঘোরানো হয়।

boierpathshala.blogspot.com
POCO SHOT BY MOTAVISH 2021

তারপর টোনার পাউডার ছড়িয়ে দিলে ওই উপরের পলিথিনটার উপর ওই অদৃশ্য ইমপ্রেশনগুলো ফুটে ওঠে। আর কাগজটার কোনও ক্ষতি হয় না। ফরেনসিকে ওগুলো পাঠিয়ে দেখ, যদি কিছু পাওয়া যায়।"

* * * * * * * *

ফরেনসিকের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে ড. গাঙ্গুলি ইন্টারকমে শিবানীকে ধরলেন, "হ্যালো, রুদ্র ম্যাডাম?"

"ড. গাঙ্গুলি, বলুন..."

"সব ডকুমেন্টই প্রায় পরীক্ষা করা হয়ে গেছে। বেশির ভাগই পচে এমন অবস্থা— সেগুলোর কিছু করা যায়নি। ওই আর কী সব মিলিয়ে গোটা কুড়ি করা সম্ভব হয়েছে। খুব বেশি কিছু যে পাওয়া গেছে এমনও না। আসলে অনেকদিন মৃতদেহের সঙ্গে থাকার জন্য বডি ফ্লুয়িডের কারণে সেভাবে কিছু উদ্ধার করা হয়নি। তা ছাড়া বেশির ভাগই তো ছিল প্রেসক্রিপশন। তাই রোগীদের নাম আর গাদাগুচ্ছের ওষুধের নাম ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি। আমি সব ছবি তুলে পাঠিয়ে দিয়েছি। দেখুন যদি আপনার কোনও হেল্প হয়।"

"ওকে। থ্যাঙ্কস..."

কিছুক্ষণের মধ্যেই কনস্টেবল কানু ঘরে ঢুকল, "ম্যাডাম। ডঃ গাঙ্গুলি পাঠালেন। এই হল ফাইল। আর ছবি সব বললেন আপনাকে মেল করে দিয়েছেন।"

শিবানী যদিও এর মধ্যেই মেল খুলে দেখতে শুরু করে দিয়েছে। একবার কানুর দিকে তাকিয়ে বলল, "দীপক আর কর্মকারবাবুকে এক ঘণ্টা পর চ্যাটার্জি স্যারের ঘরে আসতে বলে দাও। মিটিং আছে।"

এক ঘণ্টা পর প্রদোষ চ্যাটার্জির ঘরে তিনজন উপস্থিত হল। শিবানী সংক্ষেপে সব ব্রিফ দিল। আর মিস্টার গাঙ্গুলির রিপোর্টের ব্যাপারটাও জানাল। সব শুনে মি. চ্যাটার্জি বললেন, "শিবানী, সবই বুঝলাম। কিন্তু এবার কী করবে ভাবছ? মিডিয়া খুব চাপে রেখেছে। উপরের থেকেও আমার উপর চাপ, বুঝতেই পারছ। তাড়াতাড়ি কিছু একটা না করতে পারলে যে..."

boierpathshala.blogspot.com

শিবানী বলে উঠল, "সত্যি বলতে স্যার, তাড়াতাড়িতে একটু সমস্যা আছেই। হয়তো কালপ্রিটরা এখন ক-দিন চুপচাপ থাকবে। তাই তাদের এখন ধরা শক্ত। মিডিয়াতে ব্যাপারটা একটু ঠান্ডা হলে তবেই আমরা আমাদের অপারেশনের ফাইনাল স্টেজে যেতে পারি।"

প্রদোষবাবু চোখ বড় বড় করে বললেন, "তার মানে এখন এ কেসটা ফেলে রাখবে বলছ? আই কান্ট অ্যালাও দ্যাট!"

"না না। ফেলে রাখব না। এখন ব্যাপারটা আমরা একটা টেক্সট বুক প্যাটার্ন তদন্ত করে চুপ করে যাব। যাতে আমাদের মূল লক্ষ্য হবে যত বেশি তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ডা. গাঙ্গুলির পাঠানো ছবিগুলো থেকে বেশ কিছু রুগির নাম উদ্ধার হয়েছে। ওই অঞ্চলের যতগুলো ডাক্তারখানা আছে, সেখান থেকে আমাদের এই রোগীদের ডিটেলস খুঁজে বের করে তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আর প্রেসক্রিপশনে যেসব ডাক্তারের নাম পাওয়া গেছে, তাদের উপর নজর রাখতে হবে। এদের মধ্যে কিছু প্রেসক্রিপশন আছে, যাদের থেকে কোনও নাম উদ্ধার সম্ভব হয়নি। কিন্তু ডাক্তাদের সই পাওয়া গেছে। আমাদের একটা বড় টিম লাগবে, যারা ঘটনাস্থলের আশপাশের সব প্রসূতি ও শিশু বিশেষজ্ঞের কাছে ছদ্মবেশে যাবে। তাদের প্রেসক্রিপশন নিয়ে আসবে। আমাদের হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্ট দিয়ে একবার চেক করিয়ে নেওয়া হবে, যাদের নাম পাওয়া যায়নি, তাদের মধ্যে আমরা কোনও ডাক্তারকে আইডেন্টিফাই করতে পারলাম কি না। লম্বা প্রসেস, প্রচুর পরিশ্রম। কতদিন লাগবে জানি না। বাট এটাই একমাত্র পসিবল অপশন দেখছি আমি। এবার আপনি যা বলেন..."

প্রদোষ চ্যাটার্জি কিছুক্ষণ কী যে ভাবলেন, তারপর বললেন, "পুলিশ সরাসরি গিয়ে হাসপাতালগুলোয় তল্লাশি চালালে কালপ্রিটগুলো বুঝে-শুনে আমরা যে রুগিদের ডিটেলস পেতে চাইছি, তাদের নাম চেপেও যেতে পারে। ফলে আমরা কোনওদিনও ওই সমস্ত রুগির কাছে পৌঁছোতে পারব না। বস্তুত দেখতে গেলে আমরা খড়ের গাদায় সুঁচ খুঁজতে যাচ্ছি। আদৌ ওই নামের রুগিদের আমরা পাব কি না জানি না, একই নামের ক-জন আছে জানি না, তা বলে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা তো যায় না। তাই তোমার প্ল্যান চলুক। তবে হাসপাতালে

boierpathshala.blogspot.com

রুগিদের খোঁজে সরাসরি পুলিশ যাচ্ছে না।"

শিবানী একটু যেন বিরক্ত হল, "তাহলে?"

প্রদোষ চ্যাটার্জি উঠে টেবিলের ফোনের কাছে গেলেন, "আমি স্বাস্থ্য দপ্তরে ফোন করেছি। ওরা রুটিন ভেরিফিকেশনে যাবে। যাতে ওখানকার কালপ্রিটগুলো কোনও সন্দেহই না করে। ওরাই সব রুগির ডিটেলস নিয়ে আসবে," ফোনটা কানে দিয়ে শিবানীর দিকে ফিরে বললেন, "কাল সকাল দশটায় ওদের সঙ্গে মিটিং রাখছি। কোনও স্পেশাল ইনস্ট্রাকশন বা বিশেষ কিছু লক্ষণীয়, সেসব কাল ওদের বুঝিয়ে দিয়ো। ঠিক সকাল দশটা।"

* * * * * * * * *

পরের প্রায় আড়াই মাস স্বাস্থ্যকর্মীদের সংগ্রহ করে আনা রোগীদের নামের লিস্ট থেকে অভীষ্ট রোগীদের খুঁজে বার করা হল। সবাইকে যে পাওয়া গেল তা নয়। তাদের সবার বাড়ির লোকের সঙ্গে দীপক, কর্মকারবাবুরা কথা বলেছেন। শিবানীও আলাদা করে মহিলাদের সঙ্গে দেখা করে তাদের বয়ান নিয়েছে। শিবানীর সোর্সরা এদিকে বিভিন্ন হসপিটাল আর ক্লিনিক ঘুরে সব মিলিয়ে আটজন সম্ভাব্য অপরাধী ডাক্তার চিহ্নিত করেছে। কিন্তু হাতে এখনও কোনও শক্তিশালী প্রমাণ নেই যার উপর ভিত্তি করে ওঁদের গ্রেপ্তার করা যেতে পারে।

আজ বিকালে আবার প্রদোষ চ্যাটার্জির ঘরে মিটিং বসেছে। শেখর রুদ্রও আছেন মিটিং-এ। প্রদোষবাবুই শুরু করলেন, "কী হে শিবানী, আর কত দূর? আদৌ কিছু হবে নাকি? মিডিয়াও তো ঠান্ডা হয়ে গেছে। তা আর কতদিন?"

শিবানী একটু মুষড়ে পড়েছে যেন, "কী বলব স্যার। আমরা জান লড়িয়ে দিয়েছি, তা-ও একটাও জালে উঠছে না।"

শেখরবাবু বললেন, "রোগীদের সঙ্গে কথা বলে কিছু পেলি না?"

শিবানী দাঁত দিয়ে নখ খেতে খেতে বলল, "কিছু কোইনসিডেন্স আছে। সেগুলোকে খটকা বলা যায় কি না আমি সিয়োর না। যেমন এদের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বেশির ভাগই মুখ খুলতে চায় না ঠিক। ওই দায়সারা গোছের উত্তর দিয়েছে। এইসব মহিলার সঙ্গে আলাদা করে দেখা করে কথা বলে দু-রকম

boierpathshala.blogspot.com

2021/5/8

বুঝলাম। এক, যারা নিজেরাই গর্ভপাত করাতে গিয়েছিল। আর দ্বিতীয় ধরন নিয়েই একটু চিন্তার। এদের নাকি জ্ঞান ফেরার পর ডাক্তার-নার্স বলেন যে মৃত সন্তানের জন্ম দিয়েছিল, আর শ্বশুরবাড়ির লোক হাসপাতালের মেডিক্যাল স্টাডি ডিপার্টমেন্টের জন্য বডি দান করে দিয়েছে। এই সমস্ত মা তাদের মৃত সন্তানদের মুখ অবধি দেখেনি। এই সব মহিলার কাছ থেকেও আমরা ওঁদের ডাক্তারদের নাম, হসপিটালের নামও সংগ্রহ করেছি।"

প্রদোষবাবু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, "আমরা শত চেষ্টা করলেও প্রমাণ করতে পারব না, সত্যি ওদের সন্তানগুলো মৃত জন্মেছিল নাকি জীবিত! যাই হোক, আর ডাক্তারদের কী খবর?"

শিবানী দীপকের দিকে দেখতেই দীপক অসহায়ের মতো বলল, "কী বলব স্যার। আমাদের চেনাজানা দুই-তিন মাসের গর্ভবতী মহিলাদের সঙ্গে করে এদের কাছে নিয়ে গিয়ে আমরাই আগ বাড়িয়ে বলি, মেয়ে হতে চলেছে। আমরা চাই না। প্লিজ, একটা কিছু যদি করা যায়। কিন্তু কী অদ্ভুত বলব কি স্যার, এঁরা সবাই উলটে আমাদেরকেই জ্ঞান দেন, ধমকে দেন। আমাদের কারও কারও তো ফোন নম্বরও নিয়ে রেখেছেন। বলেছেন, ফোন করে সময় সময় খবর নেবেন। কিছু হলে ওঁরাই নাকি পুলিশকে খবর দেবেন। কী ফ্যাসাদ বলুন দেখি স্যার! আবার প্রত্যেক মাসে ফোন করে ওঁদের ওখানেই দেখাতে যেতে বলছেন রুটিন চেক আপে। আমরা যেসব ভলেনটিয়ার মহিলাকে নিয়ে গিয়েছিলাম, তাঁরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠে আমাদের গাল-মন্দ করছেন।"

শেখর রুদ্র যেন কোথাও হারিয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ করে কিছু মাথায় আসার মতো চোখ বড় বড় করে বললেন, "প্রেসক্রিপশনে যাদের নাম ছিল, তাদের মধ্যে কিছু মহিলার গর্ভপাত হয়েছিল। তাদের ডাক্তারদের নাম জানা হয়েছে?"

দীপক বলল, "হ্যাঁ স্যার শিবানী ম্যাডাম যেমন বলল, মহিলাদের থেকে পাওয়া নাম আর ফরেনসিকের থেকে পাওয়া নাম— সব মিলিয়েই ওই আটজনকে আমরা মার্ক করেছিলাম। কিন্তু কেউই মুখ খোলে না। মনে হচ্ছে স্যার, আমরা ভুল পথে..."

boierpathshala.blogspot.com

দীপককে মাঝপথে থামিয়ে শেখর রুদ্র বললেন, "যেসব ডাক্তার গর্ভপাত করতেন, তাঁরাও অনীহা দেখাচ্ছেন?"

প্রদোষবাবু মাথায় কিল মারতে মারতে শেখরবাবুর উদ্দেশে বললেন, "ওসব কিছু না, স্যার। সব এখন ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির সাজছে। পুলিশ যে তলে তলে তদন্ত চালাচ্ছে, ব্যাটারা মনে হয় জেনে গেছে।"

শেখরবাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "অত অধৈর্য হোয়ো না।"

শিবানী দিকে ফিরে বললেন, "যাদের গর্ভপাত হয়েছে, তাদের মোটামুটি কতমাসের মাথায়?" শিবানী একটু ভেবে বলল, "ওই সাত-আট মাস।"

"খেয়াল কর ভালো করে বানী। প্যাটার্নটা। সাত-আট মাস। মানে বেআইনি গর্ভপাত। দীপক যা বলল, তাতে তোরা সব দুই-তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বাদের নিয়ে গিয়েছিলি।"

দীপক বলে উঠল, "হ্যাঁ স্যার। গর্ভপাত করাতে হলে ওটাই তো ঠিক সময়। না হলে তো শুনেছি মায়ের লাইফ রিস্ক হয়ে যায়! কোনও ডাক্তারই প্রায় সেই রিস্কটা নিতে চান না। সেইজন্যই তো ওই দুই-তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদেরই নিয়েই গিয়েছিলাম।"

"বাট দে আর রিস্ক টেকারস। ওরা বেআইনি গর্ভপাতই করছে। সেটা বেশ জ্ঞানতই। কারণ, জানি না। কিন্তু আমাদের মনে হয়, সাত-আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে আরও একবার চেষ্টা করা উচিত।"

শিবানী এবার জিভ কেটে বলল, "এ বাবা, এটা সত্যি আমি মিস করে গিয়েছিলাম," কর্মকারবাবুর দিকে ফিরে বলল, "কর্মকারবাবু, আজই গোটা আট-দশ এরকম স্বেচ্ছাসেবক জোগাড় করুন।"

দীপক হেসে বলল, "চিন্তা করবেন না ম্যাডাম। আমার বউদির আট মাস চলছে। কাল সকালেই একটা হাসপাতালে নিয়ে চলে যাব। দেখি যদি কিছু পাই!"

শিবানী বলল, "ঠিক আছে। ব্যাকআপের জন্য কানু আর আমি থাকব। নো প্রবলেম।"

* * * * * * * *

boierpathshala.blogspot.com

পরদিন দীপক তার বউদিকে সবটা বুঝিয়ে দিয়ে লালবাজারে নিয়ে সকালসকাল এল, সঙ্গে দীপকের দাদাও এসেছে। সেখান থেকে একটা স্কোরপিও করে শিবানী আর কানু মিলে সবাই একসঙ্গে চন্দননগরের দিকে রওনা দিল। লোকাল থানাকে যদিও প্রদোষবাবু আগেই ফোন করে দিয়েছেন।

সকালবেলার খালি দিল্লি রোড ধরে কানু ঝড়ের গতিতে গাড়ি ছোটাল। সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ তাদের গন্তব্য হাসপাতালের কিছুটা দূরে গাড়ি থামল। গাড়ি থেকে দীপক আর দীপকের বউদি নামল। কানু, শিবানী আর দীপকের দাদা গাড়িতেই অপেক্ষা করতে লাগল। দীপক পকেটে ফোন অন করে ডাক্তারের ক্লিনিকে ঢুকল। ক্লিনিকের বাইরে বড় বড় করে লেখা 'ডা. বিনয় রক্ষিত'। ক-দিনের না-কাটা দাড়িতে আর ময়লা পোশাকে দীপককে দেখে বেশ অভাবী ঘরের বলেই বোধ হচ্ছে। ক্লিনিকে ঢুকেই দীপক বিনয়ের অবতার হয়ে দু-হাত জোড় করে বলল, "ডাক্তারবাবু, আমার বউডা পোয়াতি হইছে। আমাগো খুব অভাবী সংসার। ক-ডিন অ্যাইগা জানতি পারলুম নাকি আমাগো একটা মাইয়া হবে। বলছিলাম কী, কি-স্-ছু করা যায় না? মানে আমাগো চাই না..."

ডাক্তারটি একটু সন্দেহের চোখে তাকালেন, "ক-মাস চলছে?"

দীপকের বউদি উত্তর দিল, "তা সাত মাস।"

ডাক্তার চোখ বড় বড় করে বলল, "পাগল নাকি? সাত মাসে কত রিস্ক জানো তোমরা? সব মূর্খ। আর আমি কোনও পুলিশের হাঙ্গামায় নেই।"

দীপক হাসি-হাসি মুখ করে বলল, "ইডা কী বলছেন! পুলিশে আমরা কে-ন যাব?"

ডাক্তারটি দীপকের বউদিকে পরের পনেরো মিনিট ভালো করে পরীক্ষা করে বলল, "দেখো তোমাদের বাচ্চা, মেয়ে ঠিকই। কিন্তু বেশ হেলদি। এসবের চক্করে যেয়ো না। বাড়ি যাও। ওষুধ কতকগুলো দিচ্ছি। বউয়ের দিকে নজর রাখো। দুধ, ডিম ভালো খাওয়া দরকার এই সময়টা। এবার তোমরা এসো।"

দীপক আরও একবার চেষ্টা করল, "সত্যি হবেনি গো ডাক্তারবাবু?"

ডাক্তারটির মুখে প্রসন্ন হাসি, "একটা জীবনের দাম জানো? যাও বাড়ি যাও।"

boierpathshala.blogspot.com

দীপক আর দীপকের বউদি হসপিটালের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শিবানীকে ফোনে ধরল। দীপক কিছু বলার আগেই শিবানী রেগে চেঁচিয়ে উঠল, "তোমাকে এসব ওভারঅ্যাক্টিং করতে কে বলেছিল? মানে তুমি কি এটা তোমার গ্রুপ থিয়েটার ভাবছিলে?"

দীপক কোনওমতে বলল, "না, আসলে আমি ভাবলাম..."

"তোমায় ভাবতে কে বলেছে? পুরো প্ল্যানটাই যাচ্ছেতাই করে দিলে। নাও, এবার গাড়িতে এসে আমায় কৃতার্থ করো। পরের হসপিটালে যেতে হবে।"

দীপকরা এর মধ্যেই বড়রাস্তার উপরে এসে গেছে, "সরি ম্যাডাম। আর এরকম হবে না।"

হঠাৎ একটা অটো এসে সামনে দাঁড়ায়, "এই অবস্থায় হাঁটবেন না দিদি। চলুন দাদা, আপনাদের পৌঁছে দিই। বেশি নেব না। আপনারা যা ভালো বোঝেন, দেবেন।"

দীপক একটু বিরক্ত হয়ে অটোওয়ালার দিকে তাকায়। এর মধ্যেই ফোনের উলটোদিক থেকে শিবানীর গলা, "অটোটাতে উঠে পড়ো। অটোর মধ্যেও তোমার অভিনয় প্রতিভা বজায় রাখবে। শুধু ওই ওভাররেটেট ডায়ালগগুলো প্লিজ না।"

দীপক বউদির দিকে তাকিয়ে অসহায়ের মতো অটোতে উঠে পড়ে। অটোতে উঠতেই হাসি-হাসি মুখ করে আবার অটোওয়ালার প্রশ্ন, "প্রথম বাচ্চা আপনাদের?"

পিছনে বসা দীপক বিরক্ত হয়ে উত্তর দেয়, "হ্যাঁ।"

"তাহলে তো খুশির খবর। সামনে মিষ্টির দোকানে দাঁড় করাই?"

দীপক খেঁকিয়ে ওঠে, "বেশি না বকে অটো চালাও তুমি। আমি মরছি আমার জ্বালায় আর... তোমার ছেলে মেয়ে আছে কিছু?"

"হ্যাঁ স্যার, আছে তো। একটা ছেলে..."

"সেইজন্যই। মেয়ে হলে বুঝতে কী জ্বালা। প্রথম সন্তানের খুশি! মেয়ে হলে এত খরচ, বুড়ো বয়সে দেখারও কেউ হবে না। কী যে করব ভেবে পাচ্ছি না আর ওনার মিষ্টি চাই!"

boierpathshala.blogspot.com

অটোওয়ালার চোখে কেমন যেন একটা পৈশাচিক আনন্দ ঝিলিক দিয়ে উঠল, "সন্তান যখন আপনার, আপনাকে নিতে তো হবেই। এসব বলে কী লাভ। মেয়ে হল লক্ষ্মীর রূপ বুঝলেন কিনা! তা আপনি কি চান না যে মেয়েটা হোক?"

দীপক কপট রাগের ভঙ্গি করে, "শখ করে কেউ হাঁড়িকাঠে মাথা দেয় না-বুঝলে। উপায় থাকলে এ বাচ্চা রাখতাম না। কিন্তু কী আর করব..."

মহিলাটা এতক্ষণে নিরুপায়ের মতো বলে, "ওভাবে কেন বলছ বলো? ও তো তোমারও সন্তান।"

"তুই চুপ কর। খরচ কি তোর বাবা দেবে? একটা ছেলে দিতে পারলি না?"

অটোওয়ালা সমবেদনা জানায়, "আহা, বউদিকে কেন বকছেন? এসব তো ভগবানের দান। তবে চাইলে ভুল ঠিক করা যেতেই পারে।"

দীপক যেন অন্ধকারে আলোর ছোট্ট বিন্দু দেখতে পেল, "মানে?"

"দেখুন, এসব কথা আমি কাউকে বলি না। নেহাতই আপনাদের দাদা-বউদি বললাম তাই নিজের ভেবে বলছি। না হলে এসব তো বেআইনি। নেহাত আপনারা খুব বিপদে পড়ে গেছেন মনে হচ্ছে। তাই নিজের মনে করেই বলছি। বাকিটা আপনাদের ইচ্ছে।"

"আরে ভাই, কী, সেটা তো বল?"

অটোওয়ালা একটু গলা নামিয়ে নেয়, "আমার এক চেনা ডাক্তার আছেন। তাঁকে আমি রিকোয়েস্ট করলে তিনি হেল্প করতে পারেন। আপনারা যদি যেতে চান, নিয়ে গিয়ে কথা বলিয়ে দিতে পারি। যাবেন নাকি?" অটোটা একটা ইউ-টার্ন নিয়ে যেদিক থেকে আসছিল, আবার সেদিকেই ফিরতে থাকে।

* * * * * * * *

সন্ধেবেলা প্রখর রুদ্রর সেলে শিবানী এল, "তিন মাসের পরিশ্রম এতদিনে সার্থক হল। অবশেষে ওই তিন মাস আগের কেসটা সল্‌ভ হল। তাই তোমাকে জানাতে এলাম।"

"কোন কেসটা? ওই একশো সাতাশটা সদ্যোজাত শিশুর হত্যা?"

boierpathshala.blogspot.com

"হ্যাঁ ওটাই।"

"বাঃ, এ তো ভালো খবর। তা কী করে ধরলি?" শিবানী এতদিনের তদন্তপদ্ধতি সব বিস্তারিত বলল। আজ সকালের দীপক আর তার বউদির অভিযানের কথাও বলল। সব শুনে প্রখর রুদ্র বলল, "সে তো হল। কিন্তু অটোওয়ালাই কি তোদের সব ডাক্তারকে ধরিয়ে দিল?"

শিবানী মুচকি হেসে বলল, "হ্যাঁ। ওই অটোওয়ালাই ওই হাসপাতালেরই অন্য এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে দীপককে নিজের জামাইবাবু বলে পরিচয় দিয়ে গর্ভপাত করিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করল।"

"বাপ রে, একেবারে জামাইবাবু?"

"আরে, ওসব কিছুই না। সব অভিনয়। যাতে রুগির বাড়ির লোক বুঝতে না পারে। ওই ডাক্তারটিও কিছুক্ষণ অভিনয় করে তারপর অনেক টাকার পরিবর্তে রাজি হলেন। ওঁর যুক্তি যেহেতু বড় অপারেশন করতে হবে। এরপর কাউন্টারে টাকা জমা করে দিতেই আমরা গিয়ে গ্রেপ্তার করলাম। অটোওয়ালাটাকে কয়েকটা উত্তম-মধ্যম দিতেই স্বীকার করল, সব কিছুর সঙ্গে হসপিটালের ডা. রক্ষিতও জড়িত। তিনিই রুগি দেখে ঠিকঠাক বুঝে নিজে রুগিদের না করে দেন। তারপর হসপিটালের বাইরে এরকম অটোওয়ালা, চা-ওয়ালার মতো দালাল আছে। তাদের উনি ফোন করে দেন। তারাই অন্য ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। ডা. রক্ষিতকে কড়া করে জেরা করতে আরও কিছু নাম পাওয়া গেছে। সবাইকে এখনও গ্রেপ্তার করা হয়নি। তবে আজ রাতের মধ্যেই হয়ে যাবে।"

প্রখর রুদ্র একটু মুচকি হেসে বলল, "তোর অটোওয়ালাকে সন্দেহ হয়েছিল কী করে? দীপককে অটোটা নিতে বলেছিলি বললি।"

শিবানী একটু লাজুক হেসে বলল, "আসলে যেসব রুগির সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম, তাদের সবার সঙ্গেই কথা বলে একটা কমন ব্যাপার খেয়াল করেছিলাম। যাঁরা গর্ভপাত করিয়েছিলেন, তাঁরা কোথাও ডাক্তারের থেকে সরাসরি ডিল করেননি, হঠাৎ করেই কেউ অটোওয়ালার মাধ্যমে বা কেউ সামনের চায়ের দোকানদারের মাধ্যমে। তাই সকালে দীপকের সামনে অটোটা এসে দাঁড়াতেই আমার মাথায় একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। মনে হল, একটা

boierpathshala.blogspot.com

চান্স নিয়েই দেখি।"

প্রখর রুদ্র শিবানীর মাথায় আস্তে টোকা মেরে বলে, "ব্রেভো। এই তো শিখছিস, আর সাত-আট মাসে গর্ভপাতে ব্যাপারটা?"

শিবানী বিরক্ত মুখে বলল, "কিচ্ছু না। টাকা লোটার ধান্দা। একটা অপারেশন করবে। সেটা দেখিয়ে বেশ মোটা টাকা দাঁও মারা যাবে। দু-তিন মাসে অন্তঃসত্ত্বার ক্ষেত্রে তো আর সেটা হবে না।"

"বুঝলাম। আর ওই মৃত বাচ্চা জন্মের ব্যাপারটা?"

শিবানীকে এবার কেমন যেন মুষড়ে পড়ল, "কী বলব বলো! এখনও আমরা কোথায় বাস করছি! ডা. রক্ষিতকে জিজ্ঞাসা করতে উনি বললেন, যেসব মহিলার ডেলিভারি ওদের হাসপাতালে হত, তাদের বাড়ির লোকেদের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করতেন সার্জারির আগে থেকেই। যদি সেরকম বুঝতেন তাহলে মহিলাটির শ্বশুরবাড়ির লোকেদের প্রস্তাব দিতেন যে ওঁরা কন্যাসন্তান জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে মৃত বলে ঘোষণা করে যাবতীয় যা কাগজপত্র দরকার তা-ও করে দেবেন। শুধু একটু টাকা বেশি লাগবে। আর মহিলার শ্বশুর বাড়ির লোকেরাও রাজি হয়ে যেত," শিবানীর গলায় বুজে এল, "ওইটুকু ছোট্ট বাচ্চা, এরা কি মানুষ!"

প্রখর রুদ্র শিবানীর মাথায় হাত রাখল, "পৃথিবীর সব থেকে হিংস্র প্রাণী কারা জানিস তো," শিবানী চোখ তুলে তাকায়। প্রখর রুদ্র বলে চলে, "মানুষ... মানুষ... মানুষ... যা-ই হোক, যে লোকটির জন্য এই জঘন্য অপরাধ সামনে এল, পারলে তাকে একটা ধন্যবাদ দিস।" শিবানী শুকনো মুখে বলল, "হ্যাঁ ভূতনাথবাবু। বেশ ভালো লোক। শুনলাম, আজ বিকালে আমি যখন ইন্টারোগেশন রুমে ছিলাম তখন এসেছিলেন। স্যারের কাছে সব শুনে নাকি কেমন একটা চুপচাপ মেরে গিয়েছিলেন। তারপর নাকি কিছু না বলেই বেরিয়ে গেছেন। তবে আমি এখনও ক্লিয়ার নই ভূতনাথবাবু সেদিন চন্দননগরের পুরোনো কবরখানায় ঠিক কী করতে গিয়েছিলেন?"

boierpathshala.blogspot.com

চক্রব্যূহে চৈতন্য

মহিলাটি একটু লাজুক হেসে তার পুরুষ সঙ্গীটিকে জড়িয়ে ধরল। পুরুষটিও মহিলাটির কোমর একহাতে জড়িয়ে ধরল, অন্য হাতে ঘরের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ল। নারীর ঠোঁট ততক্ষণে পুরুষের ঠোঁট ছুঁয়েছে। বসার ঘর ছেড়ে তারা শোবার ঘরের দিকে অগ্রসর হলো। ঘরের ভিতরে ঢুকতেই কেউ একটা পুরুষটির মাথায় সজোরে মারল— পুরুষটি মাটিতে ধপ করে পড়ে গেল আর মহিলাটি ভয়ে চিৎকার করে উঠল। অন্ধকারের মধ্যে থেকে একটা মাঝারি উচ্চতার লোক সামনে এসে দাঁড়াল। মহিলাটি আর কিছু করার আগেই জাপটে ধরে তাকে বিছানায় পেড়ে ফেলল। মেঝেতে পড়ে-থাকা পুরুষটির জ্ঞান ফিরতে, সে সবকিছু ঝাপসা দেখতে লাগল। ঘরের মধ্যে একটা চাপা গোঙানির শব্দ। ঝাপসা চোখে সে দেখতে পেল, তার সঙ্গিনীটি বিছানার সঙ্গে বাঁধা আর একটা লোক অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। পুরুষ সঙ্গীটি বুকে ভর দিয়ে উঠে ড্রয়ার থেকে তার রিভলভারটা বের করে টালমাটাল পায়ে উঠে দাঁড়ায়। বিছানার উপরের লোকটির দিকে তাক করে, গুড়ুম। বিছানার উপরের লোকটি বিছানা থেকে উলটোদিকে পড়ে যায়। লোকটি বিছানার ওপাশ থেকে কোনওমতে উঠে দাঁড়িয়ে ছুরি হাতে খাটের পায়ের দিক থেকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে এসে পুরুষটির সামনে দাঁড়ায়। ভয়ে পুরুষটি আরও দু-বার গুলি করতেই লোকটা পড়ে যায়।

পুরুষটি বিছানার উপর ঝুঁকে পড়ে মহিলাটিকে পরীক্ষা করে— না, আর বেঁচে নেই। পুরুষটি কোনওমতে মোবাইলটা হাতে নিয়ে ১০০ তে ফোন করে, "হ্যালো, পুলিশ কন্ট্রোল রুম। ইটস অ্যান এমার্জেন্সি!"

* * * * * * * *

boierpathshala.blogspot.com

ইন্দ্রাণী প্রত্যেক সপ্তাহেই বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার সময় দারিয়াগঞ্জের কস্তুরবা হসপিটালটা দেখে আর প্রত্যেকবারই সেই নিউজপ্রিন্টের কথা মনে পড়ে—১৯৮৪-এর একটা এক্সিডেন্টের খবর। মাঝে মাঝে ভাবে, গিয়ে খোঁজখবর করবে কিন্তু তারপর ভাবে এতদিন পর আর কে-ই বা খেয়াল রেখেছে একটা অ্যাক্সিডেন্টের কথা! আর তা ছাড়া সে নিজেই এসবের থেকে দূরেও থাকতে চায়। সেদিন সন্ধে হয়ে গেছে। অফিস থেকে ইন্দ্রাণী তাড়াহুড়ো করে বের হচ্ছে। এমন সময়ে একটা অচেনা নম্বর থেকে ফোন আসে, "হ্যালো ইন্দ্রাণী রুদ্র কথা বলছেন?"

"হ্যাঁ। আপনি?"

"আজ্ঞে, আমি অদিতি ব্যানার্জি। ওই আপনার ফ্ল্যাটের শ্যামজির কেসটায়..."

"ও হ্যাঁ। তা কী দরকার?"

"না, মানে একবারটি যদি দেখা করতে পারতেন। ভুল বুঝবেন না। আসলে একটা সমস্যায় পড়ে গেছি। আপনার সঙ্গে একবার পরামর্শ করতে চাই।"

"কী ব্যাপারে?"

"ওই আর কী, একটা কেস, একটু খটকা... যদি একবার দেখা করা যেত... আপনার ফ্ল্যাটেই যাই? থানায় হবে না।"

ইন্দ্রাণী কিছুক্ষণ ভেবে বলল। "ঠিক আছে, আসুন। রাত ন-টার দিকে।"

যথারীতি রাতের বেলা অদিতি প্লেন ড্রেসে দুটো ফাইল নিয়ে ঠিক ন'টায় এসে পৌঁছোলো। ইন্দ্রাণী বসতে দিয়েই এক কাপ গরম চা ধরিয়ে দিল। ন-টার দিকে ফিরে ইন্দ্রাণী বেশির ভাগ দিনই এক কাপ হট চকোলেট খায়। আজও অন্যথা হল না।

অদিতির উলটোদিকের সিঙ্গেল সোফায় বসে ইন্দ্রাণী বলল, "বলুন কী করতে পারি?" অদিতি ফাইলটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল, "আগে ঘটনাটা বলে নিই। তারপর আমার সমস্যার কথায় আসছি। চাঁদনি চক মেট্রোর থেকে কিছু দূরে একটি ফ্ল্যাটে দু-জন খুন হয়েছেন। একজন মহিলা, নাম— মারিয়া শেপ্রোভিচ; একজন পুরুষ, নাম— বেঙ্কটেশ্বরা চৈতন্য। যে মহিলা খুন হয়েছেন, তাঁর স্বামীর বয়ানটা যদি পড়ি, উনি বলছেন— স্ত্রী-র বার্থডে পার্টি

boierpathshala.blogspot.com

থেকে ফিরছিলেন। ওঁদের বিয়ে হয়েছে সাত-আট মাস হল। মারিয়ার রেন্টের ফ্ল্যাটটা এখনও ছাড়া হয়নি। সেখানেই ওঁরা গিয়েছিলেন। ঘরের মধ্যে ঢুকতেই ভদ্রলোকের মাথায় ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়। ভদ্রলোক অচৈতন্য হয়ে পড়ে যান। যখন জ্ঞান ফেরে, দেখেন ওঁর স্ত্রী বিছানার সঙ্গে বাঁধা আর একটি লোক খাটের উপর ওঁর স্ত্রী-র উপর এলোপাথাড়ি ছুরি চালাচ্ছে। মারিয়ার স্বামী ড্রয়ার থেকে বন্দুক দিয়ে লোকটির দিকে তাক করতেই লোকটা বিছানার উলটোদিকে লাফিয়ে নেমে পড়ে। ভদ্রলোক গুলি চালিয়ে দেন। লোকটি গুলি লেগে পড়ে যায়। উঠে আবার ছুরি হাতে খাটের অন্যদিকে এসে মারিয়ার স্বামীকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। মারিয়ার স্বামী ভয়ে আবার দুটি গুলি চালায়। চৈতন্য ঘটনাস্থলেই মারা যায়। মারিয়ার স্বামী কাইরেম্বা নিজেই পুলিশে ফোন করেন। এই হলো মহিলার স্বামী কাইরেম্বার বয়ান।"

ইন্দ্রাণী হট চকোলেটে একটা চুমুক দিয়ে বলল, "এদের মধ্যে কি শুধু চৈতন্যই ভারতীয়?" অদিতি হেসে ফেলল, "আজ্ঞে না। কাইরেম্বা অরুণাচলের বাসিন্দা। বছর দশেক আগে দিল্লিতে এসেছেন। পেশায় চিকিৎসক। মারিয়া যদিও রাশিয়ান। মারিয়ার সঙ্গে কাইরেম্বার পরিচয় বছরখানেক আগে একটি নাইটক্লাবে। মারিয়া চিয়ারলিডার হিসেবে আই.পি.এল.-এর সিজনে ভারতে আসে তিন বছর আগে। এখানে কতকগুলো মডেলিং কন্ট্রাক্ট পায় আর নিজের ভিসাও বাড়িয়ে নেয়। রিসেন্টলি কাইরেম্বাকে সাত-আট মাস আগে বিবাহ করেছে। ভারতীয় সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করেছে।"

ইন্দ্রাণী বলল, "বুঝলাম। কিন্তু এখানে আমি কী করতে পারি, ঠিক বুঝছি না?" অদিতি বলল, "একদম ওপেন অ্যান্ড শাট কেস। নিজেদের বাঁচাতে কাইরেম্বা গুলি চালিয়েছিলেন। একটা নিয়মমাফিক তদন্তের পর কাইরেম্বাকে কোর্টে পেশ করা। তারপর হয়তো জরিমানা বা বড়জোর অনিচ্ছাকৃত খুনের দায়ে এক থেকে তিন বছরের জেল হতে পারে। তবে এখানে চৈতন্য যেহেতু মারিয়াকে খুন করেছেন, তাই কাইরেম্বার শাস্তি আরও কমে ছয় মাসের জেলের রায় ঘোষণা হয়েছে। কিন্তু সমস্যা অন্য কোথাও। মি. চৈতন্য এক্সটারনাল অ্যাফেয়ার্সে লোয়ার ডিভিশন একজন কর্মচারী। সেইজন্যই কি

boierpathshala.blogspot.com

না জানি না, কিন্তু উপর থেকে চাপ দিয়ে রুটিন ইনভেস্টিগেশনের আগেই কেস ক্লোজ করে দেওয়া হল। মি. চৈতন্য যে পোস্টে কাজ করতেন এমন নয় যে সেটা কোনও সিক্রেট সার্ভিস। তা-ও কেন কেসটা এত তাড়াতাড়ি বন্ধ করা হল, সেটাই বুঝতে পারছি না। কেস ক্লোজ হওয়ার পরই আমার খাটকাটা মেটাতেই নিজের মতো করে খোঁজখবর করতে থাকি। মারিয়া মোবাইল ব্যবহার করত না। কাইরেম্বা প্রত্যেক মাসে মা-কে চিঠি লিখত। কিন্তু কাইরেম্বার মা তিন বছর হল মারা গেছেন। সব মিলিয়ে ঘেঁটে গেছি। কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। আমি একবার সাব-ইনস্পেকটর নায়েককে বলতে গিয়েছিলাম। সে তো পরিষ্কার বলে দিয়েছে এক্সটারনাল অ্যাফেয়ার্সই যখন চায় না, আমাদের নাক না-গলানোই ভালো।"

ইন্দ্রাণী একটু চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবে, "হুম। স্ট্রেঞ্জ! আর কিছু?"

"আরও একটা কাকতালীয় ব্যাপার আছে। তিন বছর আগে একটা অফিসের কাজে মি. চৈতন্য রাশিয়া গিয়েছিলেন। আর তার ঠিক তিন মাস পরে আই.পি.এল.-এ এ দেশে আসে মারিয়া শেপ্রোভিচ। এটা নিতান্তই একটা কাকতালীয় নাকি কোনও লিঙ্ক আছে, আমি জানি না। কিন্তু যেটা কথা, সেটা হল কেস ক্লোজ। কিন্তু আমার মন বলছে, এর থেকেও বড় কিছু আছে, যা আমরা হয়তো কেউ দেখতে পাচ্ছি না।"

"ক্রাইম সিনে মারিয়াকে কীভাবে পাওয়া যায়? মানে সেক্সুয়ালি অ্যাসল্টেড?"

"হ্যাঁ। মারিয়ার ভ্যাজাইনা থেকে চৈতন্যর সিমেন স্যাম্পল পাওয়া গেছে। কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছে, তদন্তর একদম প্রথমদিকে যখন আমরা চৈতন্যর অফিসে সহকর্মীদের রুটিন জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলাম। এমন একজনও ছিল না, যে বলতে পারে মি. চৈতন্যর কোনও চারিত্রিক ত্রুটি ছিল। বরং উলটো সার্টিফিকেট অনেক মহিলাই দিলেন। সব থেকে আমার মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে একটা ফোন কল।"

"কোন ফোন কল?"

"মারিয়াদের বেডরুমেই একটা ল্যান্ড ফোন আছে। সেই ফোন থেকেই সন্ধেবেলা একটা ফোন গিয়েছিল মি. চৈতন্যর কোয়ার্টারে। এখানে সমস্যা

boierpathshala.blogspot.com

হল, কাইরেম্বার কথায় ওঁরা ফিরেছিলেন রাত আটটায়। তারপরই তাঁদের উপর হামলা হয়। কিন্তু ফোন কলটা গিয়েছিল রাত আটটা দশে।"

"যদি ফোনের ব্যাপারটায় ফোকাস করতে হয় তাহলে বলতে হয় মি. কাইরেম্বা মিথ্যে বলছেন। যখন ওঁরা বাড়ি ফিরেছিলেন তখন মি. চৈতন্য ওখানে ছিলেন না। ফোন করে ডাকা হয়েছিল।"

অদিতি বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের নখটা তার দু-পাটি ঝকঝকে দাঁতের মধ্যে কামড়ে বলে, "কিন্তু একটা ফোনের উপর বেস করে কেস রিওপেন হবেই না, বরং আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। আর এটার সঙ্গে যেহেতু দেশের এক্সটারনাল অ্যাফেয়ার্স এসে গেছে, মনে হয় না বেশি কিছু করা যাবে।"

ইন্দ্রাণী ধীরে ধীরে বলল, "দেখা যাক কত দূর যাওয়া যায়! ক্রাইম সিনের ছবিগুলো দেখা যায়?"

অদিতি বলল, "হ্যাঁ, ফাইলে কিছু আছে আর বাকি সব আমি চুপিচুপি একটা পেন ড্রাইভে কপি করে নিয়েছিলাম। সেটা আছে। দাঁড়ান।"

"ভালোই হল। আমাদের হলঘরের বড় টিভি-টায় লাগানো যাক। দেখতে সুবিধাই হবে," ইন্দ্রাণী পেন ড্রাইভটা নিয়ে টিভি-র পিছনে ইউ.এস.বি. পোর্টে গুঁজে দিল। রিমোটটা হাতে নিয়ে বসল।

একদম প্রথম ছবিটায় চারিদিকে রক্তের ছড়াছড়ি। একটা মোটামুটি সাইজের ঘর। ঘরের বাঁদিক চেপে একটা ডবল বেড বিছানা। তার উপরেই হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে একজন মহিলা— মারিয়াই হবে। সারা বিছানায় রক্তের ছড়াছড়ি। বিছানার বাঁদিকে একটু ফাঁক দিয়েই দেওয়াল। সেদিকে আর কিছু নেই। ঘরের ডানদিকে বিছানার পাশেই একটা ছোট ড্রয়ার-কাম-টেবিল। তার উপরে একটা কর্ডলেস ল্যান্ড ফোন আছে। সেটা যদিও টেবিলের উপরেই মুখ থুবড়ে পড়ে— তার গায়েও রক্তের দাগ। সামনের মেঝেতে একটা লোক চিত হয়ে হাঁটু মুড়ে পড়ে আছে। সেটাই মি. চৈতন্য হবে। চৈতন্যর পরনে একটা ছোট নীল বক্সার আর সবুজ গেঞ্জি। মি. চৈতন্যর পিছনের টেবিলটায় রক্তের বড় ছিটে সর্বত্র। দ্বিতীয় ছবি, ঘরের

boierpathshala.blogspot.com

বাঁদিকের। সেদিকটায় বিছানা আর দেওয়ালের মধ্যে খুব বেশি ফাঁক নেই— বড়জোর এক ফুট বা তারও কম। সেদিকটায় প্রায় পরিষ্কার বলাই চলে। শুধু বিছানার চাদর থেকে রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে মেঝেতে পড়েছে। তৃতীয় ছবিটা শুধু বিছানার— মারিয়ার চার হাত-পা-বাঁধা। গলায় এলোপাথাড়ি ছুরির গভীর ক্ষত। আর পেটেও বেশ কিছু ক্ষতচিহ্ন। স্বল্পবসনা হয়ে পড়ে আছে— সেটার স্বচ্ছতার কারণে যদিও শরীরের সব অংশকেই অস্বচ্ছভাবে দেখা যাচ্ছে। চতুর্থ আর পঞ্চম ছবি দুটো চৈতন্য আর টেবিলের ক্লোজ শট। এ ছাড়া আরও প্রায় গোটা কুড়ি ছবি মন দিয়ে দেখা চলল। তারপর ইন্দ্রাণী মন দিয়ে প্রায় আধঘণ্টা মারিয়া আর মি. চৈতন্যর পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা পড়ল। ধীরে ধীরে ইন্দ্রাণী বলল, "আচ্ছা, কাইরেম্বার মায়ের ব্যাপারটা কবে জেনেছেন?"

"এই তো দিন পাঁচ-সাত আগে। তার পরদিনই তো কোর্টের রায় বেরিয়ে গেল। আমি আর কিছুই করতে পারলাম না।"

"বন্দুকটা কি ছবির ওই টেবিলের ড্রয়ারে ছিল?"

"হ্যাঁ।"

"কার নামে লাইসেন্স?"

"ওখানেও একটা কোইনসিডেন্স রয়েছে। বন্দুকটা মি. কাইরেম্বার নামে রেজিস্টার্ড। বন্দুকটা কাইরেম্বার লাজপতনগর ফ্ল্যাটের লকারে থাকত। সেটা দু-দিন আগেই মারিয়ার ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়েছিলেন। জিজ্ঞাসাবাদের সময়ে বলেছে যে এমনিই এনেছিলেন! আর ঠিক দু-দিন পর, মানে ঠিক..."

ইন্দ্রাণী মাথাটা চুলকে বলল, "বুঝলাম। সেটা ঠিক। কিন্তু একটা কথা ঠিক যে মি. কাইরেম্বা যেভাবে গল্পটা আপনাদের শুনিয়েছেন, হয়তো সেটা সত্যি না। হয়তো সত্যি অন্য কিছু।"

"একট্রা ম্যারেটাল অ্যাফেয়ার বলতে চাইছেন? মারিয়া আর চৈতন্যকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছিলেন। সেইজন্য রাগে, ওয়েট। কিন্তু আপনার এরকম মনে হওয়ার ঠিক কী কারণ?"

ইন্দ্রাণী রিমোটটা নিয়ে দ্বিতীয় ছবিটায় গেল, "দেখুন। কাইরেম্বার বয়ান অনুযায়ী প্রথম গুলি করার পর চৈতন্য খাটের উলটোদিকে পড়ে যায়।

boierpathshala.blogspot.com

কাইরেম্বা দাঁড়িয়ে ছিলেন ঘরের ডানদিকে— যেদিকটায় টেবিলটা আছে। তার মানে চৈতন্য ছিটকে পড়েছিল বাঁদিকের দেওয়ালের দিকে। কিন্তু আশ্চর্য হল, সেদিকে কোনও রক্তের ছিটেফোঁটা নেই দেওয়ালে। এবার মি. চৈতন্যর পোস্টমর্টেম রিপোর্ট দেখুন। প্রথম গুলিটাই তাঁর হৃৎপিণ্ড ভেদ করে দেয়, তারপর গুলি গিয়ে পাঁজরার হাড়ে আটকে যায়। আমাদের হৃদপিণ্ড ও তার সংলগ্ন ধমনীতে রক্তের চাপ সব থেকে বেশি থাকে। তাই এর কোনও অংশে গুলি লাগলে হাই প্রেশার ব্লাড অনেক দূর পর্যন্ত ছিটকে যায়। আর যেখানে গিয়ে পড়ে সেখানের রক্তের ফোঁটাগুলো অনেকটা ইলেপটিক্যাল শেপের বড় বড় হয়। যাকে Blood Spatter Terminologyতে Arterial Spurting বলে। সেরকম রক্তের ছাপ এই বাঁদিকের দেওয়ালটায় থাকা উচিত ছিল। কিন্তু সেরকম লম্বাটে ধরনের বড় রক্তের ছাপ একমাত্র ডানদিকে মেঝের দামী গালিচাতেই দেখা যাচ্ছে— যেখানে মি. চৈতন্যর মৃতদেহ আছে। আরও একটা ব্যাপার আছে। সেটা একবার বাড়িটা গিয়ে দেখতে পেলে শিয়োর করা যেত।"

অদিতি মৃদু হেসে ওঠে, "যাবে? আমি একটা নকল চাবি বানিয়েছি।"

ইন্দ্রাণী অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, "হ-দ্দা হ্যাক! মানে তুমি আগে থেকেই রেডি ছিলে। শুধু ইউ নিড আ পার্টনার ইন ক্রাইম!"

"ইয়েস ইন ডিড, মাই কুইন," অদিতি হেসে উঠল। দু-জনে রহস্যের গন্ধ পেতেই 'আপনি' সম্বোধনটা 'তুমি'তে নিজেদের অজান্তেই নেমে এল। ইন্দ্রাণী ভিতরে গিয়ে তাড়াতাড়ি একটা ডেনিম জিন্‌স আর একটা কালো টি-শার্ট পরে নিল। উপরে একটা ফুলস্লিভ লাল-কালো চেক জামা। ইন্দ্রাণী ভেবেছিল, এসবের থেকে দূরে থাকবে। কিন্তু রুদ্র ফ্যামিলির বোধহয় রক্তেই সমস্যা আছে— এরা কেউই ক্রাইমের গন্ধ পেলে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। অনেকটা একটা ড্রাগ অ্যাডিক্টের মতো ছুটতে থাকে সেদিকে।

অদিতির গাড়ি করে মারিয়ার ফ্ল্যাটে পৌঁছোতে মিনিট পঁয়তাল্লিশ লাগল। দোতলায় উঠেই একবার চারিদিকটা অদিতি ভালো করে দেখে নিল। তারপর টুক করে পুলিশের সিল ভেঙে দ্রুত দরজায় চাবি ঢুকিয়ে হালকা করে একটা

boierpathshala.blogspot.com

চাপ... দু-জনে দ্রুত ভিতরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। এতক্ষণে দু-জনে একটু শ্বাস নিল। আস্তে আস্তে দু-জন শোয়ার ঘরে পৌঁছোলো। অদিতি চারিদিকে একবার দেখে বলল, "বলো, এবার ঠিক কী দেখতে চাইছিলে?"

ইন্দ্রাণী দরজার দিকে ঢুকে টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, "আচ্ছা, পুরো ব্যাপারটা আমরা একবার রোল প্লে করতে পারি? তুমি মি. চৈতন্য আর আমি মি. কাইরেম্বা। বিছানার ওপাশে গিয়ে দাঁড়াও। ধরো, তুমি আমায় দেখেই লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমেছ আর আমার হাতে পিস্তল। এই আমি গুলি চালালাম। প্রথম গুলি লাগার পর তুমি মেঝেতে পড়ে গেলে।"

অদিতিও মিথ্যে মিথ্যে অভিনয় করে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ল। ইন্দ্রাণী বলতে শুরু করল আবার, "এবার তুমি উঠে দাঁড়াবে আর খাটের পায়ের দিকটা থেকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে আমার দিকে ছুটে আসবে।"

অদিতি হাতে একটা অদৃশ্য ছুরি নিয়ে খাটের পায়ের দিক থেকে হয়ে ইন্দ্রাণীর দিকে এল। ইন্দ্রাণী সামনের দিকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অদৃশ্য বন্দুক থেকে গুলি ছুড়ল। অদিতিও মিথ্যে মিথ্যে মাটিতে পড়ে গেল। এভাবে ইন্দ্রাণী আর অদিতি বারকয়েক রোল প্লে করল। আর প্রত্যেকবারই অদিতি এসে আলাদা আলাদাভাবে মেঝেতে পড়ে যায়। একসময় পর অদিতি অধৈর্য হয়ে বলল, "তুমি ঠিক কী বুঝতে চাইছ, বলবে?"

ইন্দ্রাণী হেসে বলল, "মি. চৈতন্যর ঘরের মেঝেতে পড়ে-থাকা ছবিটার কথা মনে করো।"

অদিতি বলল, "কেন? এই তো, ঘরের এই টেবিলটার সামনে চিত হয়ে পড়ে ছিলেন। হাঁটু দুটো মোড়া। পা দরজার দিকে আর মাথা টেবিলের দিকে।"

ইন্দ্রাণী হেসে বলল, "এত বার যে চেষ্টা করলে। তা একবারও কি ওভাবে তুমি মাটিতে পড়লে?"

অদিতি একটু ভেবে বলল, "হুম। যে দু-বার চিত হয়ে পড়লাম, সে দু-বার মাথা ছিল দরজার দিকে আর পা টেবিলের দিকে। আর যে তিনবার সামনের দিকে পড়লাম, সে তিনবার পড়লাম মুখ থুবড়ে। তখন আমার মাথা টেবিলের দিকে আর পা দরজার দিকে ছিল। কিন্তু ঠিক কথা, একবারও চিত হয়ে মাথা

boierpathshala.blogspot.com

টেবিলের দিকে আর পা দরজার দিকে করে তো পড়ি না। ইনফ্যাক্ট, আমি যদি খাটের পায়ের দিক থেকে আসি তাহলে সেটা সম্ভবই বা কী করে?"

ইন্দ্রাণী হেসে বলল, "একদম তা-ই। এবার আমার থিয়োরিটা শুনবে?"

"একদম।"

"মারিয়া একা ফ্ল্যাটে ফিরল। কাইরেম্বা তখনও ফেরেননি, হয়তো বা সেরাতে ফেরার কথা ছিল না," ইন্দ্রাণী কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে টেবিলের কাছে গিয়ে অদৃশ্য ফোন তুলে কানে লাগাল, "মারিয়া মি. চৈতন্যকে ডেকে নিলেন," ফোনটা রেখেই ইন্দ্রাণী ঘরের বাইরে গেল, "কোন কারণে মি. কাইরেম্বা ফিরে এলেন। অন্য পুরুষের বাহুতে আবদ্ধ স্ত্রী'কে দেখে রাগ সামলাতে পারলেন না। ড্রয়ার থেকে বন্দুক বের করে মি. চৈতন্যকে খাট থেকে নেমে আসার নির্দেশ দিলেন।" ইন্দ্রাণী চোখ দুটো বন্ধ করে হাতে অদৃশ্য একটা বন্দুক ধরে দৃশ্যটা কল্পনা করতে শুরু করেছে, "ভয়ে ভয়ে মি. চৈতন্য খাট থেকে নেমে এসে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে নিজের প্রাণভিক্ষা করছে। তার পিছনদিকে ছোট টেবিল আর দরজার দিকে মুখ। মি. কাইরেম্বা ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে— তার দরজার দিকে পিঠ আর টেবিলের দিকে মুখ। ঘরের চারিদিকে একটা হালকা অন্ধকার, খাটের উপর মারিয়া বাঁধা— সে ছটফট করছে। মি. কাইরেম্বা গুলি চালালেন। গুলির ধাক্কায় মি. চৈতন্য পিছনের দিকে টাল খেয়ে চিত হয়ে পড়ে গেলেন। Arterial Spurting... রক্ত টেবিল, মেঝে আর ফোনের উপর ছড়িয়ে পড়ল।" ইন্দ্রাণী মেঝেতে বসে পড়ে আরও কাছ থেকে মি. চৈতন্যকে দেখতে লাগল, "এখনও বেঁচে আছে। কাইরেম্বা এগিয়ে এসে আরও দুটো গুলি চালাল। এতক্ষণে স্ত্রী-র দিকে ফিরে তার মাথা গরম হয়ে গেল। একটা ছুরি..." ইন্দ্রাণী মনের মধ্যে একটা ছুরি খুঁজতে লাগল, আরে ছুরি... কিচেনে... না, কিচেনের সব জিনিসপত্র তো প্রায় কাইরেম্বার ফ্ল্যাটে শিফট হয়ে গেছে... তাহলে ছুরি...

"ওয়েট," অদিতির ডাকে ইন্দ্রাণীর সংবিৎ ফিরল। অদিতি বলল, "বরং আমরা কয়েকটা ফ্রেম পিছনে যাই। ওই যেখানটায় মি. কাইরেম্বা সবে ঘরে ঢুকছেন। আর মি. চৈতন্য খাটের উপর।" ইন্দ্রাণী একটা ফ্রিজ শটে যেন

boierpathshala.blogspot.com

তিনজনকে একসঙ্গে দেখতে শুরু করেছে। অদিতি গিয়ে খাটের কাছটাতে দাঁড়াল, "প্রশ্ন হল, মারিয়া কি মারা গেছে? না এখনও বেঁচে আছে? যখন কাইরেম্বা ঘরে ঢুকলেন তখন কি অলরেডি মি. চৈতন্য মারিয়াকে খুন করে ফেলেছেন? নাকি মি. কাইরেম্বা মি. চৈতন্যকে হত্যা করার পর নিজে মারিয়াকে মারলেন?"

ইন্দ্রাণী কল্পনার চোখে একবার সবার দিকে দেখল— মি. কাইরেম্বা, মি. চৈতন্য আর মারিয়াকে। তারপর নিজেই বলতে শুরু করল, "আমার থিয়োরিতে একটা সমস্যা আছে। যদি রাগের মাথায় খুন দুটো মি. কাইরেম্বা করে থাকেন তাহলে ছুরিটা কোথা থেকে এল? আর মি. চৈতন্য যদি ছুরি নিয়ে নিজে এসে থাকেন তাহলে মি. কাইরেম্বার গল্পটাকে সত্যি ধরতে হয়। সেক্ষেত্রে ফরেনসিক এভিডেন্সগুলোকে নাকচ করে দিতে হয়! আচ্ছা, ছুরিটার সম্পর্কে কিছু ডিটেলস?"

অদিতি বলল, "ফরেনসিক বলছে, একদম নতুন ছুরি। এক-দু-বার হয়তো ব্যবহৃত হয়েছে। ঠিক বাড়িতে ব্যবহার করা কিচেন নাইফ নয়। রেস্তরাঁতে যে ধরনের ভারী আয়তাকার চওড়া ড্যাগারগুলো হয়, ওইরকম। মি. কাইরেম্বা তো বলেছিলেন, চৈতন্যই সঙ্গে এনেছিলেন। আর এ বাড়ির কিচেনে তো প্রায় কোনও কিছুই নেই। দু-সপ্তাহ আগেই কাইরেম্বার ফ্ল্যাটে সব শিফ্‌ট হয়ে গেছে। পরের মাসে এটা ছেড়ে দিতেন মারিয়া।"

ইন্দ্রাণী মাথাটা ধরে মেঝেতে বসে পড়ে, "কোনও থিয়োরিই ঠিকঠাক মিলছে না হে। না তো আমার থিয়োরিটা, না তো মি. কাইরেম্বার বয়ান। আমরা যেভাবে ভাবছি, তার বাইরে অন্য কোনও কারণ ছিল। আমার তা-ই মনে হচ্ছে।"

অদিতি ইন্দ্রাণীর পাশেই বসে পড়ল, "আরও একটা কারণ আছে। যে কারণে মনে হচ্ছে যে খুনটা হয়তো রাগের মাথায় নয়। হয়তো প্রি-প্ল্যান।"

ইন্দ্রাণী অদিতির দিকে ফিরে তাকাতেই অদিতি আবার শুরু করল, "মি. কাইরেম্বার রিভলভার। যেটা থাকত ওঁর ফ্ল্যাটের লকারে। হঠাৎ করেই দু-দিন আগে এখানে রেখে গেলেন? যে ফ্ল্যাট ক-দিন পর এমনিই ছেড়ে দেওয়া

boierpathshala.blogspot.com

হবে। তা-ও এভাবে বেডরুমের লকহীন ড্রয়ারে? কোনও লকারে কেন নয়?"

ইন্দ্রাণীর ব্রেনে হঠাৎ যেন বিদ্যুতের ঝটকা লাগল, "রাইট। আর যদি এটা প্রি-প্ল্যান হয় তাহলে আমার থিয়োরিতে একটু চেঞ্জ করতে হবে। সেটা হল, ড্যাগারটা মি. কাইরেম্বা নিজেই এনে রেখে দিয়েছিলেন। আর খুনটা রাগের মাথায় নয়, ভেবেচিন্তে করেছেন আর বয়ানে মিথ্যা বলেছেন।"

অদিতি মাথা নামিয়ে বলল, "তাতেও সমস্যা আছে।" ইন্দ্রাণী মুখের দিকে ব্যাজার হয়ে তাকাতেই, অদিতি বলল, "প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড। বাট যেটা মনে হচ্ছে, সেটাই বলছি। সমস্যাটা হল, মি. কাইরেম্বা আগে থেকে কী করে জানলেন ওই দিন ওই সময়ে মি. চৈতন্য ফ্ল্যাটে আসছেন? কোনও স্পাই লাগিয়েছিলেন স্ত্রীর পিছনে? ডোন্ট ফরগেট, মারিয়ার কিন্তু কোনও মোবাইল ছিল না, যে মি. কাইরেম্বা মোবাইলের মেসেজ বা কল লিস্ট দেখে জেনে ফেলেছিলেন!"

ইন্দ্রাণী তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, "গুড! তুমি তো তোমার বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে লিভ-ইন-এ আছ তা-ই তো?"

হঠাৎ এই ধরনের প্রশ্নে অদিতি একটু বিব্রত হল, "হাউ ডাজ দ্যাট ম্যাটার? আছি। তো?"

"তোমরা রিলেশনশিপে যাওয়ার কতদিন পরে দু-জনে এক ফ্ল্যাটে থাকতে শুরু করেছিলে?"

"এক-দেড় মাস হবে। কেন?"

"আর মারিয়া বিয়ে হওয়ার সাত মাস পরেও নিজের রেন্ট ফ্ল্যাট ছাড়েনি। আশ্চর্য নয় কি? মি. কাইরেম্বার সঙ্গে ফ্ল্যাটে একসঙ্গে থাকত। তারপরও সপ্তাহে একবার অন্তত এখানে আসতই। তোমার রিপোর্টে মি. কাইরেম্বার বয়ান তা-ই বলছে।"

অদিতি এবার দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে বলল, "স্ট্রেঞ্জ! এটাও ঠিক যে এদের বিয়েটা খুব ধুমধামে হয়নি। চার্চে গিয়ে ম্যারেজ। দু-পক্ষের চার-পাঁচজন বন্ধু উপস্থিত ছিল।"

ইন্দ্রাণী চারিদিকে তাকিয়ে বলল, "এই ফ্ল্যাটেই কিছু আছে। কী আছে জানি

boierpathshala.blogspot.com

না। কাগজপত্র হতে পারে, চোরাই মাল হতে পারে বা অন্য কিছু। বাট উই মাস্ট গেট ইট। চলো, তাড়াতাড়ি খোঁজা শুরু করি।"

অদিতি আর ইন্দ্রাণী চারিদিকে খুঁজতে লাগল। বেডরুমের ডানদিকে দেওয়াল চেপে একটা আলমারি ছিল। ইন্দ্রাণী সেটাই টেনে দেখল— লকড! ইন্দ্রাণী জোরে জিজ্ঞাসা করল,"অদিতি, এটার চাবিটা কোথায় জানো?" অদিতি রান্নাঘর থেকে উত্তর দিল, "হ্যাঁ। আমরা চেক করেছিলাম। ওই খাটের পাশের টেবিলের মাঝের ড্রয়ারে রাখা আছে।" ইন্দ্রাণী চাবিটা বের করে আলমারিটা খুলে ফেলল। আলমারির উপরের পাশাপাশি দুটো তাকে মূলত পশ্চিমি পোশাক। তার নীচে মাঝের দুটো ছোট লকারের মতো। ইন্দ্রাণী চাবির গোছা থেকে অন্য একটা চাবি নিয়ে চেষ্টা করতেই খুলে গেল দুটো লকারই। ভিতরে যদিও দরকারি কাগজপত্র যা ছিল পুলিশ আগেই নিয়ে গেছে পরীক্ষার জন্য, এখন ভিতরে কিছু রেন্টাল রিসিট, ব্যাঙ্ক ডকুমেন্ট আছে। সেগুলো ইন্দ্রাণী ভালো করে দেখ্‌ল। ইন্দ্রাণী লকারের ভিতরটা হাত ঢুকিয়ে দেখল শেষের দিকে আরও কিছু আছে কি-না, যা বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না! কিন্তু হাতে সেরকম কিছু লাগল না। হাতটা বারকয়েক ভেতরে ঘুরিয়ে বাইরে এনে, হঠাৎ করেই একটু অদ্ভুত লাগে— দুটোর মধ্যে একটা লকার কেমন যেন শুরু হতেই শেষ। ইন্দ্রাণী দুটোর মধ্যে একসঙ্গে হাত দিয়ে দেখল, একটা লকারে প্রায় ছয় ইঞ্চি মতো মিসিং। ইন্দ্রাণী পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে ফ্ল্যাশলাইটটা ভিতরে ফেলল। লকারটা শেষের দিকের দেওয়ালটায় হালকা টোকা দিতে মনে হল, সেটা ফাঁপা! ডানদিক বাঁদিকে হাত দিতেই বুঝতে পারল, বাঁদিকে একটা খাঁজ আছে। ইন্দ্রাণী সেখানে আঙুল দিয়ে টানতেই লকারের দেওয়ালটা সরে গিয়ে একটা ছোট গহ্বর উন্মুক্ত হয়। ভিতরে যদিও বেশি কিছু নেই— দুটো ছোট মাইক্রোচিপ আছে। ইন্দ্রাণী চিপ দুটো বের করে মোবাইলের ব্যাক কভারের মধ্যেই ঢুকিয়ে রাখে। এর মধ্যেই রান্নাঘরের দিক থেকে কেমন একটা সাঁ সাঁ আওয়াজ আসছে— অনেকটা যেন কোনও রেডিয়োতে কোনও চ্যানেল ধরছে না। ইন্দ্রাণী রান্নাঘরের ঢুকতেই দেখল, অদিতি মেঝেতে বসে একটা রেডিয়ো ট্রান্সপন্ডারের নব

boierpathshala.blogspot.com

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কোনও স্টেশন ধরার চেষ্টা করছে আর হাতে মাইক্রোফোনটা ধরে 'হ্যালো', 'হ্যালো' করছে। ইন্দ্রাণী চেঁচিয়ে উঠল, "এটা কোথা থেকে পেলে? এটা অন কেন করলে?" অদিতি বলল, রান্নাঘরের উপরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "এই তো ফলস সিলিং-এর ভিতরে লুকোনো ছিল। দেখছি কোথায় সিগনাল যায়।"

"তুমি কি পাগল? না জেনেই কাকে পাঠা..." ইন্দ্রাণীর কথা শেষ হওয়ার আগেই বাইরের সিঁড়িতে ভারী বুটের আওয়াজ শোনা গেল। তারপর ভারী কণ্ঠস্বর—"রাইজ ইয়োর হ্যান্ড ইন দি এয়ার। প্লিজ কাম আউট। ইউ আর অলরেডি সারাউন্ডেড বাই আর্মড ফোর্স। প্লিজ সারেন্ডার ইয়োর ওয়েপেনস।"

ইন্দ্রাণী আর অদিতি ভয় পেয়ে একে অন্যের মুখ দেখতে লাগল। অদিতি জিন্‌সের পিছনে গুঁজে-রাখা সার্ভিস রিভলভারটা বের করে দরজার দিকে তাক করে এগোতে শুরু করল। ইন্দ্রাণী থমকে দাঁড়াল, "না, আমরা জানি না কার সঙ্গে লড়ছি। বেটার তুমি রিপোর্টিং অফিসারকে আমাদের লাইভ লোকেশন দিয়ে একটা SOS পাঠাও।"

অদিতি ফোনটা বের করে হোয়াটসঅ্যাপে নিজের লাইভ লোকেশন শেয়ার করে রিভলভারটা নামিয়ে দু-জনে বাইরে চলে এল। অদিতি বাইরে আসতেই বলল, "পোলিশ... পোলিশ... উই আর পোলিশ।"

বাইরে আসতেই ওদের দু-জনের চোখ কপালে। পাঁচজন ভারতীয় সেনার পোশাকে তাদের দিকে নাইন এম এম স্টার্লিং কারবাইন তাক করে আছে। দু-জন দাঁড়িয়ে, দু-জন দু-দিকের সিঁড়িতে বসে আর একজন একটা পিস্তল ধরে তাদের দিকে তাক করে। নীচের দিকে যে সিঁড়িটা নেমে গেছে, সেখানে কালো পোষাকে দু-জন বিদেশির রিভলভারও দরজার দিকেই তাক করা। তারা বাইরে আসতেই সামনের লোকটি চেঁচিয়ে উঠল, "ড্রপ ইয়োর ওয়েপন নাও।"

অদিতি ভয়ে ভয়ে পিস্তলটা ফেলে দিল। পাশের দু-জনকে সামনের লোকটা ইশারা করতেই দু-জন ছুটে এসে ইন্দ্রাণী আর অদিতিকে টেনে মাটিতে শুইয়ে দিল আর হাতগুলো পিঠ মোড়া করে বেঁধে হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে দিল। অদিতি

boierpathshala.blogspot.com

ইন্দ্রাণীর দিকে ফিরে বলল, "বলেছিলাম, একটা চেষ্টা করি। এবার বেঘোরে প্রাণ দিতে হবে রাশিয়ান মাফিয়াদের হাতে।"

ইন্দ্রাণী বলল, "রাশিয়ান মাফিয়া?"

অদিতি কালো পোশাক পরা বিদেশি দু-জনের দিকে চোখ দিয়ে ইশারা করল। কালো পোষাক-পরা লোক দুটো ওয়াকি-টকিতে কাউকে আপডেট দিচ্ছে, "টার্গেট ইজ টকিং ইন ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ, স্যার পসিবলি আরবিক..." ইন্দ্রাণীর এটা শোনার পর নিজেই মেঝেতে মাথা ঠুকল— গাড়লের দল! বাংলাকে বলে কিনা আরবিক। হা কপাল!

* * * * * * * *

ইন্দ্রাণীদের নিয়ে আসা হয়েছে দিল্লির রাশিয়ান অ্যাম্বিসেতে। তাদের দুই রাউন্ড মেটাল ডিটেকটরে চেক হয়ে গেছে। তাদের পোশাকের পকেট-টকেটগুলোও চেকিং শেষ। সামনে দাঁড়ানো রাশিয়ান মহিলা এবার কটমট করে চেয়ে বলল, "ইউ হ্যাভ্ব কোম দিসস উইয়ে... মোউর চেকিং অফ দ্য ক্লওথ!" ইন্দ্রাণীর মাথা দপদপ করে ওঠে। বলে কী মহিলা— সব পোশাক খুলতে হবে! ঠিক সেই সময়ই বছর ষাটের এক ভারতীয় ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন— কাঁচা-পাকা দাড়ি, টাক মাথা, কালো কোট আর কালো স্যুট। সঙ্গে একজন রাশিয়ান ভদ্রলোক— নেভি ব্লু কোর্ট আর স্যুট, চোখের মণি দুটোও নীল। রাশিয়ান ভদ্রলোকটি বলল, "পোডোজদিতা।" ভারতীয় ভদ্রলোকটি এসে রাশিয়ান মহিলাটিকে বললেন, "নাইস টু মিট ইউ মিস। বাট ইউ কান্ট ডু চেকিং উইথ এনি ইন্ডিয়ান সিটিজেন উইথআউট এনি অথরাইজেশন। মি. কাশপ্রভাব উইল এক্সপ্লেন ইউ। উই আর হেয়ার টু টেক দেম। ইফ উই গেট এনি ইনফো, উই উইল আপডেট," ভারতীয় ভদ্রলোকটি কাশপ্রভাবের দিকে ফিরে বললেন, "হোপ, উই ক্যান টেক দেম নাও?"

কাশপ্রভাব হাসিমুখে করমর্দন করে বিদায় জানালেন। ইন্দ্রাণী আর অদিতিকে আরও একটি গাড়িতে তোলা হল, সামনের সিটে বসল ভারতীয় ভদ্রলোকটি। সামনে-পিছনে প্রায় চার-পাঁচটা সেনাদের পাইলট কার। ভদ্রলোক

boierpathshala.blogspot.com

গাড়িকে বসে ড্রাইভারকে বললেন, "চলো"।

এতক্ষণে পিছনে ফিরে লোকটি বলল, "মেরা নাম মি. ডিক্সিট হ্যায়। আমি দেশের এক্সটারনাল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টে কাজ করি। আমার পরিচিতি শেষ। এবার আপনারা। কোন সন্ত্রাসবাদী সংস্থার হয়ে কাজ করছেন?"

অদিতি আর ইন্দ্রাণী দু-জন দু-জনের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাল। দু-জনের হাত তখনও পিছনে বাঁধা। অদিতি বলল, "মি. ডিক্সিট, হাম কিসি টেররিস্ট ওর্গানাইজেশন সে নেহি হ্যায়। আমি দিল্লি পুলিশে কাজ করি। আর এ আমার বন্ধু ইন্দ্রাণী।"

"ডোন্ট লাই টু মি, মিস। পুলিশ এ কেস বন্ধ কর চুকা হ্যায়। অগর আপ সহি বোলতি হ্যায় তো অচ্ছি বাত। নহি তো হমে তরিকা আতা হ্যায়।" ইন্দ্রাণী বুঝল ঘোর বিপদ। যে ব্রহ্মাস্ত্রটা সে দিল্লীতে সবার থেকে লুকোচ্ছিল, সেটা এবার না প্রয়োগ করলেই নয়—"আপনি চাইলে আমাদের ডিটেলস চেক করতে পারেন। আমি দিল্লির ডি.জি. টেক কোম্পানিতে কাজ করি। আমার বাবা কলকাতা পুলিশের ডি.আই.জি.! ইউ ক্যান চেক।" মি. ডিক্সিট তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন, "আপ না বোলতি তো ভি হম কর লেতে। চলো, কুছ তো আপ খুদ সে বোলি। বাকি হম নিকাল লেঙ্গে।"

* * * * * * * *

এর মধ্যেই তাদের গাড়িগুলো ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির বিল্ডিং-এ ঢুকতে থাকল। ইন্দ্রাণী আর অদিতির ফোন ইতিমধ্যেই নিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাদের একটা ঘরে বসিয়ে রাখা হয়েছে। সামনে ভারতীয় সেনার পোশাকে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে তাদের দিকে লক্ষ রাখছে। ঘরের মধ্যে একটা টেবিল আর দুটো চেয়ার। চারিদিকের দেওয়ালে সাদা রং আর একদিকের দেওয়ালে বড় কালো কাচ লাগানো। ইন্দ্রাণী ভালোভাবেই জানে কাচের ওদিক থেকে তাদের উপর নজর রাখা হচ্ছে।

প্রায় তিন ঘণ্টা পর মি. ডিক্সিট ফেরত এলেন দ্রুতপদে। টেবিলের উপর একটা ফাইল রাগের সঙ্গে ছুড়ে ফেললেন, "প্লিজ ডোন্ট ট্রাই মাই পেসেন্স!

boierpathshala.blogspot.com

ওপেন আপ ইয়োর মাউথ। টেল মি দ্য ট্রুথ।"

অদিতি একটু ভয়ে সিঁধিয়ে গেল। ইন্দ্রাণী একটু হেসে বলল, "তো ব্যাকগ্রাউন্ড ভেরিফিকেশ কমপ্লিট?" ইন্দ্রাণী চোখগুলো বড় বড় করে একটু শ্লেষের ভঙ্গিতে বলল, "লেট মি গেস। আপনি সন্দেহজনক তেমন কিছুই পাননি। আমার বাবার সঙ্গেও কথা হয়েছে নিশ্চয়। তা-ই নয় কি, স্যার?"

মি. ডিক্সিট একটু কড়া চোখে তাকালেন, তারপর পিছনে দাঁড়ানো মহিলা কমান্ডোটির দিকে ফিরে বললেন, "লেট'স ডু এ পলিগ্রাফ টেস্ট। দোনো কো লে আও!"

মহিলাটি দু-জনের হাত ধরে হিঁচড়ে হিঁচড়ে অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে দুটো চেয়ারে বসিয়ে দিল। প্রায় তিন-চারবার পলিগ্রাফ টেস্টের পর প্রমাণিত হল, ইন্দ্রাণী আর অদিতি সত্যিই বলছে। ওদের বাইরে আনতেই মি. ডিক্সিট চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, "আপাতত আমাদের কাছে কিছু নেই বলে তোমাদের ছাড়ছি। কিন্তু তোমাদের উপর নজর থাকবে আমার।"

ডিক্সিট ইশারা করতেই মহিলা কমান্ডোটি দু-জনের হ্যান্ডকাফ খুলে বাইরের দিকে যেতে নির্দেশ করল। ইন্দ্রাণী যাওয়ার আগে বলল, "মি. ডিক্সিট, আপনার লোকেরা গুড কিন্তু বেস্ট নয়। মারিয়া একজন রাশিয়ান সিক্রেট এজেন্ট ছিল। অদিতি যখন রেডিয়ো অন করে তখন ওরা সিগনাল পেয়ে যায়। আপনি কি কিছু খুঁজছেন, মিস্টার?"

মিস্টার ডিক্সিটের মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কমান্ডোটিকে চলে যেতে নির্দেশ দিলেন। কমান্ডোটি চলে যেতেই ডিক্সিট বললেন, "তোমাদের উপর আর কারও নজর নেই। প্লিজ টেল মি দ্য ট্রুথ। দেশের সুরক্ষার প্রশ্ন। কিছু জানলে প্লিজ বলো।"

ইন্দ্রাণী অদিতির দিকে ইশারা করতেই অদিতি প্রথম থেকে সব বলল— কী কী কারণে তাদের খটকা লেগেছে, ইন্দ্রাণীর থিয়োরি ও তার সমস্যা, শেষে রান্নাঘর থেকে রেডিয়ো ট্রান্সপন্ডার পেয়ে সেটাকে অন করে কথা বলার পর সেনা চলে আসে। মি. ডিক্সিট ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "ফলো মি।"

দু-জনে নিঃশব্দে ডিক্সিটের কেবিনে পৌঁছোলো। তিনি নিজের কোর্টটা খুলে

boierpathshala.blogspot.com

চেয়ারে রেখে দু-জনকে বসতে ইশারা করলেন। টেবিলের উপর থেকে গরম কফির কাপটা নিয়ে বলল, "মি. চৈতন্য কোই এক্সটারনাল অ্যাফেয়ার্স কা ক্লার্ক নহি হে। উনি 'র' এজেন্ট। তিন বছর আগে রাশিয়া গিয়েছিলেন। রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের ফাইটার প্লেনের কন্ট্রাক্ট রিনিউ হওয়ার আগে সব গোপনে চেক করতে গিয়েছিলেন। ওখানেই একটা বারে মারিয়ার সঙ্গে চৈতন্যর দেখা হয়। হয়তো ওরা একটু ক্লোজও হয়ে গিয়েছিল। মারিয়া বার ডান্সার ছিল। চৈতন্য ফেরত আসার পর রাশিয়া চৈতন্যর আসল পরিচয় জানতে পারে। ঠিক এই কারণেই ওরা মারিয়াকে ট্রেইন করে এবং সেই বছরই চৈতন্যর পিছনে পিছনে ভারতে পাঠায়। এসব যদিও আমরা জানতে পেরেছি মারিয়া মারা যাওয়ার পরে। রাশিয়ান অ্যাম্বেসির মি. কাশপ্রভাব যখন এসে বললেন, দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডিসক্লোজ দেয়ার এজেন্ট, তখন আমি পুরো ব্যাপারটা বুঝলাম। আমাদের সঙ্গে রাশিয়ার ডিপ্লোমেটিক সম্পর্ক ভালোই। তাই পুলিশকে কেস বন্ধ করতে বলে দেওয়া হয়। হতেই পারে ওই ডাক্তার কাইরেম্বা নাকি কী নাম ওই হয়তো খুনি। কিন্তু আমার রিকোয়েস্ট, এটাকে এখানেই শেষ করো। এটা কোনও একজনের ব্যাপারে নয়। আমরা এখনও জানি না মারিয়া কেন যা যা ইনফো চৈতন্য থেকে পেয়েছিল, সেগুলো চায়নাকে বিক্রি করে দিল। না তো মি. কাশপ্রভাব জানেন।"

অদিতি এবার অবাক হয়ে বলল, "চায়না?"

মি. ডিক্সিট চেয়ারে বসে বললেন, "ম্যায় উসি বারে মে হি পরেশান হুঁ। চৈতন্য একটা সিক্রেট চুক্তির ব্যাপারে কাজ করছিল। কোনও ভাবে চীনের কাছে তার ডিটেলস পৌঁছেছে। ইউনাইটেড নেশনসে সেসব ডকুমেন্টের কপি সাবমিট করে আমাদের সিকিয়োরিটিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেছে। হয়তো মারিয়া ডবল এজেন্ট। আমি ভেবেছিলাম, হয়তো তোমাদের কেউ লাগিয়েছিল মারিয়ার ফ্ল্যাট থেকে কিছু চুরি করতে।"

ইন্দ্রাণী এতক্ষণ শুনছিল। এবার ফোনের ব্যাক-কভারটা টেনে খুলে দুটো মাইক্রোচিপ টেবিলের উপর মি. ডিক্সিটের দিকে এগিয়ে দিল, "মারিয়াকে গুফিয়া লকার সে মিলা। আই থিঙ্ক ইউ নিড দিস।"

boierpathshala.blogspot.com

মিস্টার ডিক্সিট তাড়াতাড়ি একটা কার্ড ল্যাপটপে গুঁজে দেখতে লাগলেন। ধীরে ধীরে তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল। দ্রুত অন্য কার্ডটাও ঢুকিয়ে মাথার ঘাম মুছলেন, "ডিড ইউ সি দিস?"

ইন্দ্রাণী মৃদু হেসে বলল, "টাইম কাঁহা মিলা। উসকে পহেলিই তো..."

বাকিটা শোনার আগেই ডিক্সিট বলে উঠলেন, "আমি শুধু এটাই বুঝছি না, মারিয়া কি শুধু টাকার জন্যই চীনকে এসব তথ্য পাচার করছিল, নাকি অন্য কিছু!"

ইন্দ্রাণী কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট কাইরেম্বা?"

"মুঝে পাতা নহি। ও বস এক ডক্টর হ্যায়। নিজেই নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে। আর কী চাই?"

ইন্দ্রাণী একটু ভেবে বলল, "ওঁর মা তিন বছর আগেই মারা গেছে। অদিতি চেক করেছিল। কিন্তু তারপরও রেগুলার মায়ের নামে কিছু একটা পোস্ট করতেন। এটা কি রহস্যজনক না? অরুণাচল থেকে চীন কিন্তু বেশি দূর নয়, মি. ডিক্সিট।"

ডিক্সিট অদিতির দিকে ফিরে বলল, "আর ইউ সিয়োর?"

অদিতি যেন এতক্ষণে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পেল, "ইয়েস স্যার! আমি কাইরেম্বার ঘরেও লুকিয়ে ঢুকেছিলাম। একটা ড্রয়ারে স্পিড পোস্টের কিছু রিসিট পেয়েছিলাম। সেগুলো নিয়ে পোস্ট অফিসে গিয়ে নিজে চেক করেছি। প্রত্যেক সপ্তাহে একই ঠিকানায় ওঁর মায়ের নামে প্যাকেটগুলো পোস্ট করা। আমি লোকাল পুলিশকে খবর নিতে বলি। লোকাল পুলিশ জানায় ওই নামের মহিলা তিন বছর আগেই মারা গেছেন। আর ওই চিঠিগুলো কখনোই পিয়োন কাউকে দিতে যেত না। প্রত্যেকবারই শনিবার করে কেউ একজন এসে নিয়ে যেত। এক মিনিট। কাইরেম্বার একটা লকারও আমি চুলের ক্লিপ দিয়ে খুলেছিলাম। অন্য ভাষায় হাতে লেখা কিছু নোট ছিল। এখন মনে হচ্ছে, ভাষাটা চাইনিজ হলেও হতে পারে।"

মি. ডিক্সিট চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন, ইন্টারকমে কাউকে চিৎকার করে নির্দেশ দিলেন, "মেক টু টিম রেডি। আই ওয়ান্ট দিস কাইরেম্বা বাস্টার্ড

boierpathshala.blogspot.com

নাও। গেট রেডি," এবার অদিতি আর ইন্দ্রাণীর দিকে ফিরে বলল, "তুম দোনো প্লিজ ওয়েট হিয়ার। এনিথিং ইউ ওয়ান্ট, জাস্ট কল আদিল। ও বাহার হি হ্যায়।"

মি. ডিক্সিট আর এক মুহূর্ত দেরি না করে বেরিয়ে গেলেন। মিস্টার ডিক্সিট যখন ফিরলেন তখন ভোর ছ-টা বাজে। আদিল রাতে ইন্দ্রাণী আর অদিতির ডিনারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। এখন ইন্দ্রাণী আর অদিতি দু-জনেই একটা সোফায় আধশোয়া হয়ে ঘুমোচ্ছে। ডিক্সিট এসেই চেঁচিয়ে উঠলেন, "ব্রাভো মাই গার্লস!" দু-জনেই চমকে সোফার উপর উঠে বসল। মি. ডিক্সিট যদিও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই বললেন, "দ্যাট বাস্টার্ড কাইরেম্বা অ্যাক্সেপ্টেড অল। আসলে ও চাইনিজ এজেন্ট। ও আগে থেকে জানত না যে মারিয়া একজন রাশিয়ান এজেন্ট। ওর লক্ষ্য ছিল চৈতন্য। চৈতন্য আর মারিয়ার ঘনিষ্ঠতা দেখেই মারিয়াকে টার্গেট বানায়। প্রেমের নাটক করে বিয়ে করে। একদিন এক দুর্বল মুহূর্তে মারিয়া সব বলে ফেলে। কাইরেম্বা এই সুযোগটাই নিয়েছিল। কাইরেম্বা মারিয়াকে বুঝিয়েছিল, যে মারিয়া যদি চৈতন্যর থেকে কিছু গোপন ডকুমেন্ট চুরি করে নিজের কাছে রাখতে পারে তাহলে তারা ভবিষ্যতে চৈতন্যর থেকে নিরাপদ থাকবে। মারিয়াও ভালো মনে ব্যাপারটা মেনে নিয়ে চৈতন্যের ফ্ল্যাটে গিয়ে জরুরি ডকুমেন্ট রিস্ট-ওয়াচ ক্যামেরাতে নকল করে নিত। চৈতন্য মারিয়ার বিয়ের ব্যাপারে কিছু জানতই না। মারিয়াও কখনই জানত না যে কাইরেম্বা সেই ডকুমেন্টগুলোর একটা করে কপি চীনে পাচার করত। ব্লাডি রাস্কেল!"

অদিতি চোখ কচকে জিজ্ঞাসা করল, "ঔর মার্ডার?"

"ও হাঁ। বেসিক্যালি চৈতন্য কো থোড়া থোড়া শক হো রহা থা। সেইজন্য কাইরেম্বা এক মাস্টার প্ল্যান বানায়। মারিয়াকে রাজি করায় নিজের ফ্ল্যাটেই চৈতন্যকে ডাকতে। মারিয়াকেও সেক্সুয়ালি প্রোভোকিং ড্রেস পরিয়ে বেঁধে রেখেছিল। ওই মুভি টাইপ... হানি ট্র্যাপ! মি. চৈতন্য এল আর ফাঁসল! মিঃ কাইরেম্বা ওখানেই ছিল। কাজ শেষ হতেই বন্দুক নিয়ে এসে মিঃ চৈতন্যকে ভয় দেখিয়ে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে মাথায় হাত তুলে বসতে বাধ্য করে। চৈতন্য

boierpathshala.blogspot.com

2021/5

নিজের জীবনের ভিক্ষা চাইছিল। কিন্তু কাইরেম্বা কাউকেই ছাড়ার মুডে ছিল না। চৈতন্যর বুকে গুলি চালাতে সে পিছনের দিকে উলটে পড়ে, তারপর আবার দুটো গুলি করে। তারপর নিজেই ছুরি নিয়ে মারিয়াকেও মেরে ফেলে। ছুরিটা মি. চৈতন্যর হাতে ধরিয়ে পুলিশে কল করে।"

এতক্ষণে যেন ইন্দ্রাণীর কাছে পুরো ছবিটা পরিষ্কার হল। মি. চৈতন্য বিছানার বাঁ পাশে গুলি খেয়ে পড়েনইনি। তাই সেদিকে রক্তের দাগ নেই। তিনি প্রথম থেকেই ডানদিকে মেঝেতে বসে প্রাণভিক্ষা করছিলেন। গুলি লাগতেই গুলির ধাক্কায় পিছনের দিকে পড়ে যান— চিত হয়ে, মাথা টেবিলের দিকে আর পা দরজার দিকে। অদিতি বলল, "নাও উই শুড লিভ। হোপ, ইউ ডোন্ট মাইন্ড স্যার!" মি ডিক্সিট বললেন, "ও শিয়োর। আদিল ছোড় দেগা।" ইন্দ্রাণী আর অদিতি ঘুরে দাঁড়াতেই ডিক্সিট বললেন, "ইন্দ্রাণী, উই উইল বি গ্রেটফুট টু ইয়োর ফ্যামিলি। অলওয়েজ।"

ইন্দ্রাণী মিষ্টি হেসে বলল, "আই অ্যাম গ্ল্যাড টু সার্ভ, স্যার।"

ডিক্সিট ভাঙা-ভাঙা বাংলায় বললেন, "হামি তুমার কথা বলছি না, ইন্দ্রাণী। হামি মৃণাল রুদ্রর কথা বলছি। ইয়োর গ্র্যান্ড ফাদার!"

ইন্দ্রাণী পিছন ঘুরে দ্রুত এক পা এগিয়ে এসে বলল, "আপনি চিনতেন আমার গ্র্যান্ডপা কে?"

ছোট করে হেসে ডিক্সিট বলল, "হি ওজ আ নাইস ম্যান। হামি তখন সবে হোম অ্যাফেয়ারে যোগ দিয়েছি। উনার শিডিউল মেনটেন করতাম। মৃত্যুর আগে ১৯৮৪-তে ইকটা সিক্রেট মিশনে পাঞ্জাব গিয়েছিলেন। সিখান তিকে হামাদের ইকটা সিক্রেট টেলিগ্রাম পাঠি-এ-ছিলেন। যার ডিকোড মিনিং— 'RISK. SAVE THE LADY.' রাষ্ট্রপতির সিকিউরিটি ইনক্রিজ হালো। উনত্রিশে অক্টোবর সুভা দিল্লি আয়ে। উসি দিন শামকো হোটেল ব্লু মুন মে রুম ১০১ লিয়ে। কোই মিট করনে আয়া থা। দেন উই ফাউন্ড হিম ডেড। দো দিন বাদ যব ইন্দিরাজি মৌত হুয়া তাব সমঝে হম সব, কি লেডি মতলব প্রাইম মিনিস্টার ম্যাডাম থি। ফার্স্ট লেডি নহি। হি ওজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট উই হ্যাড। ইন্ডিয়া কা পহেলা আন্ডারকভার এজেন্ট টিম 'জটায়ু'-কে

boierpathshala.blogspot.com

মেম্বার থে। 'র'-কা ওয়েল ট্রেইন্ড এজেন্টস কো হি 'জটায়ু' জয়েন কারনে কা মৌকা মিলা থা। এক এয়সা টিম জিসকা কোই অফিশিয়াল এগজিস্টেন্স নহি থা। স্যার ফিল্ড এজেন্ট নেহি থে। ডেস্ক এজেন্ট থে।"

ইন্দ্রাণী বলল, "কে মেরেছিল আমার গ্র্যান্ডপাকে? ডু ইউ নো দ্যাট?" মি. ডিক্সিট মাথা নিচু করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, "নো ওয়ান নোজ দ্যাট। বাট উনার দিল্লির বডিগার্ড একটি লোকের ডেসক্রিপশন দিয়েছিল। বাট কাউকে পাকড়াও করা যায়নি। মারনে সে পহেলে বস স্যার নে লিখে থে—'Mission has been compromised. Shut down Jatayu.' হম সব জটায়ুকে সারে কাগজাত জ্বলা দিয়ে। এজেন্টস কো নিউ আইডেন্টিটি দিয়ে। বস, বডিগার্ড অসীম সরকার কা নোকরি চালা গয়া। ও ঠান লিয়েছিল, কী ও খুনি খুঁজে বের করবেই। বাট হঠাৎ করে সরকার সারে ইনভেস্টিগেশন বন্ধ কোরে দেয়। ইকদিন মাঝরাতে ইসেছিল আমার কোয়াটারে। পুলিশ স্টেশন থেকে রিপোর্ট এভিডেন্স সব চোরি করে নিয়ে।" ইন্দ্রাণীর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, "তার মধ্যে কিছু ছিল?"

"রাজস্থান থেকে কোরা ইকটা টেলিগ্রাম মৃণাল স্যার কো..."

ইন্দ্রাণীর চোখ দুটো বড় হয়ে ওঠে, "কী ছিল তাতে? কে লিখেছিল?"

"লিখা ছিল— 'IMMEDIATE MEET. HOTEL BLUE MOON–১০১.' from P. Rudra." ইন্দ্রাণীর মাথাটা ঘুরে গেল। সোফাটা ধরে কোনওমতে বসে পড়ল।

মিস্টার ডিক্সিট বললেন, "ইউ আর গ্র্যান্ডডটার অফ হিম। টাই তুমাকে বললাম। বাট ইট'স আ টপ সিক্রেট। কিপ ইন মাইন্ড। হামাদের মাধ্যে মি. মৃণাল রুদ্রকে নিয়ে কুনোদিন কুনো কথা হয়নি।"

ইন্দ্রাণী যন্ত্রমানবের মতো মাথা নাড়ে, কিন্তু তার মাথায় মধ্যে তখন একটাই নাম ঘুরছে—"P. Rudra."

boierpathshala.blogspot.com